বঙ্গদেশের হৃদয় হতে... ফিরে দেখা

(সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবোধ)

(দ্বিতীয় পর্ব)

সুনীলময় ঘোষ

জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন

১৩৮/৭, বি সি বোড (বেহালা), কলকাতা ৭০০০৩৪

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯২

প্রকাশক :
নিগমানন্দ মণ্ডল
সি-৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, দ্বিতীয় তল
কলকাতা ৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টার্স
৩০, বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৬

অক্ষরবিন্যাস :
প্রদ্যুৎ সাহা
লেজার বাইট
৭, কামারডাঙা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

পরিবেশক :
আনন্দ প্রকাশন
সি/৮, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (দ্বিতল)
কলকাতা ৭০০ ০০৭
বর্তমান ঠিকানা : K_1/9 মার্কাস স্কোয়ার, কলকাতা - ৭

প্রচ্ছদ : দেবব্রত পাল

বিনম্র নিবেদন

'বঙ্গদেশের হৃদয় হতে ... ফিরে দেখা'র প্রথম পর্বের নিবেদনে এ কালের যুব-চেতনায় বাঙলা তথা ভারত ঐতিহ্যের চর্চা ও অনুশীলনের ঘাটতি সম্পর্কে আমার কিছু বেদনা প্রকাশ করেছিলাম। তার জন্য অধিক-প্রায় আমাদের, যারা সেই ঐতিহ্যবোধ ও ঘটনার প্রবাহকে স্বাভাবিকভাবে অনুরণিত করতে পাবিনি একালের যুবশক্তির অন্তবে—কর্মে ও ভাবনায়, তাঁদেরই অনেকের কাছ থেকে নানাভাবে জানতে পেরেছি—প্রকাশিত আমাব উল্লিখিত পুস্তকটি থেকে অনেক তথ্য (সংক্ষিপ্ত) আহরণ করে তাঁরা কিছু কিছু সঙ্ঘ ও বিদ্যালয়ে আলোচনা ও পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন—তাতে ঘটনার গতির মাত্রা যতটুকু জেগেছে তার চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষা জেগেছে আরো-আরো জানার জন্য। বিরাট ও ব্যাপক পরিমণ্ডলের বিস্তৃত ঘটনার প্রবাহ, যা সমগ্র বঙ্গদেশের অন্তর শক্তিকে সেদিন উদ্‌বোধিত করতে পেরেছিল তার পরিচয় স্বল্প পরিসরে সম্পূর্ণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই পুস্তকটির বর্তমান দ্বিতীয় পর্বেও ফেলে আসা সেই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কিছু লিপিবদ্ধ করা গেল।

পুস্তকটির এবারের অংশে সেসময়ে বাঙলা সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় ভাবনার বিচিত্র টানাপোড়ানের কথা **প্রবন্ধে, কবিতায় ও নাটকে** যেভাবে সাহিত্যের ভাণ্ডার ভর্তি করেছিল তা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে ১১টি প্রবন্ধ, ৩০টি কবিতা ও ১টি নাটক যুক্ত করা হল—যা থেকে আশা করি, উৎসাহী পাঠকের চিত্তে বাঙলার মননের কিছু পরিচয় লাভ করা যাবে। **'বঙ্গবিভাগ'-'বয়কট'** এক সময় যে ভাবে-আন্দোলনের চেতনাকে শক্তিদান করেছিল—আর প্রভাব পরবর্তী সময়ে বাঙলার দামাল যুব-শক্তিকে জাগরণের যে বার্তা দিয়েছিল তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য থেকে যে অসন্তোষ দিনের পর দিন জমা হতে হতে রক্তসিক্ত ক্ষোভের প্রকাশ নানাভাবে জেগেছিল তারই পথ খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু সমাধান তথা আলোর পথ এসেছিল—যা পরবর্তী সময়ে দেশ ও জাতিকে একটা গভীর জীবন-প্রত্যয়ের সন্ধানে ভাল-মন্দের মুখোমুখি হতে সাহস ও শক্তি জুগিয়ে ছিল অনিবার্যভাবে।

ন্যায়-অন্যায়বোধের সিদ্ধান্ত কোন একটিমাত্র ঘটনায় তাৎক্ষণিক বিচারে জানা

বা অনুভব করা সম্ভব নয়। ঘটনার তড়িৎ তাড়নায় অনেককিছু ঘটে, কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে সেই ঘটিত প্রবাহ থেকে নতুন শিক্ষা ও চিন্তা আসে যার প্রভাব সামগ্রিক ভাবে পথ চলার সূত্রকে গেঁথে রাখে।

'বঙ্গভঙ্গ' ও 'বয়কট' আন্দোলনের অনিবার্য ঝটিকায় দেশ ও জাতি তছ্‌নছ্‌ হয়েছে, মৃত্যু ও ধ্বংস নির্বিচারে যুব-শক্তিকে বিভ্রান্ত করেছে; পথভ্রষ্ট করেছে—কিন্তু 'ভরসা' না হারিয়ে সেদিন যাঁরা এরই মধ্যে নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবনার পথ খুঁড়ে রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন তাঁদের কথাই সংকলিত প্রবন্ধ-কবিতা-নাটকে নব-জীবনের বার্তাবহ হয়ে জেগেছিল।

'বঙ্গদেশের হৃদয় হতে ... ফিরে দেখা'র প্রথম পর্বটি (প্রকাশক সাহিত্যম) পাঠ করে যারা আমাকে পরবর্তী পর্ব প্রকাশের জন্য নির্দেশ জানিয়েছেন তাদের জন্যই স্বল্প পরিসরে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশ করার সাহস করা হল।

এই অধ্যায়ে আমি অনেকগুলি সহায়ক পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি—তার মধ্যে সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' এবং কালীচরণ ঘোষের 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশক 'আনন্দ প্রকাশন' এর কল্যানীয় শ্রী নিগমানন্দ মণ্ডল শুধু ব্যাবসায়িক প্রকাশনা করেন না—প্রকাশনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর 'হট্‌-কেক'কেই একমাত্র অবলম্বন না করে বিবেকতাড়িত নৈতিকতার পরিচয়ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বিস্তার করছে। আমি তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুনীলময় ঘোষ

সূচিপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

অতুলপ্রসাদ সমগ্র
রজনীকান্ত সঙ্গীত সমগ্র
দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত সমগ্র
অতুলন অতুলপ্রসাদ
বঙ্গ-নন্দিত রজনীকান্ত
রমনীয় দ্বিজেন্দ্রলাল
বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী মহিলা কবি
গিরিশচন্দ্র-নট নাট্যকার ও ভক্তভৈরব
বঙ্গদেশের হৃদয় হতে ... ফিরে দেখা (১ম পর্ব)
সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা
(নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস)
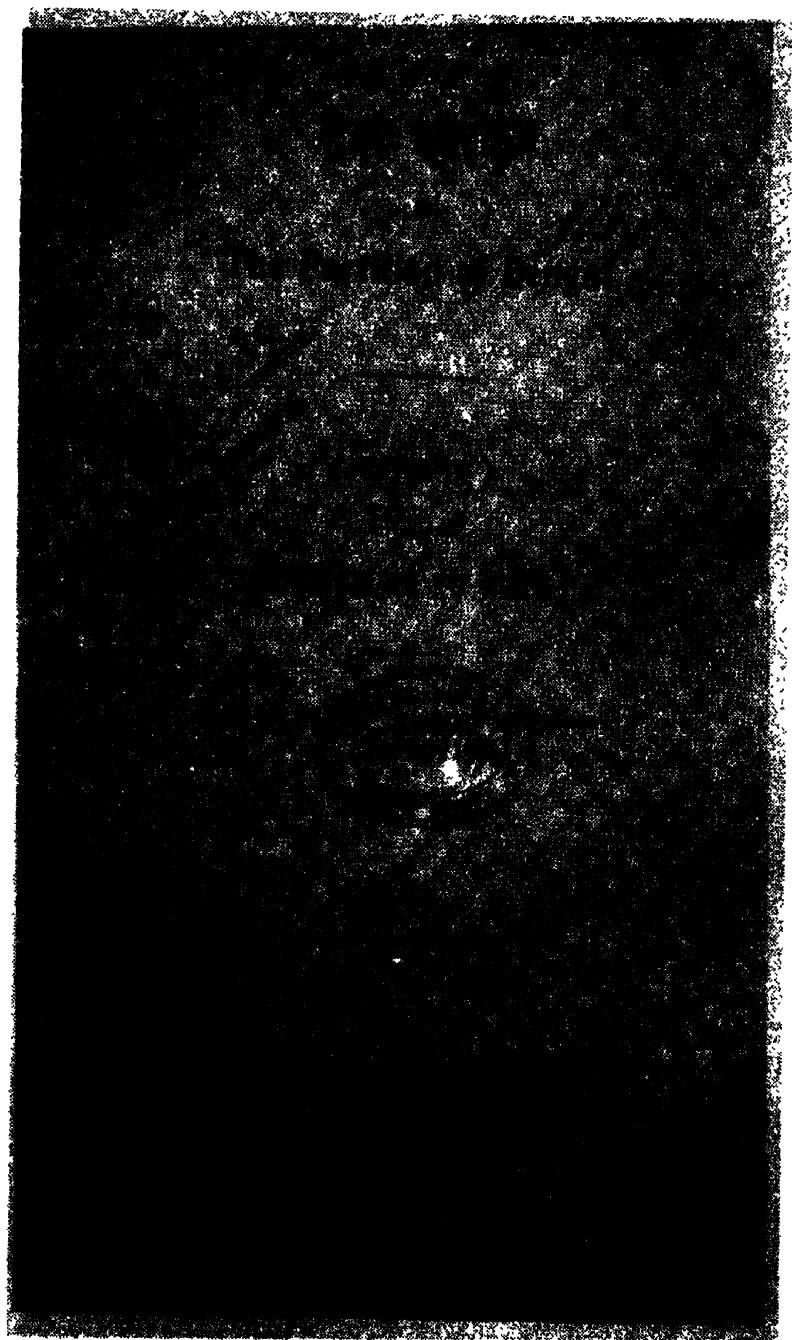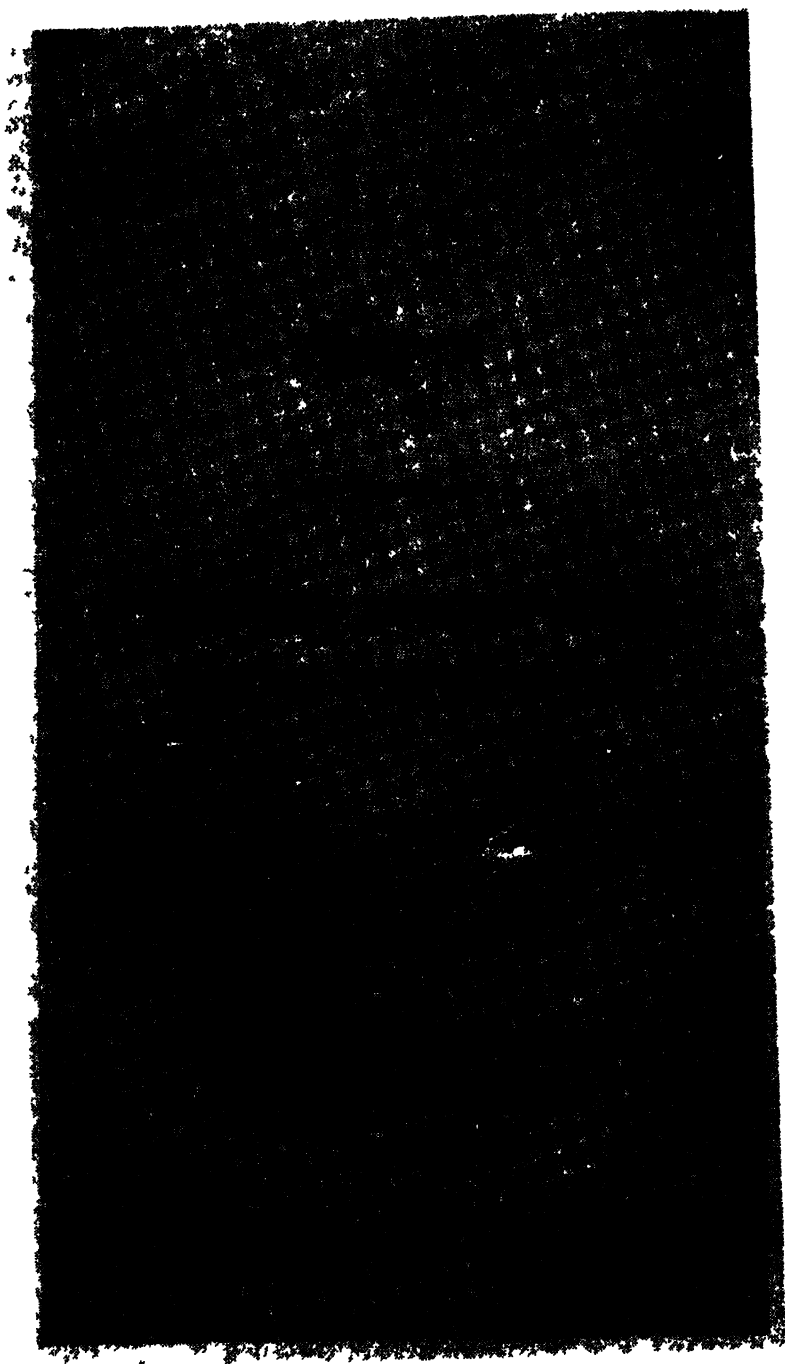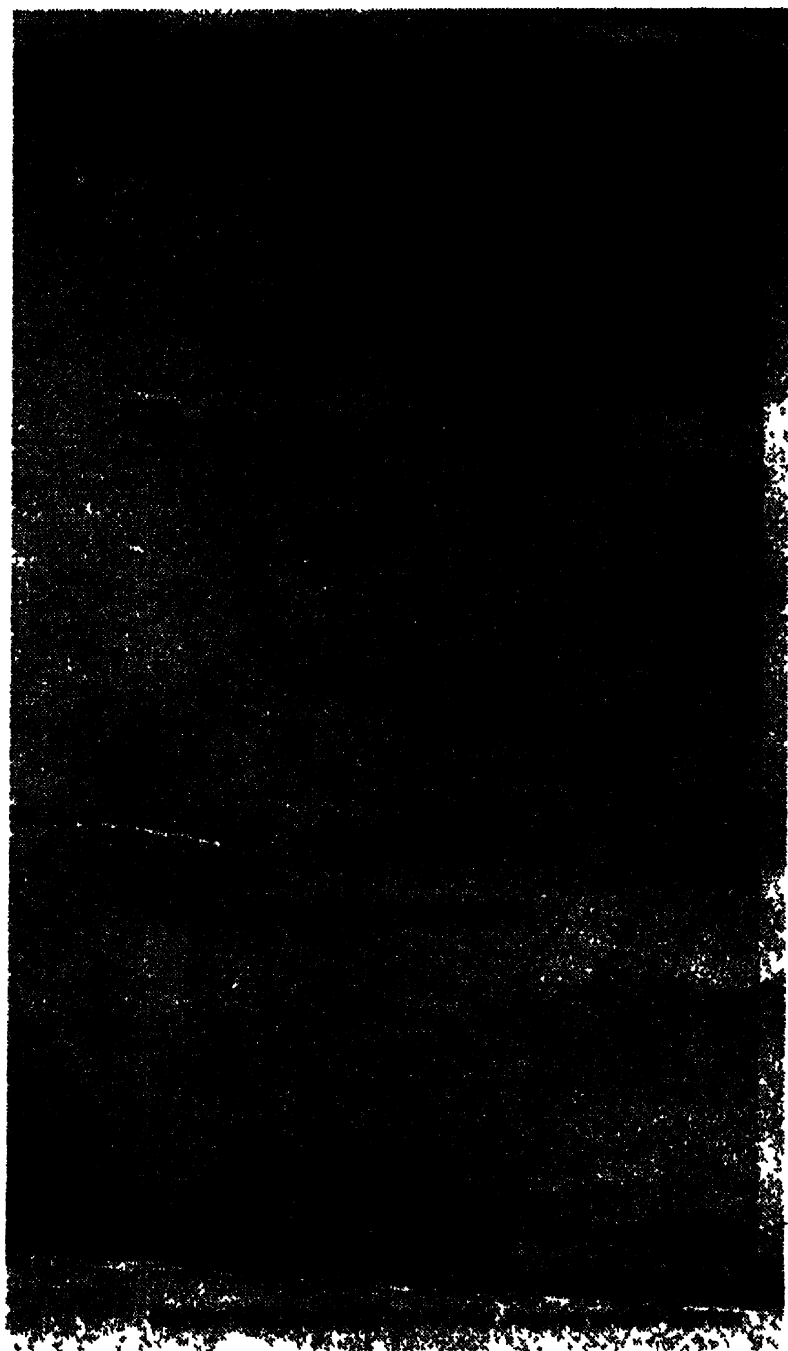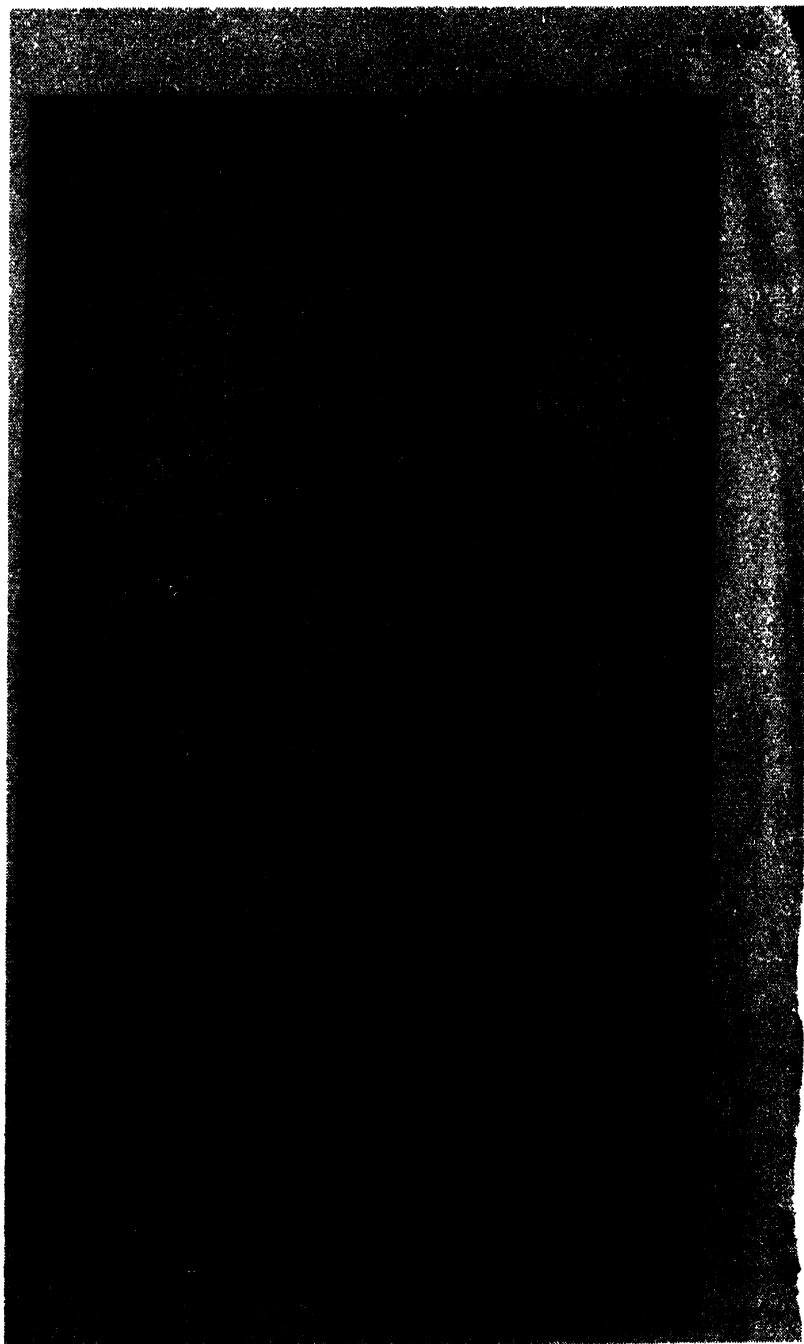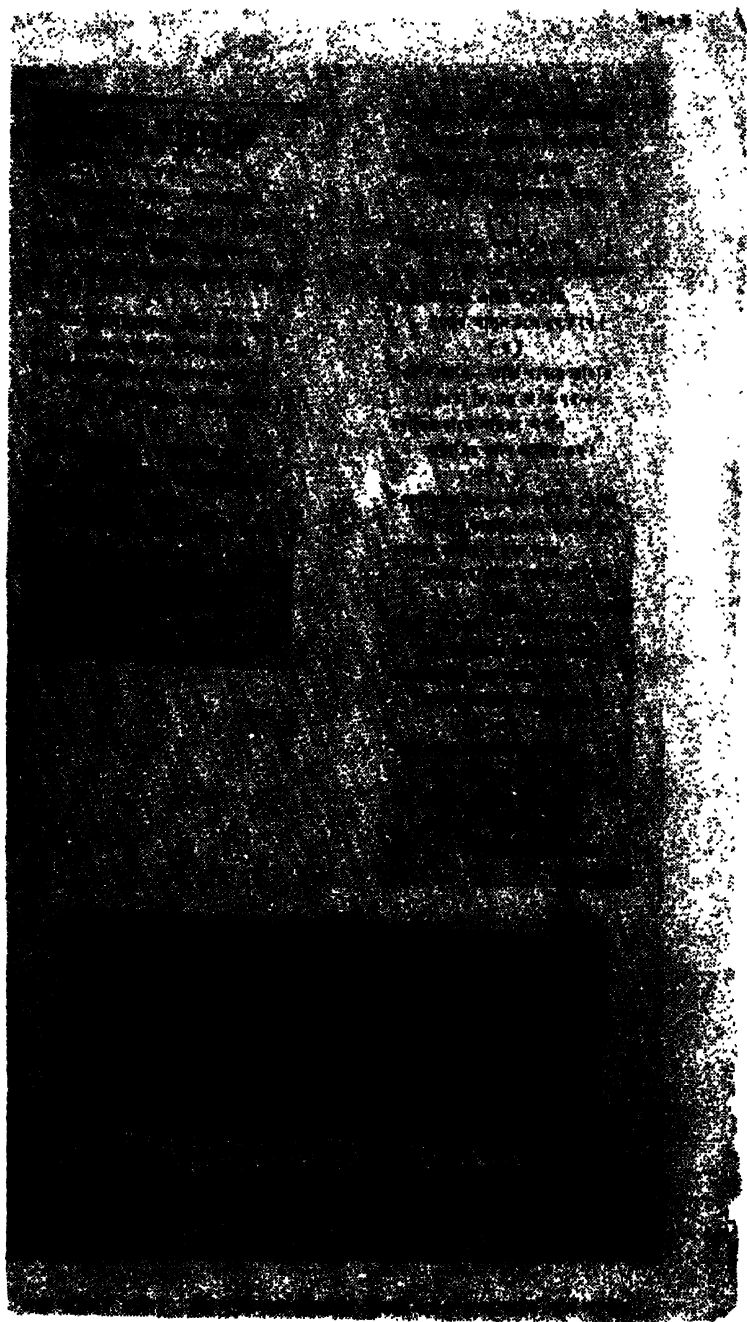
Rabindranath Tagore
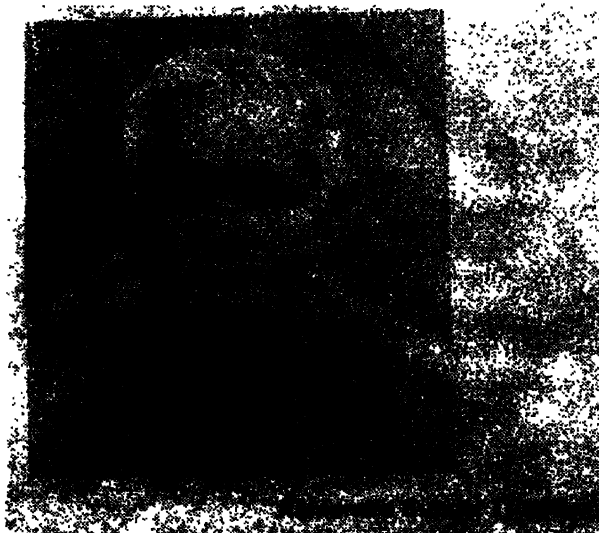
Atul Prasad Sen

Dwijendralal Roy

Kaliprasanna Kabya Bisharad

Rajani Kanta Sen

Sakharam Ganesh Deuskar in death bed

'বন্দেমাতরম্' বলে নাচ রে সকলে কৃপাণ লইয়া হাতে...

'বন্দে মাতরম' এ দুটি শব্দের ধ্বনি বঙ্গদেশের গ্রামে-গঞ্জে শহরে-টাউনে অলিতে গলিতে প্রতিধ্বনিব ব্যাপকতায় এক গভীর আর্তি জাগিয়ে তুললো প্রচণ্ড মাদকাতায়। বাঁধনহীন প্রবাহের বেগে জন-জাগরণের উৎসাহ এমনভাবে বেড়ে যাচ্ছিল যে, শাসককর্তারা তাতে বিব্রত তথা প্রচণ্ড প্রতিরোধে মত্ত হয়ে উঠলেন। দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান হারিয়ে ছোট-বড়ো সর্বস্তবের মানুষ—যাঁরা পথে-ঘাটে, সভাসমিতিতে সেই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করতেন—তাঁদের উপর চন্ডনীতিতে ঝাপিয়ে পড়তে এতটুকু সময় লাগলো না শাসককর্তাদেব। শুরু হলো ধ্বনির সূত্র ধরে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে ঢুকে লাঠি চালান—শারীরিকভাবে কিল-ঘুষিসহ চুলের মুঠি ধরে উপরে তুলে নিচে আছাড় দিয়ে ফেলে দেওযা। অসহ্য অমানবিক চণ্ডতার তীব্রতা এতদূর ছড়িয়ে গেল যে পথচারীরা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হতে লাগলেন। শুধু তাই নয়—আইন করে হুকুম জারি করা হোল—প্রকাশ্যস্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া যাবে না—কোন সভা-সমিতি তথা মিছিল করা যাবে না—তাতে নাগরিকদের জীবন-প্রবাহে শান্তি বিঘ্নিত হবে—সরকারের কাজ শান্তি রক্ষা করা।

১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে চিপ সেক্রেটারীর এই নির্দেশনামা সর্বত্র কার্যকর করার জন্য পুলিস এবং আঞ্চলিক ভারপ্রাপ্ত শাসকবর্গের তৎপরতা গভীরভাবে পরিপূর্ণ শক্তিতে কার্যকর হতে লাগল।

স্বাভাবিকভাবে জেলায় জেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্ররা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিত, জেলা শাসক তা জানতে পারলে এবং তৎক্ষণাৎ এতটুকু সময় বিচার বিবেচনা না করেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশ দেওয়া হতো এবং অভিযুক্ত ছাত্রদের পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্য ভয় প্রদর্শন করত।

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেবার জন্য বরিশালের বিধুভূষণ, বাখরগঞ্জের বিলাসচন্দ্র বিপিনচন্দ্র গুহ, ললিতমোহন গুহ, ইন্দ্রচন্দ্র গুহ, টাঙ্গাইলের জগদীশ বক্সি, জিতেন্দ্রকান্ত বসু রংপুরের বনকাঠিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিশেষ ছাত্রদের মারতে মারতে আদালতে হাজির করা; বরিশালের বানারীপাড়ায় প্রায় প্রতিটি বাড়ির লোকদের উপর কঠোর নজর রাখা হয়েছিল—তা সত্ত্বেও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বন্ধ করা যায়নি। বরিশালের পুলিশের সহকারী সুপারিনটেন্ট ফক্‌নার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে ছোট ছোট ছেলেদের, যারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি কারণে অকারণেই দিত তাদের ধরে হাতে-পায়ের গাঁটের উপর সজোরে লাঠি চালিয়ে অত্যাচার করত। গ্রামে-গঞ্জের মানুষ যারা নিত্যদিনের বাজার করত এবং দেশীয় জিনিষ ক্রয় করত তাদের উপরও সরকার নজর রাখত এবং সুযোগ পেলে ধরে নিয়ে লাঠি চালিয়ে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করাতে

বাধ্য করত। **মাদারীপুরের এস. ডি.ও ব্রিস্কো** আদেশ জারী করে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করার বাধ্যতা সম্পর্কে প্রচার করল এবং যে তার অন্যথা করবে তাকে শাস্তি পেতে হত।

বরিশালের ভোলার নামকরা উকিল মহেশচন্দ্র রায় ও নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত জনসাধারণকে বিলেতি লবণ ক্রয় করতে বাধা দেওয়ায় শাসকের কোপদৃষ্টিতে তাদের জরিমানা ও শাস্তি হয়।

রংপুরের কুড়িগ্রামের ঈশানচন্দ্র ঘোষ বিলেতি কাপড় কিনে বাড়ী ফেরার পথে জীবনকৃষ্ণ দত্ত এবং পরেশচন্দ্র রায়ের অনুরোধে ঈশানবাবু পথিমধ্যে বিলেতি কাপড় পুড়িয়ে বাড়ী যান। এ খবর জানাজানি হবার মুহূর্ত মধ্যে জীবনবাবু-পরেশবাবু এবং ঈশানবাবুর জরিমানা হয়।

ফরিদপুরের রাজবাড়ীর মোহর মোল্লা, **বাখরগঞ্জের** মন্তাজ আলি, ইয়াকুব আলি, **ঢাকার নরসিংদির** লালু বাদ্যকর, রাজকুমার চক্রবর্তী—এদেরও বিলেতি লবন বিক্রয় বন্ধ করায় সরকারী আদেশে তাদের জরিমানা হয়।

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে দেশ-শক্তির প্রতি আনুগত্য জানাবার পরিকল্পনায় জাতীয়স্তবে সকল মানুষের ভাবনাকে উৎসারিত করার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার একটি স্তর ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করা। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক তারপর প্রসারিত স্থানীয় জনসাধরণের চিত্তকে **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনির মধ্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার এক প্রবল অথচ প্রচ্ছন্ন প্রেরণা জুগিয়ে যাঁরা এগিয়ে ছিলেন তাদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষক। 'বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পাঠ্যক্রমের আলোচনায় অন্তর-ভাবনার যোগসূত্রকে জাতীয় ভাবনার প্রেরণায় উৎসারিত করতেন—দেশ ও জাতীর স্বাভিমানের ঐতিহ্যকে প্রচ্ছন্নভাবে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সাবধানতায়। এতটুকু অশালীন মানসিকতাকে শিক্ষকগণ প্রশ্রয় দিতেন না। অন্তরের নিবিড়তম স্থানে পবিত্র-বোধের প্রেরণাকে সঞ্চারিত করার জন্য চারিত্রিক নৈপুণ্যকে আশ্রয় করতেন। তাই রাজশক্তি যখনই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি ও তৎসংক্রান্ত উত্তেজনা-বর্ধক আচরণ দমনের জন্য নির্দেশ জারি করল তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই সম্মিলিতভাবে তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলতেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানহেতু কোন শাস্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই শিক্ষকগণ সরকার নির্দেশিত যে কোন শাস্তির অন্তরায়। এই ভাবনাকে সর্বত্র শিক্ষকদের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা হল। বিদ্যালয়ের ভেতর শাসকদের কোন নির্দেশ মান্য করা হলে শিক্ষকদের সম্মান এবং পবিত্র দায়িত্ববোধের উপর হস্তক্ষেপ করা বলে অনুভূত হল।

এই ধরণের মানসিক উত্তরণে বাঙলার গ্রামে-গঞ্জের সর্বত্র শিক্ষক সমাজ অন্তর-শক্তির 'আলোকে অভাবনীয় সাহসিকতায় এগিয়ে এলেন।

মাদারিপুরের প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে **পালঙ-তুলাসার-চিকন্দী-লোনসিঙ-কার্তিকপুর-পণ্ডিতসর-গোপানপুর-খালিয়া-বাজিৎপুর-বিঘারি-র** শিক্ষকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ের অন্দরমহলের বিধিব্যবস্থায় শাসকদের হস্তক্ষেপ কোনভাবেই গ্রহণীয় নয় বলে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা তথা সভা-সমিতিতে যোগদান করার নৈতিক অধিকার প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীব নিজস্ব সত্তার অধিকার। সেখানে কারুব নির্দেশ বা শাসন কোন শিক্ষক বরদাস্ত করতে পারেন না। **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনির জন্য ছাত্রসমাজ তথা বিদ্যালয়গুলিতে **ফুলার সাহেবের** শাস্তি প্রদানের কোন পদ্ধতির কার্যকর রূপ পেল না। তার ফলে শাসকদের নতুন করে শাস্তির কৌশল ও তা কার্যকর করার পরিকল্পনায় দ্রুত **'স্পেশাল কন্‌স্টেবল'** পদের সৃষ্টি হল। কিন্তু তাতে ও **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি তথা **'বয়কট'** আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হল না।

এদিকে রংপুরে লাটবাহাদুর আসবেন—তার জন্য **জেলাশাসক এমারসন** লাটবাহাদুরকে সংবর্ধনা জানাবার পরিকল্পনা করে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী তথা সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের যুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত শিক্ষিত ও সন্মানীয় নাগরিকগণ তাতে আপত্তি জানালেন। যাঁরা আপত্তি জানিয়ে ছিলেন তারা প্রকাশ্যে তাঁদের অভিমত প্রকাশ কবেছিলেন। তাঁরা এই প্রথম শাসক এমারসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় এগিয়ে এলেন—প্রখ্যাত উকিল উমেশচন্দ্র গুপ্ত, উকিল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এসটেটের ম্যানেজার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বরদাপ্রসাদ বাগচী, কমিশনার রাধারমণ মজুমদার, মহামেডাম সঙ্ঘের যুগ্মসম্পাদক মৌলভী আসফ খাঁ।

জেলাশাসক এমারসনের নির্দেশে সায় না দেবার জন্য রংপুরের অনেকের সঙ্গে বিশিষ্ট কিছু নাগরিককে ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল—কিন্তু প্রতিবাদ প্রবাহ স্তব্ধ হয়নি।

ব্যারিষ্টার তথা রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, উকিল রজনীকান্ত ভট্টাচার্য 'রংপুর বার্তাবহ' সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, 'দেশী দোকান পরিচালক উকিল উমাকান্ত দাস সহ বহু শিক্ষক 'স্বদেশী ভাবনায়' যুক্ত থাকায় অপমানিত হয়েছিলেন 'স্পেশাল পুলিশ' বাহিনীর হাতে। সে এক 'মর্মান্তিক কালরাত্রির মত দুঃসহ। তবুও শাসকের কাছে মাথা নত তাঁরা কেউ করেন নি।

রাজশাহীতে 'স্বদেশী' সভা আলোচনা বন্ধ করা হল। তার প্রতিবাদে একটি নিভৃতস্থানে বড় রকমের ঘরোয়া আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল। পুলিশ তা জানতে পারল এবং বিদ্যুৎ গতিতে গুর্খা পুলিশ দিয়ে সেই ঘরোয়া আলোচনা বন্ধ করে দিল। নিদারুণ লাঠির ক্রমাগত প্রহার এবং বিশেষ কবে ছাত্র-যুবা-কিশোরদের হেনস্থা করার গতি বেড়েই চলল। কিন্তু তারই মধ্যে 'ক্লান্ত কণ্ঠে বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির প্রতিধ্বনি আরোও আরো উত্তেজিত করে তুলেছিল 'পুলিশের অত্যাচারের তীব্রতা। চাঁদপুরের সজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিকিৎসক ডাঃ শশধর নিয়োগীরা নানাভাবে পুলিশের প্রহারে বিধ্বস্ত হলেন।

সবচেয়ে তীব্র আক্রমণের, অত্যাচারের শিকার হলেন বরিশালের খ্যাতনাম নাগরিকবৃন্দ। শতাধিক গুর্খা পুলিশ সমস্ত বরিশালে টহল দিত—রাস্তায় অকারণে পথচারী, দোকানীদের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ তুলে নিতে বাধা দিলে প্রহার করত। রাস্তায় বা দোকানে কোথাও 'বন্দেমাতরম্' এই শব্দ দুটির পোষ্টার দেখলে উম্মাদের মত মারমুখি হয়ে তা ছিঁড়ে ফেলত।

সিরাজগঞ্জে পুলিসের অত্যাচার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকত না। অত্যাচারের পরিধিও লাগামছাড়া। তার প্রতিবাদ করতে সাহস তেমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে হল না।

পরিস্থিতি এমনভাবে চলতে চলতে নির্দেশ জারি করা হল প্রকাশ্যস্থানে কোন মিছিল বের করা যাবে না—এমন কি নাগরিকগণের সামাজিক, পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানের জন্য রাজপথে সমাবেশ করা যাবে না। শাসকের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে মিছিল করার অনুমতির আবেদন জানাবার সূত্রে অনুমতিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হ'ল.....

> ....No acts or words having conecting with the Swadeshi agitation will be employed while the proession is in progress.

এদিকে দেশের বিভিন্ন শহরে ও গঞ্জে (ময়মনসিংহ-বরিশাল-মাদারিপুর-রংপুর) মিছিল করার, স্বদেশী বক্তব্য বা ধ্বনির উপর নিষেধ জারি করা সত্ত্বেও ছাত্র-যুবা সংগঠনগুলি তা মান্য না করার ফন্দি আটল। নানাভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে ছোট-বড় নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণ 'সঙ্ঘবদ্ধভাবে' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি এবং 'বয়কট' প্রেরণায় জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল।

ময়মনসিংহের হাকিম এল. ও. ক্লাক স্বদেশী ভাবনার প্রচারের এ ধরনের কাজে অত্যন্ত রাগান্বিত। তিনি ময়মনসিংহের লালবাজারে অবস্থিত কিছু দোকানীদের বিলেতী দ্রব্য বিক্রয়ের রমরমা পরিবেশ স্থাপনে উৎসাহ দিলেন। শহরের 'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ রায় সেইসকল দোকান, যেহেতু লালবাজারের মধ্যস্থলের বড় রাস্তায়, দ্রুত সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন এবং ক্লাককে জানিয়ে দিলেন যে, 'চেয়ারম্যানের নিজস্ব অধিকারেই সঙ্গত কারণে তা করা হয়েছে। শাসক বিরোধী মিছিলে এবং জমায়তে ময়মনসিংহের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ বল সরকারী নির্দেশের পরোয়া না করে বক্তব্য রাখলেন। সরকার বিরোধী স্বদেশী সভায় সবচেয়ে বেশী ছাত্রদের উৎসাহ এবং উদ্যোগ ছিল গভীর ও ব্যাপক। তার মাসুলও গুনতে হয়েছিল ছাত্রদেরই-বেশী অত্যাচার সহ্য করে। ছাত্র-পীড়ন, দমন

একসময় এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই তার প্রতিরোধে গভীরভাবে পরিকল্পনা করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে গোপন আস্তানায় জড় হতেন-স্থির করতেন পন্থা ও কৌশল। কিন্তু শাসকদল পবপর কতকগুলি নির্দেশ জারি করে ছাত্র ও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের উপর নজর বাখতেন এবং গোপনে গোপনে কিছু কিছু ছাত্রকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে খবর সংগ্রহ করে অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যাচার করতে এতটুকু সময় নষ্ট কবত না।

কালাইল সারকুলার (১৯০৫ অক্টোবর)—**ফুলার সারকুলার** (১৯০৫-অক্টোবব) —**পেডলার সার্কুলার** (১৯০৫ অক্টোবর)—**ক্লার্ক সারকুলার** (১৯০৫ নভেম্বর)—**হলওয়ার্ড সারকুলার** (১৯০৫ নভেম্বর)—**লায়ন সারকুলার** (১৯০৫ নভেম্বর) প্রভৃতি সারকুলারের সূত্রে নানাভাবে স্বদেশীভাবনার আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা সচল হল। **রাজশাহী-রংপুর-মাদারীপুর-বরিশাল-ময়মনসিংহ** নগরগুলিতে ছাত্রদের-শিক্ষকদের আচরণের প্রতি নজরদারি রাখার কঠোর ব্যবস্থা ব্যাপক ছিল। সুশাসন ও সু-শিক্ষা প্রচলনের নামে শাসকদল পুলিশের সহযোগিতায় **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি ও স্বদেশী-আলোচনার-স্থান ও ঘটনা প্রতিদিন সংগ্রহ করে বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করত।

'বন্দেমাতরম্' এই মন্ত্রের ধ্বনি সমন্বিত অন্তর শক্তির তেজ, বারবার পূর্ববঙ্গের আকাশে-বাতাসে তার নদ-নদীতে ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইয়ে দিয়েছিল। স্বাভাবিক গতির দুর্বার প্রবাহ প্রতিরোধ করার জন্য শাসকদলের এতটুকু কসুর ছিল না। বেপোরোয়া হয়ে কারণে অকারণে ছাত্র-যুবা-শিক্ষক-মান্য নাগরিক সকলকেই নানাভাবে আক্রমণ করত, হেনস্তা করত, লাঠির আঘাতে আঘাতে পঙ্গু করত।

মেদিনীপুর স্বাধীনতার জন্মভূমি। এর ভৌগলিক দিক থেকে এর মাটি এর বনানী গভীরভাবে বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র। বিদেশী দ্রব্য বর্জন-স্বদেশী গ্রহণ, এই মানসিকতার প্রবাহ ও প্রসার যাতে দেশের মানুষেব অন্তর-সত্তার মধ্যে সঞ্জীবিত হয় তার জন্য নানাদিক থেকে চেষ্টা চলছে। **১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে ওখানে একটি আয়োজন হল মেদিনীপুরে 'কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী'।** প্রদর্শনীর প্রথম দিন থেকেই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মানুষের উৎসাহ বেশ জমিয়ে তুলেছিল। প্রদর্শনীতে স্থানীয় দরিদ্র মানুষের হাতে গড়া জিনিষপত্র বেশ জায়গা জুড়ে ছিল। এরই মধ্যে একটি কিশোর, বয়েস পনের হবে, একটি ছাপানো বুলেটিনে উল্লিখিত **'এরাই কি আমাদের রাজা' শিরোনামের উপরেই প্রদর্শনীতে তা বিতরণ করছিল। স্থানীয় পুলিস আইন-শৃংখলা অমান্য করা হচ্ছে বলে তাকে ধরল—কিন্তু কিশোর তার সহজাত শক্তির দাপটে ঝাপ্টা মেরে পুলিশের নিশানা থেকে নিজেকে মুক্ত করে অন্যত্র সরে গেল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই কিশোরের নাম 'ক্ষুদিরাম বসু'র বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়না জারি হল। ক্ষুদিরাম কিন্তু এতটুকু** বিচলিত হলেন না। নিয়মিত স্বদেশীভাবনার প্রসার **ঘটিয়ে চলেছেন সে সময় প্রায়ই ক্ষুদিরাম 'বন্দেমাতরম্ তাঁতশালায়'** রাত্রি যাপন করেন। পুলিস নানাভাবে খোঁজ খবর দিয়ে একদিন গভীররাতে সেই তাঁতশালায়

হানা দিয়ে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে। ক্ষুদিরাম বয়সে নবীন; রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ না পেয়ে পুলিস তাঁকে মুক্তি দেয়।

ক্ষুদিরামের স্বদেশীপ্রসারে আরো একজন প্রেরণা দিয়েছিলেন—**তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু**। ল্যান্ড এ্যাকুইজিসনের একজন কেরানী, বয়সে বেশ বড়। তিনিও ঘটনাচক্রে **'স্বদেশীওয়ালা'** সন্দেহে দুর্লভ চাকুরীটি হারালেন।

এই দুটি ঘটনায় মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ 'তথা 'স্বদেশীওয়ালা'রা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

সময়টা ১৯০৬, ১৪-১৫ এপ্রিল। বরিশাল। অত্যাচার, অত্যাচার সহ্য করে করে বরিশাল তেতে **উঠছিল ঘরে-বাইরে-অলিতে-গলিতে। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত পীঠস্থান বরিশাল**। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করা হল বরিশালেই। **অধিবেশনের সভাপতি স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার এ. রসুল। ব্যারিষ্টার এ রসুল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধী**। বরিশালে সাজসাজ ব্যস্ততা। কলকাতা থেকে 'বহু প্রতিনিধি এলেন বরিশালে তাদের স্নানাহারের ব্যবস্থার পুরো ভার নিয়েছিলেন **জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস**।

প্রতিনিধি, যারা বিভিন্ন শহর ও জেলা থেকে বরিশালের অধিবেশনে যোগদানের জন্য এসেছিলেন তাদের বরিশালে পৌছনোর ব্যাপারেও শাসকবর্গ নানা ছল-কৌশলে করে হেনস্থা করেছিলেন। স্টীমার পরিচালন সমিতির নিয়ন্ত্রণও ছিল শাসকদের নির্দেশে। তাই বরিশালে পৌঁছবার আগেই **জলাবাড়ীতেই** শুরু হল নানা অছিলায় প্রতিনিধিদের অধিবেশন স্থলে যোগদানের নানা প্রতিবন্ধকতা। রাত্রিতে অত্যধিক বিলম্বে স্টীমাব প্রতিনিধিদের নিয়ে পৌছল। বরিশালে স্টীমার পৌছানোমাত্র **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনিতে আগত প্রতিনিধিদের আবেগ উচ্চকোটীতে প্রকাশ পেলেও কোথায় যেন একটা 'নীরবতা'র প্রচ্ছন্ন ইংগিত অনুভূত হল। প্রতিনিধিগণ কিছুটা হতবাক্ হলেন। পরে অভ্যর্থনা সমিতির মান্য সদস্যগণ, যাঁরা প্রতিনিধিদের আবাহন করতে জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে জানা গেল প্রকাশ্য স্থানে **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি নিষিদ্ধ। তাতে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে অসন্তোষের বাষ্প উষ্ণ হয়ে উঠল। ক্ষোভ ও বেদনার বাতাবরণে আগত প্রতিনিধিগণ স্টীমার থেকে নেমে এলেন। কিন্তু সেই রাতে অধিকাংশ **প্রতিনিধি নীরব প্রতিবাদে অনাহারে কাটিয়ে দিলেন**।

বিষয়টি অভ্যর্থনা সমিতির কর্তাব্যক্তিদের নজরে আসে এবং গুরুত্ব সহকারে গভীর রাত্রিতেই আলোচনায় স্থির করেন যে পরদিন (১৪ই এপ্রিল) সকালে অধিবেশনস্থলে উপস্থিত হয়ে **'বন্দোমাতরম্'** ধ্বনি দেওয়া হবে। রাস্তায় বা প্রকাশ্যস্থানে **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনির নিষিদ্ধ নির্দেশ অধিবেশনের সুষ্টু কার্যাবলী সম্পাদনের অনুকূলে মান্য করা হবে।

যথাসময়ে প্রতিনিধি আবাসস্থল থেকে অধিবেশনস্থলে সারিবদ্ধভাবে এসে জমায়েত হচ্ছেন-সম্মুখভাগে অধিবেশন **সভাপতি ব্যারিষ্টার এ. রসুল** ভাইকে অনুসরণ

কবে চলেছেন **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়,** ভূপেন্দ্রনাথ বসু সহ অন্যান্য আগত প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক দল।

হঠাৎ আচমকা তড়িৎগতিতে কিছু লাঠিধারী পুলিশ অকারণে (**'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি তখনও দেওযা হযনি) সেই শৃংখলাযুক্ত সুস্থ শোভাযাত্রায় ঝাপিযে পড়ল এবং কিছু না বোঝাব আগেই মারতে লাগল নির্বিচারে নির্মমভাবে।

> ..These youngmen had done nothing; They had not even before the assault uttered what to the Government of East Bengal was an obnoxious cry. That of **'Bande Mataram.'**

আহত হলেন ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায, ব্রজেন্দ্রনাথ গাংগুলি, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বেচারাম লাহিড়ী, যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী সহ আবো অনেক স্বেচ্ছাসেবকগণ। বক্তপাত-মাথায় আঘাতজনিত জ্ঞানশূণ্যতা ডান-বাম হাতের হাড় ভেঙে দেওয়া সহ অশোভন আচরণে তছ্নছ্ করে দেওয়া হল। এলোপাথারি আঘাতের পর আঘাতে অপ্রত্যাশিত একতরফা রণ-উন্মাদনায় স্বাভাবিকভাবে স্বেচ্ছাব্রতীদের মানসিক অস্থিরতা বেড়ে গেল। **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি আপনা থেকেই অন্তর-শক্তির প্রেরণায় বাববার আঘাতের জ্বালায় ধ্বনিত হয়ে কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন মাদকতায় ভরে গেল। **মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনের মাথায় মিছিলের ভেতর থেকে লাঠির আঘাত পড়ল**—সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' উদাত্ত ধ্বনিতে পরিবেশ আরো **বেশী করে আঘাতের পর আঘাত** আর **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনির **প্রত্যুত্তর যেন পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে চিত্তরঞ্জনকে** তাড়িত **করে একটি** পুকুরের **মধ্যে নিয়ে চলল**। কিন্তু সেখানেও **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনির প্রবলতায় পুলিশের লাঠি তীব্রতর হল। অবশেষে অচৈতন্য অবস্থায় **পুলিশ চিত্তরঞ্জনকে পুকুর থেকে তুলে পুকুরের পারে শুইয়ে দিল**। সে বীভৎস উন্মাদনা, একটা লাগামহীন নৃশংসতার বেনজির ঘটনা।

এই ঘটনায় হতবাক্ **সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী** পুলিশের সম্মুখে গিয়ে প্রতিবাদ কবতেই তাঁকে বন্দী করা হল এবং **'বন্দেমাতরম্'** ধ্বনি দেবার প্ররোচনায় সুরেন্দ্রনাথকে জেলা-শাসক এমারসনের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হল। সেসময় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি **অশ্বিনীকুমার দত্ত-বিহারীলাল রায়** সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা বন্দী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই রওনা হলেন এমারসনের বাড়ীতে-সেখানেই এজলাস বসল। এমারসন তপ্ত, ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। তিনি **অশ্বিনীকুমার সহ সুরেন্দ্রনাথের অনুগামীদের** দেখতে পেয়ে তীব্র কণ্ঠে 'নিকালো' বলে চিৎকার করলেন। কিন্তু কিছুই হল না। সুরেন্দ্রনাথ এজলাসেই একটি চেয়ারে বসে আছেন—এ দৃশ্য দেখে এমারসন আরো রেগে গিয়ে আসামী সুরেন্দ্রনাথকে অপমান করলেন এবং চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম করলেন। সুরেন্দ্রনাথ

নিশ্চল—তাতে এমারসনের আরো রাগ বেড়ে গেল এবং বেশীক্ষণ এ অবস্থায় না থাকতে পেরে সুরেন্দ্রনাথকে বে-আইনী মিছিল পরিচালনার নেতৃত্ব দেবার অভিযোগে দু'শত টাকা জরিমানা করলেন। তখন সুরেন্দ্রনাথের হাতে এত টাকা না থাকায় এমারসনের নির্দেশে আর এক সাহেবকে নিযুক্ত করলেন জরিমানা টাকা পুরো আদায় নিয়ে তাকে মুক্তি দিতে। সেইমত সুরেন্দ্রনাথকে দু'শত টাকা জরিমানা পরিশোধ করিয়ে মুক্তি পেতে হল।

ছাড়া পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ দ্রুত ছুটে গেলেন সেই অধিবেশন স্থলে; পৌছতেই উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে শত উৎসাহিত আনন্দে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়ে দিলেন। সেই অধিবেশন মঞ্চে তখন ছিলেন মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ; কৃষ্ণকুমার মিত্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপধ্যায়, আবদুল হালিম গজনী, আনন্দচন্দ্র রায়, দীন মহম্মদ আলি, অনাথবন্ধু রায়, যাত্রামোহন সেন, হাজি মহম্মদ ইসমাইল; কামিনীকুমার মুখার্জি, নিবারণ চন্দ্র দাস, রজনীকান্ত নন্দী, মৌলভী হেদায়েত বক্স, শচীন্দ্রনাথ সিংহ, ইন্দুভূষণ মজুমদার, মৌলভী গোলাম মস্তলা সহ বাঙলার বিভিন্ন জেলার এবং স্থানীয় গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ।

সভা যখন চলছিল তখন মনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা মঞ্চে উঠে পুত্র চিত্তরঞ্জনের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার উল্লেখ করে চিত্তরঞ্জনকে সভায় দাঁড় করিয়ে সকলকে দেখিয়ে দেন। সকল তর্ক, সকল বক্তব্য নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল—তার স্থলে ক্ষোভ-বেদনা-ক্রোধ সঞ্জাত তপ্ত বাতাস সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করল।

আলোচনার স্থির হয় দেশের মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে—এমন সব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে দেশের মানুষ শাসকদের অত্যাচারের মুখোমুখি না হন অথচ প্রতিরোধের জন্য মন-প্রাণ-চিন্তা ও ভাবনাকে 'স্বদেশমূলক জাতীয় স্বার্থজনিত' কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পরের দিন (১৫ই এপ্রিল) সভায় সর্বসম্মতভাবে বঙ্গের বঙ্গভাষী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ সংহত কর্মধারায় স্বদেশ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঞ্চলে বিদেশীদ্রব্য বর্জনের মানসিকতাকে কার্যকর রূপ দেবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সূত্রে 'জাতীয় শিক্ষা' প্রচলনের প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয়।

সভা চলাকালীন পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও জেলা হাকিম এমারসন স্বাক্ষরিত একটি ফতেয়া জারি করা হল—সভা শেষে কোন ধ্বনি, 'চিৎকার' তথা অসংযত কোন বে-আইনী কাজ করা চলবে না। পুলিশের কর্তাব্যক্তি, যিনি ফতোয়াটি সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছিলেন, আরো জানালেন যে কোনভাবেই সভা শেষে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি চলবে না। ফলে উপস্থিত জন-মানসে রোষ বেড়ে গেল এবং পুলিশ গুলি চালিয়েও সভা শেষ না করা পর্যন্ত কেউ সভাস্থল ত্যাগ করবেন না—এই প্রস্তাব পেশ করতেই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে অধিবেশনস্থলটি তপ্ত হয়ে উঠল

এবং অবশেষে প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির কর্তাব্যক্তিদের সহমতের ভিত্তিতে সভাস্থল থেকে ধীরে ধীরে সবাই চলে গেলেন।

কার্যতঃ বরিশালের অধিবেশন করা সম্ভব হল না। এদিকে বরিশালেই রাজনৈতিক অধিবেশনের সঙ্গেই একটি সাহিত্য সভার ও ব্যবস্থা হয়েছিল। উদ্যোক্ত ছিলেন লাখুটিয়ার তরুণ জমিদার সাহিত্যিক, কবি এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মামা দেবকুমার রায় চৌধুরী। কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই বরিশালের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত হবার জন্য পূর্বদিন (১৪ই এপ্রিল) বরিশালে এসেছিলেন। সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হয়ে বরিশালে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এর কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে (অবস্থা ও ব্যবস্থা) দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, বঙ্গচ্ছেদ হয়েছে বলেই সজ্ঞানে সযত্নে বাঙালিদের চিন্তার ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথেব এই ভাবনাকে বাংলার সকল অঞ্চলে সকল মানুষের অন্তবে জাগিয়ে বাখার জন্য জেলায় জেলায় সাহিত্য সম্মিলনের প্রয়োজন। কবির এই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য দেবকুমাররায় চৌধুরী বরিশালে রাজনৈতিক অধিবেশনস্থলে সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক অধিবেশন পন্ড হল ইংরেজের অশোভন আচরণে রক্তপাত ঘটিয়ে। সাহিত্য সম্মেলনও হতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ তাই ১৫ই এপ্রিল বরিশাল ত্যাগ করলেন।

রাজনৈতিক অধিবেশনও পন্ড হল। সবাই—বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সহ সবাই কলকাতায় ফিরে এলেন।

বরিশালের পন্ড অধিবেশনের সংবাদ তথা পুলিশের অমানবিক অত্যাচার সহ নানা ঘটনা পল্লীগীতিতে সুরায়িত হয়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে মানুষের অন্তরে দেশানুভূতির চেতনায় উত্তেজনা বাড়িয়ে দিল। সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হল—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। সভা-সমিতিতে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্ভাষণ জানাতে 'বন্দেমাতরম্' গভীরভাবে আত্মিক-অনুভবকে প্রসারিত করল।

নানা পত্র-পত্রিকায় বাঙালিদের সঙ্ঘবদ্ধ মানসিকতায় দেশবাসীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের তথা শাসকগোষ্ঠির অনমনীয় অত্যাচারের প্রতিরোধ করার কথা বলা হল। অনুগ্রহ বা সহযোগিতার মধ্য দিয়ে 'বাঙালির' স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। 'সন্ধ্যা'-'যুগান্তর'-'বেঙ্গলী'-ইন্ডিয়ান এম্পায়ার'-'হিতবার্তা' প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় বরিশালের প্রাদেশিক অধিবেশন যেভাবে শাসকগণ ভেঙে দিল তার তীব্র প্রতিবাদই শুধু লেখনীতে ফুটে উঠেনি—আগামীদিনের কর্ম-পথকেও গভীরভাবে নির্দেশিত করেছিল।

'বাঙালি'কে কোন অবস্থাতাতেই শাসকদের অত্যাচার 'গরু-ছাগলের মত' নীরবে সহ্য করা যাবে না। বরিশালের ঘটনা একটি প্রচন্ড আঘাত—শাসকশ্রেণীর অনমনীয় অত্যাচার কাপুরুষতার নামান্তর, হৃদয়হীনতার প্রত্যক্ষ ছবি—তাতে শান্ত আইনানুগ

বাঙালির চিত্ত যে কোন ভাবেই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের ভাবনায় মত্ত হয়ে উঠতে পারে: কোটি কোটি বাঙালির অন্তর থেকে বেরিয়ে আসবে—আর সহ্য নয়-নীরবতা কাপুরুষতা। ওঠো-জাগো-প্রতিরোধে সামিল হও-আঘাতে কাঁদলে চলবে না—প্রত্যাঘাত করতে হবে-জীবন সংগ্রাম-দেশ-সংগ্রাম-বঙ্গ তথা ভারতমাতার সম্মান রক্ষায় বাঙ্গালি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আর অপেক্ষা নয়-প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সংগঠিত হতে হবে—মনে রাখতে হবে এ জাতীয় অপমান, জাতীয় কলঙ্ক—তাই যে কোন পদ্ধতিতে অপমান-কলঙ্ক থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতেই হবে। 'হিতবার্তায়' বলেছে।

> ...পৃথিবীর অন্য যে কোনও অংশে বরিশালের অনাচার ঘটলে হাকিম এমারসনের মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেত। আর বহু সম্মানিত ব্যক্তি যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন তাতে সেই বির্লজ্জ বেহায়ার হাড় গুঁড়ো করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়াই ঠিক কাজ ছিল।...
>
> নিবীহ্ কিশোর ও যুবকদের রক্তপাত অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ-রক্তে শোধন করতে হবে।...এ দেশের লোকের ধৈর্য্যের শেষ সীমা নেই। কতদিনে তার বাঁধ ভাঙ্গবে সেইটাই লক্ষ্য করার বিষয়। (২৯এ এপ্রিল ১৯০৬)

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বরিশাল অধিবেশনে শাসকদলের অমানবিক অত্যাচার সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ করে বলল।

> ...অত্যাচার সহ্য করা সমস্ত জাতির অপমানের নামান্তর। প্রতিহিংসা সকল সময়েই পাপ নয়; জীবন সংগ্রামে এরও যথেষ্ট মূল্য আছে।...অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা এখন ভাবতে হবে। আর ফিরিঙ্গির কাছে দরবার না করে প্রতিবিধানের জন্য গোপনে যে প্রস্তুতি হচ্ছে এটাই বর্তমানে প্রধান লাভ।.....

ইতোপূর্বে পত্রিকাটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিভংগী তথা শাসনের কলাকৌশলের চাতুরী সম্পর্কে দেশের মানুষের চোখ খুলে দেবার অভিপ্রায়ে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পত্রস্থ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করল। প্রায় প্রতিটি বিষয়ের মর্মস্থলে বোঝাবার চেষ্টা হত যে, বাঙালিরা যে কারু অপেক্ষা হীন নয়, ছোট নয়। লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাঙালি জাতি সম্পর্কে যে সকল অবাঞ্ছিত বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'সন্ধ্যা' লিখল—

> ...এতদিন যে ইংরেজি বইপত্রে আমাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধোকা দেওয়া হচ্ছিল, কার্জনের বক্তৃতা সে-মোহ সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছে।...এখন আমাদের বিলুপ্ত আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যা বিদেশী শৃংখল আমাদের কায়িক বন্ধন

ঘটিয়েছে মাত্র, কিন্তু তাই দিয়ে আমাদেব মনের দাসত্ব ঘটতে দেব না। ইংরেজ শাসন সমগ্র ভারতবাসীকে একটা দাস জাতিতে পরিণত করছে।...

বয়কট আন্দোলন যে কোনভাবে বন্ধ করার কাজে ব্রিটিশ সবকার চণ্ডনীতিতে দেশজুড়ে অত্যাচার শুরু করল। বয়কট সফল হলে বিশেষভাবে বিপন্ন হবে ব্রিটিশ বণিকসমাজ। আব ব্রিটিশ-বাণিজ্য এ দেশে বন্ধ হয়ে গেলে তাদেব রাজত্বও বেশিদিন রক্ষা করা যাবে না। তাই বয়কট অন্দোলনের নেতাদের 'জেলে পুরে, আটক করে শহবে গ্রামে পিটুনি কর বসিয়ে সর্বপ্রকার বৈধ অবৈধ চণ্ড নীতি অবলম্বন কবে তা শেষ করার কুৎসিত পথ গ্রহণ করল। স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের উপব হুকুম জারি করা হল, ছাত্ররা যেন কোনভাবেই বয়কট রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করে, মিছিলে যোগদান না করে। শুধু তাই নয়—**বয়কট তথা স্বদেশী আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সরকারী পর্যায়েও সরকারের তল্পিবাহক খয়ের খাঁরা প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগল**। কোথাও কোথাও তারা সফল হযেছিল। তারা গ্রামে গঞ্জে প্রচার করল—**স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করা মৌলবীদের হুকুমতে গোণা বা পাপ।**

এমনি দেশের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভারতসম্রাট সপ্তম এর্ডয়ার্ডের পুত্র এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র প্রিন্স অব ওয়েলস বাঁধাধরা পথে-বিরাট ভোজ আয়োজনে যোগ দিয়ে কিছু কিছু দর্শনীয় স্থানে ঘুরে গেলেন। তিনি কিন্তু দেশের কোন ঘটনাই বুঝতে পারলেন না। জানতে পারলেন না দেশের মানুষ কি চায়, কেমন তারা আছে!

> ...দেবতা হউন আর মানবই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত চাবুক জেল জরিমানা পিউনিটিভ পুলিশ ও গোরা-গুর্খার প্রার্দুভাব, সেখানে ভীত হওয়া, নত হওয়ার মতো আত্মবমাননা, অর্ন্তযামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই।
>
> রবীন্দ্রনাথ

'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত হল—

> ...এইবার জেলে যাবার সময় হয়েছে। বাঙালিদের সৌভাগ্য যে দেশসেবার যোগ্য পুরস্কার মিলবে।
>
> ...ইংরেজ শক্তের ভক্ত, দুর্বলের যম। সে একমাত্র কামান-গোলাগুলি গর্জন, তরবারির ঝন্‌ঝনা বুঝতে পারে। বাঙালী শক্তি সঞ্চয় করে মারের বদলে ফিরিয়ে মার দিলেই ইংরেজ বন্ধুত্ব-স্থাপনে চেষ্টা করবে।

আরো তীব্র আহ্বান—

> ....বিদেশীদের অনুকরণে আমাদের চলবে না। আমরা নিজেদের

আদর্শে শাসনব্যবস্থা ঠিক করব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাইতে বাস করব। যদি ইংরেজ তার বিরুদ্ধাচরণ করে আমাদের সমস্ত সুপ্ত শক্তি সঞ্জীবিত করে তার প্রতিবাদ করব। ফিরিঙ্গির সহায়তা বা শত্রুতার প্রতি দৃকপাত না করে আমরা সর্বস্ব-পণে অগ্রসর হব। তাই দেখে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলবে। ফিরিঙ্গির প্রতি মোহ আমাদের দূর করতেই হবে। ফিরিঙ্গির এই কুহকে অভিভূত হয়ে ভুলে গেছ, তুমি অন্তর্নিহিত কত বিরাট শক্তির অধিকারী।

প্রকাশ্য অত্যাচারের প্রতিরোধে দেশবাসীকে সচেতন ভূমিকায় ঘর থেকে বের করে 'সন্ধ্যা' লিখল।

...যেমন পারবে সরাসরি মার ফেরৎ দেবে। যদি কপালে একটা ঘুষি জোটে সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে সে ঋণ-পরিশোধ করতে ভুল যেন না হয়। মরণের আবার ভয় কি? যে গান প্রকাশ্যে সকলে গায়, সেটা হচ্ছে—

যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম' বলে—

আরো বলছে..... শক্তি সঞ্চয় কর, স্বদেশী যাত্রার পত্তন কর, স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যাবার এবং ফিরিঙ্গির অপপ্রচেষ্টা প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ কর।....আজ যে লাঠি স্বদেশী দমন কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। একদিন সেই লাঠির সাহায্যে সরকারী তোপখানা লুন্ঠিত হবে।

......একদল যুবক চাই যারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বাস করবে যে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন এবং সেটা না দেখে তারা মরতে চাইবে না। ...দেশের নিভৃত অঞ্চলে যে শক্তি নিহিত আছে তার দ্বারা মহাবিপ্লব সংঘটিত হবে। জাগ্রত যুবশক্তি ধীর স্থিরভাবে তাদের কাজ করে চলেছে যাতে মহাশক্তি দেশমাতৃকা আনন্দমঠের সিংহাসনারূঢ়া হয়ে আবির্ভূত হবেন। হতাশ হয়ো না।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র সন্তান-ভাবনার সার্থক বাস্তবরূপ ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে সর্বত্র যাতে মাতৃভূমি-স্বদেশভূমির নামে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে সর্বত্র দুর্গ স্থাপিত হয় তার জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে সেদিন অত্যাচারিত শাসকশ্রেণীর প্রতিরোধ গড়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। লাঠি-সড়কি-খুন্তি, ছোরা, তীর ধনুক আর 'কালীমায়ির বোমা' প্রত্যেকের ঘরে ঘরে রাখার জন্য বলা হয়।

এক অর্থে 'বরিশাল কনফারেন্সের উপর অকারণ অমানবিক আক্রমণ-রক্তপাত

দেশের মানুষের ঘুম ভেঙে দিল। কঠিন ব্রতে মরিয়া হয়ে রণসাজে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলার আয়োজন চলল।

'সন্ধ্যা' আবার বলছে,

> ...মা ভৈঃ! সন্তান সব জেগেছে। চারিদিকে তার সাড়া পড়ে গেছে।
>
> ...আমাদের অন্তরে আগ্নেয়গিরির রুদ্ধ বেদনা। আমরা ভারতের মুক্তি চাই। আমাদের অঙ্গন থেকে কি-ভাবে ফিরিঙ্গি বিতাড়ন সম্ভব হবে, আমাদের শিক্ষার ধারা কেমন করে রক্ষিত হবে এবং ঋষি-আচরিত বিধি কি-ভাবে পালিত হবে, এই আমাদের একমাত্র চিন্তা।
>
> ...স্বর্গ আমরা চাই না; মুক্তি আমাদের কাম্য নয়। যতদিন না মায়ের বন্ধন মুক্তি ঘটছে, ততদিন আমরা বারে বারে ভারতে জন্মগ্রহণ করব।

জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের শাশ্বত-সত্যকে সামনে তুলে জাতিসত্তাকে জাগ্রত করার প্রয়াস গভীরভাবে দেশ-নেতৃত্বের অনেকের মধ্যেই প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করছিল। 'সন্ধ্যা' সেই সূত্র ধরেই বঙ্গ-যুবকদের চিত্তলোকে দেশ ও জাতির অতীতকে স্মরণ করে লিখল।

> ...আমরা অতীব গৌরবের অধিকারী : আমরা নিত্য, শাশ্বত, অমর। সমরক্ষেত্রে এসে তোমরা সকলে সমবেত হও। তখন দেশের নানা স্থানে প্রচণ্ড সংগ্রাম বেঁধে যাবে। মায়ের সন্তান সব আগ্নেয়, বারুণি ও বায়ব্য অস্ত্র শাণিত করে রণক্ষেত্রে ছুটে আসছে। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও, মুক্তি আসন্ন; মৃত্যুর পূর্বে আমরা শৃংখলমুক্ত মাতৃদর্শন করে যাব। আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ।

'সন্ধ্যা'র উত্তেজনাপূর্ণ লেখনিতে রাজশক্তি চিন্তিত হল। নানাভাবে 'সন্ধ্যা'কে বিব্রত করা হচ্ছে। বেপরোয়া প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পুলিশ গভীর রাতে সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করল। এজলাসে আসামী হয়ে একনাগাড়ে ব্রহ্মবান্ধব বসবার জন্য এতটুকু প্রার্থনা করলেন না। তাতে ব্রহ্মবান্ধব হার্নিয়ার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে কাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হলেন। সময়মত এজলাসে হাজিরা দিতে না পারায় বিচারক ক্ষুব্ধ হলেন—কিন্তু জেলের বাইরেও বেশীদিন ব্রহ্মবান্ধবকে রাখাও যাবে না। পাছে বাইরে থেকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করে।

রোগের যন্ত্রনা বেড়েই চলেছে। আবার 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত জ্বালাময়ী প্রবন্ধ পত্রস্থ হবার জন্য সম্পাদকের উপর মামলার পর মামলা চড়ে বসল। ব্রহ্মবান্ধব কয়েদি হয়ে দুষ্মনের জেলে যাবেন না। বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে, তাঁর অস্ত্রোপচার হল। কিন্তু 'আমার ডাক এসে গেছে—যেতেই হবে—কেউ ধরে রাখতে পারবে না। অবশেষে (২৭শে আগস্ট ১৯১০) সকল উদ্বেগের অবসান হল—ব্রহ্মবান্ধব চলে গেলেন।

'সন্ধ্যা' বঙ্গদেশের স্বদেশীমানসিকতার প্রত্যেকটি দেশসেবীদের কাছে চিন্তা ও ভাবনার হাতিয়ার রূপে কাজ করেছিল। **সম্পাদক—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়**—আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেইমত 'ব্রাহ্ম'ও হয়েছিলেন। পরে ভাব ও চিন্তায় ব্যাপক আলোড়নে ভবানীচরণ 'ব্রাহ্ম' ধর্ম ত্যাগ করলেন--এবং হলেন খ্রীস্টান। সেখানেও চিন্তার মন্থনে তেমন সাড়া না পেয়ে বৈদান্তিক হিন্দু ধর্মে নিজেকে গভীরভাবে নিবিষ্ট করলেন। খ্রীস্টান হয়ে ভবানীচরণ তাঁর নাম পরিবর্তন করেছিলেন। নিজেই নিজের নামের সূত্রে বলেছেন—'বন্দ্যোপাধ্যায়' এর 'বন্দ্য' ত্যাগ করে শুধু 'উপাধ্যায়' এইটুকু গ্রহণ করলেন। 'উপাধ্যায়' মানে শিক্ষক। তিনি মনে করেন 'বন্দ্য' বা প্রশংসিত হবার যোগ্য নন। এই ভাবনায় খ্রীস্টান হবার জন্য তিনি নাম নিলেন 'ব্রহ্মবান্ধব'।

খ্রীস্টান হলেও 'ব্রহ্মবান্ধব' ভারতীয় ভাবনার আদর্শ এবং সনাতন ভারত-পথ পরিত্যাগ করেন নি। খ্রীস্টান ধর্মের অন্তরস্থিত আকৃতির সঙ্গে ভারতীয় পথের কোন বিরোধ নেই বলে তিনি অনুভব করেছিলেন। একদিন ভারতবর্ষ সব ধর্মকে গ্রহণ করেছে, আত্মসাৎ করেছে। ব্রহ্মবান্ধব খ্রীস্টান ধর্মকে ভারতীয় ধর্মে পরিণত করতে চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবকে খুবই ভালবাসতেন—যদি উভয়ের আধ্যাত্মিক ও স্বদেশ **ভাবনার মধ্যে অনেক অমিলও আছে।** রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে **ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন ঘনিষ্ঠ প্রথম সহযোগী।** দেশ ও সমাজের বিচিত্র পরিবর্তিত ঘটনার প্রবাহ ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তায় বিভিন্ন পর্যায়ে গভীর প্রভাব ফেলে —যার **ফলে বৈদ্যন্তিক সন্ন্যাসী জীবনের ধারাবাহিকতার পরিবর্তন করে বৈপ্লবিক দেশ-ভক্ত তথা দেশপ্রেমের জাগরণের সমস্ত রকম আবেগ** উত্তেজনায় চিন্তার ঘৃতাহুতিতে নিমগ্ন হলেন। তার প্রকাশ **'সন্ধ্যা'** পত্রিকার উৎসারিত দেশাত্ম-বোধের, জাগরণের প্রবন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই রাজদ্রোহিতার অপরাধে ব্রহ্মবান্ধব অভিযুক্ত হলেন। তা সত্ত্বেও দেশ-হিতকর কাজে এতটুকু বিরাম তাঁর ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বদেশ-সাধনায় তাঁর কর্তব্য, তাঁর ভাবনা, তাঁর প্রেরণা বিধাতা-নির্দিষ্ট। প্রকাশ্যে আপন সত্যকে সামনে আনতে এতটুকু জড়তা তাঁর ছিল না। ব্রহ্মবান্ধব ভারতের তিনটি শত্রু—**'বৃথাভিমানী হিন্দু হিন্দু-রব নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল',— ইংরাজী-নবীশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্ষীর দল',—'সমন্বয়বাদী দল'** বলে অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—**ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নেই। তাই তিনটি কারণেই ভারতের অধঃপতন—অহৈতুক কর্ম এবং তাতে নৈসর্গিক অবসাদ আর্য-অনার্যের অভ্যুদার সম্মেলন এবং বৌদ্ধ বিদ্রোহ।**

ব্রহ্মব্রাহ্মব মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'সন্ধ্যা'র সম্পাদকীয়তে লিখেছেন...

গীতার শিক্ষা আমাদের বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। স্বয়ং ভগবান যাদের পূর্ব হতেই নিহত করেছেন আমরা তাদের বিনাশ সাধন করব। সকল দেশই যাতে স্বাধীনতা লাভ

করতে পারে। জয়যাত্রার একটা উদ্বোধন করতে পারে 'তার জন্য ভগবান মানসিক জড়তা দূর করেন এবং শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেন।....

দুই

বঙ্গদর্শন :

১৮৭৩ এর কাছাকাছি সময়ে (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। প্রায় ৩ বৎসর পত্রিকাটির সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন। তারপর 'বঙ্গদর্শন' অনিয়মিত হয়—তখন সম্পাদনা করতেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১২৮৯ পর্যন্ত। ১২৯০ (১৮৮৪) সালে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা করেছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' মাত্র ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে প্রায স্তব্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব হবার পর থেকেই শ্রীশচন্দ্রের মনে 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় নব-কলবরে প্রকাশ এবং তার সম্পাদনার জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি মনে মনে পোষন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না—তাই তিনি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে 'বঙ্গদর্শন' নবরূপে সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে ফল হল না। রবীন্দ্রনাথকেই অবশেষে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন...

> ...বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়—আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোন পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা। আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানেই আমি জয়লাভ করতে পারিনি, এবারও তাই হল...
>
> রবীন্দ্রজীবনী/প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাতে প্রসন্নতা লাভ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গদর্শন' এর ভার গ্রহণ করলেন তখন বাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছে প্রতিদিনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত শাসক শ্রেণির ব্যবহার তথা শাসন। একসময় দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে একটা চেষ্টা হ'ল পাশ্চাত্য সভ্যতা তার আদব-কায়দার নিত্যদিনের মোহজাল ছিন্ন করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনার মধ্য দিয়ে যে সকল প্রবন্ধ পত্রস্থ করতে লাগলেন—তাতে নতুন নতুন ভাবনা-ধারণায় দেশের প্রকৃত-প্রত্যক্ষ অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ সহ শাসকশ্রেণির অত্যাচার ও অমানবিক ব্যবহার প্রতিরোধ করার পথ দেখিয়ে স্বদেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের নির্দেশের ইঙ্গিত বহন করত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি, তথ্যসহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভেতরকার আত্মিক-ঐক্যবোধের ধারাটিকে প্রতিদিনের জীবনধারার রীতি নীতি আচার-অনুষ্ঠান সহ বক্তব্য

বিস্তার করে দেশবাসীর চিত্তকে দেশ-মুখী করার গভীর চেষ্টা 'বঙ্গদর্শনের' পাতায় প্রকাশ পেতে লাগল। এদিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও 'বঙ্গদর্শন' এর বিভিন্ন সংখ্যায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে স্বদেশ-ভাবনায় জাতীয় জাগরণের ধারাটিকে পরিচ্ছন্ন অনুভবে বিস্তার করেছিলেন। 'বঙ্গ দর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির (৩৮টি) বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা ব্যাপক-কিন্তু জাতীয় ও দেশের কল্যাণকামী মানসিকতাকে পুষ্ট করার সুতীব্র পরিকল্পনা খুবই গভীর।

১৩০৮ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশভাবনায় উদ্বুদ্ধ সচেতন স্বদেশপ্রেমী। যুগধর্মের আহ্বান এবং তার গ্রহণ-বর্জনের সুচিন্তিত বিচার তথা দেশজ ভূমিকায় তার পার্থক্য বিশ্লেষণ খুবই গভীর। এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি—

নকলের নাকাল ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ ; আলোচনা : নকলের নাকাল সম্বন্ধে ; নেশন কি? হিন্দুত্ব ; বিরোধমূলক আদর্শ ; বারোয়ারি-মঙ্গল ; নববর্ষ ; ভারতবর্ষের ইতিহাস ; অত্যুক্তি ; অবস্থা ও ব্যবস্থা ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশভাবনার আবেগে জাতি বা দেশের তথা দেশবাসীর অন্তর-শক্তিতে সৃষ্টি-মূলক গঠন আকুতি জাগাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' লিখেছেন সেগুলি হল :

ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ; মা ভৈঃ, স্বদেশ ; বঙ্গবিভাগ ; য়ুনিভার্সিটি বিল ; স্বদেশী সমাজ : স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট ; সফলতার সদুপায় ; ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ; ব্রতধারণ ; দেশীয় রাজ্য ; বিজয়া-সম্মিলন ; রাখি-বন্ধনের উৎসব ; দেশনায়ক, শিক্ষা-সমস্যা; জাতীয় বিদ্যালয় ; শক্তি ; পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর বক্তৃতা ; পথ ও পাথেয় ; সমস্যা ; সদুপায় ; দেশহিত।

দেশের মানুষের উপর শাসকদের লাগামহীন অত্যাচার-জনিত লোভের বহিঃপ্রকাশ যখন গভীরভাবে বিশৃঙ্খলার আগুনরূপে দেখা দেয় তখন নীতিনিষ্ঠতার কোন ফল নেই—তাই রবীন্দ্রনাথও শাসকদের অত্যাচার প্রতিরোধের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন না। তাই কিছু প্রবন্ধে অত্যাচারের প্রতিরোধে তিনি লিখলেন।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি ; রাজকুটুম্ব ; ঘুষাঘুষি, ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় নিজের মানসিক সত্য ও উপলব্ধিজাত ভাবনাকে বিভিন্ন প্রবন্ধের আদলে দেশবাসীর কাছে একটি পরিচ্ছন্ন অথচ স্বকীয়তা-স্বজাত্যবোধের অনুভব তথা স্বধর্মকে পরিপূর্ণভাবে সম্মুখে রেখে দেশব্রতের আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্ধ অনুকরণ ব্যাধিতে জরা প্রাপ্ত মানসিকতাকে আঘাত হেনে রবীন্দ্রনাথ

'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের প্রতিরোধ শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন অন্তর সত্যের ধ্যানে। তিনি বার বার বলেছেন, দেশের অন্তর-ভূমিতে বিদেশী সাহেবী-আনা কোনভাবেই চলতে পারে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ 'পরিবর্তন' প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করেন নি। দেশবাসীকে সময়ের আহ্বানে প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছেন কিন্তু 'অনুকরণকে কোনভাবেই' প্রশ্রয় দেননি' বরং তীব্রভাবে আঘাত করেছেন।

'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের পরিমণ্ডলে বাঙালি মনীষার চিন্তা য়ুরোপীয় ভাবনায় তপ্ত হয়েছিল—'নেশন' শব্দের 'গর্জন' যা দেশের সঙ্গে 'যুক্ত নয়—পুরোটাই য়ুরোপ থেকে আমদানী। 'নেশান' কে বড় করতে গিয়ে সামাজিক স্বার্থকে খর্ব করে বড় বড় ভাষণে জাতীয় অধঃপতনের বিস্তার ঘটেছিল-যার মধ্যে 'নিয়ম' আছে কিন্তু 'চেতনা' নেই। তাই ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> '...সমাজের নিচে হইতে উপব পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়।... (হিন্দুত্ব)

এমনি চিন্তার বিচিত্র বিস্তারের পুরোধায় বাংলার মানসপুত্রগণ যখন জাতি গঠন ও জাতি-চরিত্রকে স্বদেশানুরক্ত করতে সচেষ্ট, ঠিক সেসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে 'লর্ড কার্জনের মন্তব্য গভীরভাবে বাংলার প্রাণতরঙ্গে বিদ্রোহের তপ্ত বারুদ যেন বিদ্যুতের ঝলকানিতে ব্রজপাত ঘটাল।

লর্ড কার্জন সমাবর্তন ভাষণে এক জায়গায় বলেছিলেন,

> ...If I were asked to sum in a single word the most notable characteristics of the East-physical, intellectual and moral–as compared with the West, the word exaggeration or extravagence is the one that I should employ. It is particularly Patent on the surface of the native press.

এই প্রকাশ্য উক্তিতে বাংলার সারস্বত সমাজ তথ্য বুদ্ধিজীবীদের যে কি পরিমাণ আঘাত দিয়েছেন তা তখনকার 'পত্র-পত্রিকায়—ছোট ছোট আলোচনা সভায়, মিটিংএ প্রকাশ পেয়েছিল। রাসবিহারী ঘোষের পৌরোহিত্যে কলকাতার টাউনহলে তার জন্য প্রতিবাদ সভা ও হয়েছিল।

বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব এবং তা কার্যকর করার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে যে প্রতিবাদ 'বন্দেমাতরম ধ্বনি ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন', 'স্বদেশীদ্রব্যগ্রহণ' এবং তার পরবর্তী কলশ্রুতিতে দেশের সর্বত্র যে ধরণের মানসিকতায় উষ্ণতা ছড়িয়ে গিয়েছিল তারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে যে কর্মসূচী জানালেন তাতে

পরিস্কারভাবে বলতে চেয়েছেন—আমরা যদি সত্যি দেশের হিত চাই তা হলে স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কষ্টস্বীকার করতে হবে। বারবার পরের কাছে (শাসকদের) ভিক্ষা করার মত অসহায়তা আর সয় না। এই অসহায়তা থেকেই সমস্ত বাঙালির চিত্তে নিরাশার হতাশার প্রভাব সমস্ত প্রাণশক্তিকে নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে। এই নিরাশায় হত-চিহ্ন না হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন বার বার উদ্‌বোধিত মন্ত্রে বাঙালিকে জানালেন নিরাশার মধ্য দিয়েই বাঙালিকে চেতনার আলোকে উদ্‌ভাসিত হতে হবে—আজ সুযোগ এসেছে—আত্ম-দর্শনের মধ্য দিয়ে আপন আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে হবে। শুধু 'বঙ্গচ্ছেদের' বেদনায় মুর্ছিত হয়ে ক্রোধে এক মুহূর্তে 'স্বদেশী' হওয়ার প্রবণতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে—কারণ তাতে সামগ্রিকভাবে কোন লাভ হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় জানালেন,

> ..দেশের প্রতি আমাদের যে সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব ও স্থায়িত্ব ; ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা কঠিন।...

'বঙ্গব্যবচ্ছেদের' বেদনায় দেশবাসীর চিত্ত বার বার বিচিত্র ভাবনায় পথ খুঁজছিল—কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান তখনও পর্যন্ত পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির অন্তর-কান্নার আসল উদ্দেশ্য অনুভব করে সংশয়-আচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে এনে একটি সত্যিকারের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন—যেখানে বাঙালি তথা ভারতবাসীর গৌরব ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছিল—যা জাতি হিসাবে বাঙালির নিজস্ব সত্তার আলোকে। আবেদন-নিবেদন, যা এতকাল দেশনেতৃত্ব বার বার চেয়ে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে—ঠিক সেসময় রবীন্দ্রনাথ জানালেন,

> ...ইংরেজ যদি আমাদিগকে সমান বলিয়া একাসনে বসাইত, তাহা হইলে আমাদের অসমানতা আরও অধিক হইত। তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরও কমিয়া যাইত। তাহারা পৌরুষের দ্বারা যে আসন পাইয়াছে আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইয়া যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকিতাম আমাদের আত্মভিমান শান্ত হইত, তবে তদ্বারা আমাদের জাতির গভীরতর দারুণতর দুর্গতি হইত।...

'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়েই পথের বাধা দূর করা যাচ্ছে না। আত্মত্যাগের ভেতর দিয়েই চলার পথের বাধা দূর করতে হবে। তাই শুধু 'ধ্বনি নয়—মাতৃভূমির সঙ্গে অন্তর নাড়ীর সম্পর্কটাকে গভীরভাবে মিশিয়ে দিয়ে দিয়ে জীবন-মৃত্যু বোধকে একাকার করে এগিয়ে যাবার বাণী সামনে এসে বলতে হবে..:

> ...তুমি দেশকে যথার্থ ভালোবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না!...

এই একটি চিন্তার গভীরতায় বাংলার যুব-সমাজ তথা স্বদেশ-ব্রতীদের কাছে যে বার্তা জানিয়ে দিল তার পরবর্তী অধ্যায় ব্যাপকভাবে তা উৎসারিত হতে তেমন বেগ পেতে হল না।

ইংরেজ-শাসকদেব ব্যবহার এবং শাসনের দোহাই দিয়ে অত্যাচারের পরিধি যতই বেড়ে যাচ্ছিল ততই তার প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ নানাভাবে, নানাসময়ে এখন প্রকাশ হত যার সামগ্রিকতায় দেশের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণের দিকেই মুখ ফিরেছিল। ধ্বংসাত্মক প্রতিবাদের প্রবাহকে তখন সংযত ও সংহৃত করার প্রয়াস নেতৃবৃন্দের আয়ত্তেব মধ্যে অনেকটাই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ সেদিক থেকে নিজেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে সরিয়ে নিয়েছিলেন সত্য—কিন্তু দেশেব সামগ্রিক কল্যাণ-চিন্তায় তাঁর কাছে জাতীয় উন্মেষের, চেতনার বোধ জাগ্রত করাব কাজই ছিল সবচেয়ে জরুরী। সেসময় 'য়ুনিভার্সিটি বিল' আইনে পবিণত হল—তাতে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদের, বিরোধের বীজ রোপন করার প্রয়াস হল—ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্বাভাবিকভাবে রেখা টেনে সবটাই ধ্বংসাত্মক বিল হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর দৃষ্টির গভীর মমত্বে অনুভব করলেন—দেশেব শিক্ষা দেশেব মানুষের দ্বারাই গ্রহণ করা দরকার।

তখন বাংলার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক উত্তেজনায় তপ্ত, অনেকটা অস্থির বেসামাল মানসিকতায় এমনভাবে সভা-সমিতিতে বিদ্বেষ ছড়িয়ে বলেছেন যে স্থায়ী জাতীয় বিকাশের পথ প্রায় বন্ধ হবার মুখে। তাতে আর যাই হোক জাতীয় উন্নতি তাতে হয় না। এমনি পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর জীবন-গঠনের জন্য কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করেন 'চৈতন্য লাইব্রেরীর একটি অধিবেশনে। বড় বড় কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাংলার তথা বাঙালিব প্রাণ-তরঙ্গের নীড়-সেই পল্লীগ্রাম, পল্লীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যাবার কথা বললেন। পরাধীন দেশে, দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল তখনই হবে যদি আমরা পল্লীর দিকে নজর রেখে আমাদের রাজনৈতিক মানসিকতাকে রূপ দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পল্লীগুলি যদি সজীব হয় তাহলে বাংলার সবটাই সজীব রস আহরিত হয়ে সুস্থ সবল হতে পারবে।

> ...আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।
>
> প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন। সেইসকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোন প্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচরভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে

> সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারে পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থ সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় দেশ-দেশবাসীর চিরন্তন সত্যের ভূমিকে পোক্ত করার পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা তখনকার দেশ-ব্রতীদের অনেকের কাছে তেমন করে সাড়া জাগাতে পারে নি। শাসকদের অবিচ্ছিন্ন অত্যাচার ও শোষণের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে যে রক্ত প্রতিদিন ঝরে ঝরে জাতিসত্তাকে পঙ্গু করার পরিকল্পনা সর্বত্র কার্যকর করা হচ্ছে তার আশু প্রতিবাদই তখনকার একমাত্র কাজ বলে মনে করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ,

> '...আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে...

ভাবনায় তেমন স্বার্থকতা লাভ করতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গল-ভাবনার বীজবপন করেছিলেন তার গুরুত্ব ও জীবনরসের ব্যাপ্তি পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দেশব্রতীদের কাছে একমাত্র করণীয় বলেই স্বীকৃত হয়েছিল বৃহত্তর দেশ ও দেশবাসীর চিরন্তন সত্তার কল্যান কামনায়।

বঙ্গবিচ্ছেদের ঠিক কিছু আগে ১৯০৪ সালে সরকার (লর্ড কার্জন) বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন কাজে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন তাতে ফলাও করে বলা হল—আধুনিক পদ্ধতিতে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু কমিটির সূত্র ধরে দেখা যায় জেগে ওঠা বাঙালিকে সংহার করার সকল রকম চাতুরির আশ্রয়ে শিক্ষা-কমিটি কাজ করার পরিকল্পনা করছে। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংবেদনশীল মানসিকতার দর্পনে অনুভব করলেন যে লর্ড কার্জন বাংলাদেশের ভাষার উপর খবরদারী করার অভিপ্রায়ে শিক্ষা কমিটি করেছেন। পাঠশালার পাঠ্যক্রমে স্থানীয় কথ্য তথা উপভাষার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সুচতুরভাবে ভাষা-বিভেদের পরিবেশ সৃষ্টির মূল কথা বাংলাদেশের প্রাণশক্তি যে তার পল্লীগ্রাম-তা থেকে, সেইসকল চাষী ও নিম্নবিত্তদের সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রকে মধ্যবিত্ত তথা বাঙালির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ তার 'সফলতার সদুপায়' প্রকাশিত প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই বললেন,

> ...বোঝা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।

পাঠশালার পাঠ্যক্রমে ব্যবহৃত ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চাওয়ার কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

> ...আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে।

এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথ দেশের সর্বজনীন ভাবনার মূল্যায়ন করে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন,

> ...আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই ; এজন্য গবর্মেন্টের চাপরাস বুকে বাধিবার কোনও দরকার নাই। ...একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে। কোন কৌশল এই নির্জীব দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ জেগে ওঠা বাঙালির চিত্তভূমিকে সমস্ত ভয়মুক্ত করার জন্য শুধু উপদেশ দেননি—কর্মসূচী দিয়ে চলার পথে নিশান তুলে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছেন।

বিজয়াদশমীর দিনে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে মিলন সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়াসম্মিলন' উপলক্ষ্যে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতের প্রচণ্ডতায় সকল অর্গলমুক্ত হয়েছে তারই সূত্রে তিনি অনুভব করলেন বিচ্ছিন্ন বাঙালির হৃদয়ের ঐক্য, স্বদেশের সত্যকে উপলব্ধি করার 'ব্যাকুলতা—তিনি বললেন,

> ...এতদিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র একটা ভাবমাত্র ছিল—আশা করি আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।...

তিনি বিদেশির কাছে মাথা নত না করে, সমস্ত প্রলভনকে জয় করে, আপন সত্যে অপ্রমত্ত থেকে বাঙালিকে নির্দেশ দিলেন—যত বাধা আসুক, যত ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক—

> ...তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়ো না।

'বঙ্গব্যবচ্ছেদের' আন্দোলন প্রতিরোধে রবীন্দ্রনাথ নিজে পথে নেমে 'রাখিবন্ধন' করে জাতীয় অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত হবার জন্য কর্মসূচী দিয়ে বললেন,

> ...বাংলার পূর্ব বিভাগের সহিত পশ্চিম বিভাগের, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর, খৃষ্টান মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন স্মরণের দিন—অতএব সেদিন প্রভু ও ভৃত্য, ধনী ও দরিদ্র, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের হস্তে রাখি বাঁধিয়া দিবেন। বর্তমান বৎসরে এই ৩০শে আশ্বিনে শুক্ল তৃতীয়া তিথি পড়িবে—এই তিথিকে আমরা রাখি তৃতীয়া নাম দিয়া উক্ত তিথিতে প্রতিবর্ষে বাঙালির মিলনোৎসব সম্পন্ন করিব। উক্ত তিথিতে সংযমস্বরূপ আমাদের অরন্ধন হইবে—চুল্লি না জ্বালিয়া আমরা ফল দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিব। উক্ত দিনে

> বাঙলার পূর্ববিভাগের লোকেরা পশ্চিমবিভাগের নিকট ও পশ্চিমবিভাগের লোকেরা পূর্ববিভাগের নিকট 'ভাই ভাই এক ঠাই' এই লিখিত মন্ত্রসহ রাখিসূত্র পাঠাইয়া দিবেন। রাজার খড়্গ যে বিধাতার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারে না ইহাই উপলব্ধি করিবার জন্য এই রাখি-বন্ধনের উৎসব।...

রাস্তাঘাটে কারণে অকারণে সাধারণ মানুষ শাসকদের, বিশেষ করে ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার স্বাভাবিকভাবে দেশের মানুষের মানসিকতাকে ক্ষুব্ধ করে তুলত। বাঙালি নীরবে তা হজম করত সত্য, কিন্তু কোথাও কোথাও প্রতিবাদ হত-প্রত্যক্ষ হাতাহাতিতে 'ঘুষি-কিল-চড়ে'র অবিবাম বর্ষণে। বিপিনচন্দ্র পাল এ বিষয়ে ইংরেজের অত্যাচার-অশোভনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দেশবাসীকে 'শঠে শাঠ্যং' ঔষধে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রবন্ধ লিখলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের প্রতিবাদকে গ্রহণ করতে বা সমর্থন করতে পারেন নি। কাবণ ইংরেজ রাজশক্তি-তাকে আঘাত করলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি অতিক্রম করে আপামর নির্দোষ দেশবাসীর উপর উপদ্রব এসে যাবে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গভীর বক্তব্যে বললেন,

> ...ইংরাজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয় তো ঘুষায় পারিব না এবং হয় তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইবে ; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ এবং ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায় তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায় এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের ওপরেই আছে। বিদ্বেষ হইতে বাহাদুরি হইতে স্পর্দ্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া ন্যায় নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্ট শাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

আত্মশক্তির মর্যাদা ও তার উদ্‌বোধনের সুতীব্র ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে স্বদেশভাবনা ও সাধনায় জাতিগঠন, দেশ-গঠন তথা মনুষ্যত্বের উন্নত জীবন চর্চায় সেদিন নানাভাবে গান-প্রবন্ধ রচনায় 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় পাতায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-উৎসারিত সত্যে পরিচালিত করার জন্য আপন আবেগ রসা-সিক্ত করে দেশ-জননীর স্তুতি করেছেন—মহিমা বর্ণনা করে সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। গান-কবিতা-রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চিত্তলোককে পরিশুদ্ধ করে এগিয়ে যাবার মন্ত্র দান করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত

কবিতাগুলির অন্যতম—'প্রার্থনা'—'নববর্ষের গান'। গানগুলিও তখনকার সময়ে ব্যঞ্জনামধুর আর্তিতে অন্তর-উদ্‌বোধনের সীমাহীন শক্তিসঞ্জাত—'দেশের মাটি'—'ও আমার সোনার বাঙলা'—'নিশিদিন ভরসা রাখিস'—'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি'—'আমি ভয় করব না'।

'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বিপিনচন্দ্র পালের স্বদেশ-ভবনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'রাজা ও প্রজা'—'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা'—'নেশান-জাতি'—'শিবাজী-উৎসব'—'শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি—' প্রাদেশিক সমিতি'—'রাজভক্তি'—'কংগ্রেসী কথা'—'আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তির লোক-শিক্ষা'—'ভারতের ভবিষ্যৎ ও 'লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন নীতি'।

বিপিনচন্দ্র পালের স্বদেশ ভাবনা স্বদেশপ্রেমের স্বকীয়তায় পরিচ্ছন্ন পথ অনুসরণ করেছে—বিশ্বপ্রেমের ভিত্তিকে শক্তি জুগিয়েছে। আগে স্বদেশানুরাগ—স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বসাধনা—এই তিনের অনুরণনে জাতি ও দেশের শক্তিকে আবাহন করতে বিপিনচন্দ্র পাল গভীর প্রত্যয়ে ছিলেন স্থির। সমসাময়িক অনেকের সঙ্গে তাঁর মানসিকতার অমিল ছিল কিন্তু সব কিছু অতিক্রম হয়েছে স্বদেশ-আর্তির সুতীব্র ব্যাকুলতা—আর তার সার্থক রূপ পেয়েছে ত্যাগ-সংযম-নিষ্ঠার সংমিশ্রণে।

মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক শিবাজীর জীবন-আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার উপায় হিসেবে শিবাজীর জীবন-দর্শন ও কর্ম ধারার সত্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য 'শিবাজী উৎসব' প্রচলন করেন। বাঙলার দেশাত্ববোধে ও স্বদেশ-চেতনায় শিবাজী উৎসবের প্রভাব কার্যকর করার অভিপ্রায়ে সখারাম গণেশ-দেউস্কর 'শিবাজী উৎসবের' আনুষ্ঠানিক প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়-পরবর্তী সময়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়—পরবর্তী সময়ে এই উৎসবের অংশ হিসাবে ভারতমাতার প্রতীক সিংহবাহিনী ভবানী মূর্তি ও যুক্ত করা হয়। তাতে বুদ্ধিজীবি মহলে নানা প্রশ্ন জাগে এবং অনেকে প্রকাশ্যে এ ধরণের উৎসব-পূজায় প্রতিবাদও জানান। একটা বিশেষ ধর্মের প্রতিচ্ছবিকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মানসভূমি-বাংলাদেশের স্বদেশ-আর্তির পরিচ্ছন্ন সত্তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাতে রাজনৈতিক ভাবধারায় ধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রেরণার আবেগ অনেকের কাছে আপত্তিজনক হয়ে উঠেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর জাগ্রত মননশীলতায় বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিলেন। তিনি স্বদেশ-ভাবনায় কোন একটি ধর্মবোধকে অবলম্বন করার বিষয়ে নিজের মানসিকতায় মেনে নিতে পারেন নি। ভারতবর্ষ শুধু হিন্দু নয়, ভারতবর্ষ শুধু মুসলমানের নয়। তাই বিপিনচন্দ্র পাল দ্বিধাহীনভাবে 'বঙ্গদর্শনে' লিখলেন,

> ...ভারতীয়...জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু, অপর অঙ্গ মুসলমান, তৃতীয় অঙ্গ খৃস্টীয়ান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশ সাধনার দ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে।

বিপিনচন্দ্র পাল বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের সামগ্রিক সত্তায় জাতীয় স্বার্থ-যুক্ত সকল ধর্ম, সাহিত্য, অনুষ্ঠান, আবার এক অর্থে প্রতিটি ব্যক্তি চরিত্রের নিজস্ব সাধনার স্তরগুলি থেকেই শক্তি ও সুষমা সংগ্রহ করতে হবে।

> ...আর যাঁহারা এই আদর্শ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা 'শিবাজী উৎসব' এর হিন্দুত্বে ভারতীয় জাতীয় জীবন গঠনের ও জাতীয়-একত্ব সম্পাদনের কোন ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে, এরূপ-আশংকা করিতে পারেন না।...

বিপিনচন্দ্র পালের এই বিশ্বাস গভীর এবং লোকমান্য তিলকের প্রতি গভীর আস্থা থেকে বিধৃত হয়েছে। তাই 'শিবাজী উৎসব' এর সঙ্গে ভবানীমূর্তির আরাধনার যুক্ত প্রয়াসকে বিপিনচন্দ্র পাল অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অনুভব করে বলেছিলেন,

> ...শিবাজীর চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে গেলে ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে ন, তেমনি রামদাসকেও ছাড়িলে চলিবে না।...ফলত ভবানী ও রামদাস পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই শিবাজীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল প্রত্যেক জাতীর নিজস্ব জাতীয় শক্তি Spirit of the race দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কিভাবে ইহুদীরা রোমশক্তির এবং ফরাসীরা ও জাপানীরা কিভাবে জাতীয় শক্তির প্রেরণায় স্বদেশ-আত্মার বানীকে স্বদেশ-বাসীর অন্তরে অনুরণন ঘটিয়েছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> ...স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও মহাপ্রাণতার প্রকটমূর্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পন করিয়া একই সঙ্গে দেশভক্তি ও রাজভক্তির চরম চরিতার্থ লাভ করিয়া থাকে। এই জাতীয় শক্তি, এই Spirit of the raceই শিবাজীর নিকটে ভবানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।...

জাতীয় চরিত্রে যাঁরা মহান ও অনুকরণীয় পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে শিবাজী একজন গভীর ব্যঞ্জনাময় চরিত্র। অন্তরশক্তির কেন্দ্রভূমিতে শিবাজী মা ভবানীর অর্চনা করতেন। কিন্তু সেই আরাধ্যা ভবানীদেবী শিবাজীর কাছে ছিলেন ভারত-সত্তার আদ্যাশক্তি। সেই শক্তির স্ফুরণ অনুরণেই জাতী এবং দেশকে জাগ্রত করতে শিবাজী গভীরভাবে নিয়োজিত ছিলেন। বঙ্গবাসীর অন্তরে সেই অনন্ত-শক্তি-প্রবাহিনী মাতৃভূমিকে আদ্যাশক্তির বিমূর্ত প্রতীকরূপে অনুভব করে দেশে ও দেশবাসীর অন্তরকে অভিষিক্ত করার অনমনীয় মানসিকতায় তখন জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা বিভিন্নভাবে ও পরিকল্পনায় এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছিল সর্ব-দিক থেকে।

বিপিনচন্দ্র পাল তৎকালীন কংগ্রেসের মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করতেন, যেহেতু সরকারী আনুগত্য তার আবেদন-নিবেদনে জাতি ও দেশের মান-মর্যদা তথা

অধিকার নিয়ে সুশাসনের জন্য প্রার্থনা করা।—

এখানেই বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য...

> ...সুশাসন নহে, স্বায়ত্বশাসন। ...দেশের লোকের আত্মশক্তি, আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিয়া সর্বতোভাবে রাজশক্তির সমক্ষে ও সমকক্ষে প্রজাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা...

এই ভাবনাতেই কংগ্রেসকে জন-সাধারণের বক্তব্য শাসকশক্তিকে জানতে হবে এবং তার প্রত্যক্ষতার জন্য প্রয়োজনে প্রণালী স্থির করতে হবে।

তাই বিপিনচন্দ্র পাল একটি কবিতায় অন্তরের কান্নাকে ভাষা দিয়ে লিখলেন,

...কতদিন বল আর রাখিবে সম্বরি
বক্ষোমাঝে রুদ্ধশ্বাস, বেদনা গভীর,
সন্তানের অবহেলা, ঘৃণা বিদেশীর
সহিব নীরবে? কবে উঠিবে বিদরি .
মেদিনী-অম্বরতলে ক্রন্দনের স্বরে
ঢালি দিবে উচ্ছ্বসিত যুগ-যুগান্তের
অগ্নি-প্রস্রবণ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
হতেছে সঞ্চিত নিত্য যাহা। প্রলয়ের
প্রবল আঘাতে বিলাসের কারাগার
নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিবে, দিবে চূর্ণ করি
বিলাস-সম্ভার যত পণ্যবীথিকার।
সেইদিন ভারতের চির-বিভাবরী
হবে সুপ্রভাত, দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহাজাগরণ।

জীবনী-সত্ত্বায় দেশ ও দেশজননীর প্রতি প্রত্যক্ষ ভাব ও আশা আকাঙ্খার উৎসারিত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলায় প্রয়াস তখন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। 'বঙ্গবিভাগের' অনিবার্যতায় তাই প্রতিবাদমুখর হয়েও তিনি দেশের মানুষের অন্তরে একটি বিশেষ আর্তি জাগিয়ে দেবার কথা ভেবে বললেন,

রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ!
শুধু ভাঙ্গিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগ-যুগান্তের সুপ্তনিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ-রেখাগুলি স্থির দৃষ্টি রাখি

রুধিরাক্ত বক্ষোপরি। শুধু ক্ষুন্ন রেখা,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ কঠোর? এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাক্ তরঙ্গ-ভৈরব
বঙ্গ বক্ষঃ ক্ষত বিগলিত মেঘনাদ
রক্তগঙ্গা-পূর্ণস্পর্শ যার দিবে প্রাণ
সহস্র-সন্তান, দিবে বরাভয়দান।

দেশের মানুষের অন্তরে বেদনাসিক্ত অবসাদকে দূর করার জন্য বিপিন পাল বৈপ্লবিক কঠোর আঘাত হানতে চাইলেন-আপন মান-মর্যাদার তথা 'ইজ্জৎ' লুণ্ঠনের প্রতিরোধে। সেখানে কোন নরম-মানসিকতার স্থানকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। তাই প্রয়োজনে প্রতিরোধে প্রত্যাঘাত করতেও এতটুকু দ্বিধা নেই। **'শুধু ভাঙ্গিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ, দিয়াছে চেতনা'** এই বলে তিনি দেশবাসীকে জানালেন,

...আসল কথা প্রজার চোখ্ ফুটিয়াছে।...প্রকৃত সুশাসন লাভ করিতে না পারলে 'ইজ্জৎ' থাকিতে পাবে না।

এই 'ইজ্জৎ' রাখার জন্য নানাভাবে আবেদন-নিবেদনের প্রয়াস বিভিন্নভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে-কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী কার্যকর পথ হতে পারে না। কারণ সকলের হৃদয় কোন একটি চিন্তায় পরিচালিত হয় না। কাহারও ক্ষোভ, কাহারও বেদনাসঞ্জাত বিদ্বেষ জেগে উঠতে সময় লাগে না। তখন সেই ক্ষোভ, বিদ্বেষ সংবরণ করা সহজ হয় না সর্বক্ষেত্রে। কোন না কোনভাবে তার প্রকাশ হয়েই যায়—তার কোন নিয়ম নীতির প্রয়োজন হয় না। তারই ফলশ্রুতিতে নানা গোপন-পথের প্রবাহ একদিন বিরাট ও অপ্রতিরোধ্য প্রবাহে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়-প্লাবন ঘটে যায়।

এভাবেই জাতির মানসিকতায় প্রতিরোধ স্পৃহার প্রণালী বিপ্লব-বোধের জাগরণ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল। প্রকাশ্যে এর প্রকাশ না থাকলেও সংহত ভাবনায় গোপনভাবে গুপ্ত কর্মধারায় তার অনুরণন সর্বত্র। এই বিপ্লব-বেগ নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হবে-কিন্তু তা সাময়িক ; দেশের অন্তস্থলের ইচ্ছার প্রবলতা সব বাধা অতিক্রম করবে-নিরুদ্ধ শক্তি-স্রোত আপন গতিপথের প্রবাহ খুঁজে বেগবতী হতে সময় লাগবে না।

'বঙ্গদর্শনে' সে সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতিগণ সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিষয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

তিন

ভারতী :

স্বদেশ-ভাবনার প্রেরণায় জতিকে উৎসাহিত করার জন্য 'ভারতী' সাময়িক পত্রটির প্রকাশ হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকাটিকে সম্পাদনা ও অন্যান্য অনিবার্য বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর এবং অক্ষয় চৌধুরী। বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। যদিও ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ীর থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে ও সেসময় সচিত্র একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে তা মিশে যায়।

অন্তবশক্তিতে বাঙালির চিত্তকে নানাদিক থেকে জাগিয়ে তোলার গভীর প্রত্যয়বোধ থেকে 'ভারতী'র প্রকাশ এবং বিচরণ সেসময় বুদ্ধিনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। মূল কথা 'জাগরণ'—আর তা কোন বিশেষ মতবাদের কুক্ষিগত অনুশীলনের মধ্যে নয়-সামগ্রিকভাবে সুস্থ-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে আপন জাতির সভ্যতার প্রকাশ এবং অনুসরণের প্রবক্তা হিসেবে 'ভারতী'র জন্ম পরিকল্পনা। তাই একদিকে জ্ঞানের কর্ষণ অপর দিকে স্বদেশ-প্রীতির আস্বাদন—

> .জ্ঞানালোচনাব সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিব।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'ভারতী'র যাত্রা। সবদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় দেশাত্মবোধক তথা বাঙালি জাতির আত্ম-উন্মেষের দিকগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হত।

'ভারতী'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবী-প্রমথ চৌধুরী-হিরন্ময়ী দেবী-ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বিজয়চন্দ্র মজুমদার-শিবনাথ শাস্ত্রী-অমৃতলাল বসু-রাধাকান্ত বসু-রমেশচন্দ্র বসু-সুরেশচন্দ্র চৌধুরী-স্বর্ণকুমারী দেবী, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, অনুপমা দেবী সহ অ'েকের রচনা প্রকাশিত হয়েছে—সেই একটি মাত্র ভাবনা—আত্ম-শক্তির জাগরণ—সুস্থিতি দেবার অভিপ্রায়ে।

দেশীয় ভাবনায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের সূত্রে এবং তার আগে থেকেই দেশ ও জাতির দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য সমাজের এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদনের পথ ধরেই দেশের শান্তি ও সুস্থিতি রাখার ভাবনা গভীর ছিল। তাতেই তাঁরা মনে করতেন দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ ও উন্নতি হবে। কিন্তু তাতে যে তথাকথিত কল্যাণ বা শান্তি যে সম্ভব নয় ব্যাপক জাতিগত পরিকাঠামোয় তা প্রথম 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা জানিয়ে দিলেন। ব্যক্তি ও দেশ—ভাবনার বিরাট পার্থক্য। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আবেদন-নিবেদন বিষয়টিকে তীব্রভাবে আঘাত দিয়ে জানালেন,

> ...আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনই ইংরেজেরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখনই আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদানত হইলাম, তখন

> হইতে আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাঁহাদিগের নিকট পাইতেছি সে কেবল তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ। যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায়?
>
> ...ইংরাজ-রাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ উহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নহে—উহা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ-উহাতে হৃদয়ের তিলমাত্র সংশ্রব নাই।

প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ কংগ্রেসীয় নেতৃবৃন্দের চিন্তায় প্রবল আঘাত এল-যার ফলে নানাভাবে প্রবন্ধটির পক্ষে আবার বিপক্ষে মতামত প্রকাশের আয়োজন চলতে লাগল।

এমনি দেশ-চিন্তার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' পত্রিকায় রাজনৈতিক মতবাদে দেশের কিসের কল্যাণ, কিসের সুস্থিতি তথা আত্ম-শক্তির জোগান দেওয়া যায় সে সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। 'কণ্ঠরোধ'—'ভাষা বিচ্ছেদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সময়টা খুব আলোড়িত। বোম্বাই শহরে প্লেগ মহামারিরূপে দেখা দিল। প্লেগ নিবারণের অজুহাতে রাজশক্তি নানাভাবে দেশের মানুষের উপর অত্যাচার চালায়। লোকমান্য তিলকও তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু পুণায় সরকারী অফিসারের প্লেগের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লোকমান্য তিলককে দোষী করে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনার সংবাদ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় বইতে লাগল। বঙ্গদেশ থেকেও তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হল এবং তিলকের কারাদণ্ডের মামলা চালাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের পুরোধায় অর্থ সংগ্রহ করা হয়। শাসক সরকার তাকে দমন করার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন এবং প্রতিবাদমুখর-কণ্ঠরোধ করার জন্য 'সিডিশন বিল' জারি করার পরিকল্পনা হল। ভারতের সর্বত্র পত্র-পত্রিকায় সরকারের জুলুমের তীব্র সমালোচনা হতে লাগল। তাঁদের সমালোচনার ভাষা অনেকটা বাঁধনহীন দুর্বার বেপরোয়া। সরকার সেইসব উত্তেজক ভাষাকে পছন্দ করলেন না। তাই তা বন্ধ করার জন্য 'সিডিশন বিল' আনলেন। বিলটি আইনে পরিণত করার তথা কার্যকর করার জন্য বড়লাটের অনুমোদন দরকার। কলকাতা বড়লাটের রাজধানী। ওই বিল্ বড়লাটের অনুমোদনের আগের দিন কলকাতা টাউন হলে নাগরিকদের বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

দেশের মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠলে তার প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই সংবাদপত্রগুলিতে যত পরিমাণে অবাধে ও স্বাভাবিক নিয়মে অসন্তোষের জ্বালা প্রকাশ হওয়া কোন অন্যায় নয়। তাতে দেশের মধ্যে কোন গোপনীয় ব্যাপার থাকার সুযোগ থাকবে না।

...আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি, উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই ; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দন্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাঁটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না, এবং আমি ঠিক কোনখানে পদার্পন করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট—কারণ কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমি ও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদন্ড আনুমানিক আশংকারূপে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দন্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথা স্থানে দুর্বল জীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে।...

রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন, রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকা আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর অবস্থা, অসহনীয় যন্ত্রণা। কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উল্টো ফল হয়। রাজার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধতা রাজদ্রোহ নামে কথিত হয়—আর প্রজার বিরুদ্ধে রাজপুরুষের অত্যাচারকে প্রজাদ্রোহ বলা উচিত। প্রজার স্বার্থবিরোধী রাজশাসন বা রাজকাজ প্রজাদ্রোহিতার সামিল।

...ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গভর্মেন্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দন্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃংখল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

রবীন্দ্রনাথ রাজশক্তি সম্পর্কে নিন্দা করেছেন, তেমনি জাতির অন্তর—অলসতা ও কর্মবিমুখতার কথাও স্পষ্টভাবে বলতে দ্বিধা করেননি। আমরা যারা মাতৃভূমি ও দেশ জননীর জন্য ভাবছি, তার সেবা করার জন্য নানা বক্তব্য ছড়িয়ে ঘুরছি সর্বত্র—অথচ আপন কর্তব্যের কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত অস্ফালনের অহংকারকে সামনে রেখে বাহাবা কুড়াচ্ছি—এটা আর যাই হোক দেশ-সেবা বা স্বদেশের প্রতি অনুগত্য এতটুকুও অনুভূত হয় না—। আমাদের কথা, আমাদের আলোচনা এমনকি আমাদের নিত্যদিনের চলাফেরার সঙ্গে দেশের অন্তরশক্তির প্রাণসত্তার কোন মিল নেই।

'কোট ও চাপকান' প্রবন্ধটিতে ভালভাবেই দেশের মানুষের জীবন-যাত্রায় দেশের ভাব ও চিন্তার কোন সার নেই বলে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। বিদেশিরা 'চাপকান'কে বিদেশী সাজ বলে বর্ণনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'কোট ও চাপকানের প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সহজাত মননের ঐক্যসূত্রটি সেদিন অনুভব করেছিলেন। দেশের মানুষ—হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রবাহের মধ্য দিয়েই জাতীয় সত্তার প্রকাশ। 'ভারতবাসী' এই কথাটাতে দ্বিধাহীনভাবে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের এক-সত্তার

উপলব্ধি। সেখানে কোনভাবেই শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমান কোন একজনকে বাদ দিয়ে কোন একজনকে ধরা সম্ভব নয়।

> ...কেন না মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্প সাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ট আদানপ্রদান হইয়া গেছে, যে উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দু মুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে।...এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায় তবে কোনমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানে ধর্মে নাও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে দেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দুমুসলমানদের বেশ।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনার অনেক আগে থেকেই যখন বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন দানা বাঁধছিল তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথও তাকে ইন্ধন জুগিয়ে দেশ ও জাতির চিত্তলোকে স্বদেশের বানী-প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন অত্যন্ত সন্তর্পনে-বিদেশকে আক্রমণ করেই শুধু নয়-স্বদেশের মানুষদের অহংকার ও আত্মাভিমানের রিপুকে আঘাত করতেও দ্বিধা করেননি। দেশের দুঃখ, দেশের দারিদ্র, দেশের অভাব—সব বিষয়ই যে এই দেশ ও দেশবাসী-রবীন্দ্রনাথ তাকে সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালবাসতে বলেছিলেন—তা না হলে দেশের অপমান কোনভাবেই ঘুচবে না

তাই 'কল্পনা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের আকাঙ্ক্ষায় বললেন,

> তোমার যা দৈন্য, মাত, তাই ভূষণ মোর
> কেন তাহা ভুলি ;
> পর ধনে ধিক্ গর্ব—করি কর জোড়
> ভরি ভিক্ষা ঝুলি।
> পূণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে,
> তাই যেন রুচে।
> মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
> তাহে লজ্জা ঘুচে।
> সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত,
> কর স্নেহ দান
> যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে, মাত
> কী করিবে দান।

এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সভার সভাপতি নামজাদা হাইকোর্টের উকিল রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন দেশ-প্রেমিক, স্বদেশ কল্যাণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতেন। স্বাভাবিক নিয়মে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন —রবীন্দ্রনাথ সেই ইংরেজী ভাষণের সারবস্তু 'বাঙলায় অনুবাদ করে সভায় পেশ করেছিলেন।

সরলা দেবী : 'ভারতী' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পদত্যাগ করার পর ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী সম্পাদক হলেন। সরলাদেবী প্রথম থেকেই 'ভারতী'র সম্পাদনায় স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর পটভূমিকায় নারী সমাজকে সচেতন করে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন। জাতীয় মঙ্গলকাজে নারীর সহযোগিতা তথা যুক্ত হবার সকল প্রয়াসকে কার্যকর করার গভীর প্রত্যয়-বোধে সরলাদেবী দৃঢ়হাতে এগিয়ে এলেন। পুরুষ যদি পারে, নারীও পারবে। এই ছিল তাঁর গভীর মননের আকাঙ্খা। সেই আকাঙ্খাকে সরলাদেবী নারী-জাগরণের মন্ত্রে অভিষিক্ত করলেন 'ভারতী'র পাতায় পাতায়। একদিকে জাতীয় চেতনার উন্মেষে বিচার বোধের প্রবাহে তথাকথিত সামাজিক কু-সংস্কারকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার প্রেরণা, অপরদিকে নারী-সমাজের ভেতর ভয়শূন্যতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে সকল হীনমন্যতার উর্ধ্বে দেশ-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। সরলাদেবী 'ভারতী'তে 'সাদা কাজীর বিচার'—'কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন' 'বাঙালীর পরীক্ষা' প্রবন্ধ সহ গান (হিন্দুস্থান—বীরষ্টামীর গান) কবিতা ('মাতৃদ্রোহীর প্রতি'—ভয় নাই') রচনাও সেসময় ভাব-উন্মাদনায় নারী-সমাজকে ঘরের অন্ধকার থেকে জীবনের কর্মের উন্মাদনার আলোকে উদ্‌ভাসিত করলেন।

সরলাদেবী নারী-জাগরণে নারী চরিত্রকে দৃঢ় করার সকল প্রয়াসকে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য লেখনি ধারণ করেছিলেন। বিচার-ব্যবস্থার অসম ভাবনা ও প্রয়োগবিধির উপর তিনি তীব্র আঘাতও করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। মুসলমান কাজির বিচার যেমন লঘু অপরাধে গুরু শাস্তি, তেমনি ইংরেজ প্রভুদের বিচার ব্যবস্থায় দেশীয় বিচারকগণ নেটিভদের অন্যায়কে পর্বত-প্রমাণ শাস্তির গারদে নিক্ষেপ করার নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। ইংরেজের চাকুরী রক্ষার

...দুই-পাঁচটা নেটিভের মান, সম্ভ্রম, অর্থ, গৌরব সর্বস্ব নষ্ট হউক...
বিচারপতিদের তাহা দেখবার অবসর কোথায়।

জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারার প্রতিও সরলাদেবীর প্রসন্নতা ছিল না। শুধুমাত্র প্রস্তাব 'পাশ' করা এবং দেশীয় সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এটা করা উচিত, ওটা করলে ভাল হয়—এ ধরনের আবেদন-নিবেদন রাজগৃহে প্রেরণের মক্‌সা করাটার মধ্যে নেতৃত্বের আস্ফালন। দেশের বা দেশবাসির কল্যাণকর বাস্তব গঠনমূলক কোন পরিকল্পনার আলোচনা কংগ্রেসের তিন দিনের অধিবেশনে হবার কোন কর্মসূচী নেই

দেখে সরলাদেবী 'কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন' প্রবন্ধে বেদনা অনুভব করে দেশবাসিকে সজাগ করেছেন। স্বায়ত্তশাসন ইংরেজ দেবে না—নিজেদের কর্ম ও সক্রিয় উদ্যোগের ব্যাপক আন্দোলনে স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত করতে হবে।

সরলাদেবী 'অতীব গৌরবকাহিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান' এই গানটি রচনা করে স্বদেশানুভূতির ভাব-সমৃদ্ধ তেজ-দীপ্ত মননের ও হৃদয়ের যে প্রবাহ দেশবাসীর অন্তরে অভিষিক্ত করলেন তা ভারতের স্বাধীনতা বোধের দীপশিখায় অমলিন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করলেন। গানটি "জাতীয় মহাসমিতির সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১ সনে বাংলা-বিহার-আসাম-মাদ্রাজ-পঞ্জাব-গুজরাট প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশস্থ হিন্দু, পার্সি জৈন, খ্রীশ্চান ও মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বী ৫৬ সংখ্যক গায়কগণ কর্তৃক সমস্বরে গীত হয়।"

বাঙালি আজন্ম ভাব-প্রবণ। মাতৃভূমি ও মা—এই বোধ বাঙালিকে একটি বিশেষ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে—যার প্রমাণ স্বদেশীযুগেই প্রায় প্রতিটি স্বদেশানুভূতির কর্মকাণ্ডে আমরা দেখেছি। পরাধীন জাতির বেদনায় বাঙালি উদ্‌ভ্রান্তের মত সর্বত্র ছুটেছে পথের সন্ধানে শৃঙ্খল-মুক্ত মাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে শরীরেব প্রবাহিত রক্তে আলোড়ন জেগেছে। তারজন্য অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর অত্যাচার বুক পেতে মাতৃ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছে। তবুও মাথা নত করেনি। গঠনমূলক কাজের নির্দেশে দিনরাত আপন সুখ ত্যাগ করেছে—বৃহত্তর দেশবাসীর কল্যাণে-মাতৃ প্রসাদে। সে সম্পর্কে সরলাদেবী বাঙালীর পরীক্ষা 'ভাবের ঠেলা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ...এক একটা ভাবের ঠেলায় অনেকটা কাজ অগ্রসর হইয়া যায়। এইবার বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে বাঙালি ভাবের সম্বন্ধে কাজের মাঝ গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্যজাত ব্যবহার করার সংকল্প আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কতিপয় খেয়ালী লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এইবার বিজাতীয় অংকুশের পীড়নে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই 'মাথার টনক' নড়িয়াছে। রাজধানী হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সমস্ত প্রধান নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যে তুমুল উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এ ভাব যদি স্থায়ী হয় তবে বাংলার ললাট লিপিতে জর্জ নাথানিয়েল কার্জন তাহার মহামিত্র বলিয়া লিখিত ছিলেন।

সরলাদেবী শেষে লিখেছেন,

> ...বাঙালির পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, সবে আরম্ভ হইয়াছে। তবে জগতের চক্ষে সবচেয়ে তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ উদ্ভাসিত হইতেছে। জগৎ যেন প্রতারিত না হয়, আমরা নিজেরা যেন নিজেকে বঞ্চনা না করি—এ দৃঢ়তা, এ কার্যকারিতা, এ অকুতোভয়তা যেন আমরা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারি।

সরলাদেবী বাঙালি জাতির জাগরণে বিশেষ করে অন্দর মহলের সেই ঘুমিয়ে থাকা শক্তির 'উন্মেষের' জন্য সার্বিকভাবে প্রেরণ দিয়ে এসেছেন 'ভারতীর' পাতায় পাতায়। 'বাঙালির পরীক্ষা'য় শঙ্কা নিবারণে তিনি অনেকভাবে পথ-নির্দেশ করেছেন—ত্যাগ শক্তির দীপ্তিতে 'নারীকে পুরুষের পাশে পাশে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন একটিবার মাতৃচরণে, দেশ-চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করার।

তাই বলি মন জেগে থাক্
পাছে আছেরে শ্বেত চোর!
কালী নামের অসি ধর্, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি বৃটেনে তোরে করতে পারে জোর।।

হিরন্ময়ী দেবী

স্বদেশভাবনায় 'নারী-জাগরণ' না হলে স্বদেশী-আন্দোলন পুরোটাই ব্যর্থ হবে। এ কথা সেসময়ের জন-নায়ক, সমাজসেবী সবাই অনুভব করেছিলেন এবং সেইমত ভাবনা-চিন্তাও করেছিলেন। এ বিষয়ে সরলাদেবীর প্রত্যক্ষ অনুভব কার্যকর হয়েছিল পত্র-পত্রিকায়—সেসম্বন্ধে নারীদের উদ্‌বোধিত করার কাজে। হিরন্ময়ীদেবী বিষয়টি আরো একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সরলাদেবীর বড় বোন তথা স্বর্ণকুমারীদেবীর কন্যা হিরন্ময়ীদেবী প্রথম থেকেই অন্দর মহলের বন্ধ-দরজা খুলে দেবার জন্য নারীদের আহ্বান জানালেন নিজেকে স্বাবলম্বী তথা আত্ম-নির্ভর হবার। এই আত্ম-নির্ভরতা থেকে স্বদেশ ও স্বাধীনতার সোনারকাঠির পরশ লেগেছিল বাংলার ঘরে ঘরে অসংখ্য নারীর মরচে পড়া অন্তরে; জাগরণের বার্তা প্রতিনিয়ত কেমন যেন আনমনাও করে তুলত আজানতে। হিরন্ময়ী দেবীর 'মাতৃপূজা' প্রবন্ধটি সেই সোনার কাঠি। আত্ম-নির্ভরতার মূল প্রবাহটি ধরে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিদিনের সংসার জীবনের বিচিত্র কাজকর্মের ভেতর থেকে সময় বের করে দেশের জন্য, দশের জন্য কিছু করা। অবসর সময়ে অলস-ভাবনায় না কাটিয়ে শক্তির উদ্‌ভাবনায় কিছু শিল্পকাজ করা। তার জন্য গ্রামে গ্রামে নারীদের একটি সঙ্ঘ বা সমিতি গঠন করে শিল্পকাজের জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তার জোগান দেওয়া। অর্থ দরকার। কিন্তু সেই অর্থ নিজেরাই সংগ্রহ করে শিল্পকাজের মাল-মসলা ক্রয় করা। তার জন্য মহিলারা 'মায়ের কৌটা' এই নামে একটি তহবিলের সৃষ্টি করলেন। মাঝে মাঝে দেশের ধনীদের কাছ থেকেও দান গ্রহণ করা হত। নানা ধরনের শিল্পকাজ তৈরী করে তা বিপনণের ব্যবস্থাও নিজেরা গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থসংগ্রহ করতেন। তাতে বেশ আয়ও হয়েছিল। উদ্‌বৃত্ত অর্থে গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে অর্থ-সাহায্য করা হত। এই প্রতিদিন অবসর সময়কে অর্থপূর্ণ শিল্পকাজে ব্যয় করে মাঝে মাঝে তার প্রদর্শনীও হত। এই প্রসঙ্গে হিরন্ময়ী দেবী লিখেছেন...

আজ যে শিল্প-প্রদর্শনী বর্ষে বর্ষে ভারতের বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতেছে, ইহার প্রথম সূত্রপাত মহিলার দ্বারা।

> ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় কতিপয় ভদ্রমহিলা 'সখি-সমিতি'র নাম একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করেন। সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মহিলা শিল্পের উন্নতি করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সমিতি হইতে বর্ষে বর্ষে মহিলা শিল্পমেলা নামক একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর অধিবেশন হইত। তথায় মহিলা শিল্পের জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন আগ্রা, দিল্লী, লখনউ, কাশী, কাশ্মীর, কটক, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, বহরমপুর প্রভৃতি শিল্প-প্রসিদ্ধ স্থান হইতে তথাকার বিশেষ বিশেষ শিল্প আনীত হইত। ৫--৬ বৎসর এই শিল্পমেলার অধিবেশনের পর, কলিকাতার Industrial Association হইতে সুবৃহৎ আকারে এইরূপ শিল্পমেলার অধিবেশন হয়। এই মেলার অনুষ্ঠাতাগণ ইতিপূর্বে মহিলা শিল্পমেলায় তাঁহাদের আত্মীয়াদের অভিভাবকরূপে সহায়তা করিতেন এবং Industrial Association হইতে অনুষ্ঠিত মেলার মহিলা-বিভাগে সখি-সমিতির মহিলাগণ বিশেষ সাহায্য করেন। এই অধিবেশনের পর মহিলা শিল্পমেলার স্বতন্ত্র অধিবেশন আর হয় নাই। ক্রমে এই Industrial Association-এর অনুষ্ঠিত শিল্পমেলা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া Industrial Exhibition-এ পরিণত হইয়াছে।...

দেশের বাইরে ও ভেতরে জাতীয় চেতনার উন্মেষপর্বে স্বদেশ-আকৃতির মূল শক্তি আত্ম-নির্ভরতা—যার মাধ্যমে আত্ম-শক্তির উদ্‌বোধন এবং ন্যায়-অন্যায় বোধের কষ্টি পাথরে দেশের মানুষের অন্তরে বিশেষ করে নারী-শক্তির উদ্‌বোধনে সহায়তা করেছিল।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত-বাংলা এবং ইংরেজী তিনটি ভাষায় চৌখশ এক ব্যক্তিত্ব ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক দৃঢ়তা এবং স্বদেশ-ভাবনার বাস্তবমুখী চিন্তার গভীর প্রবক্তা। বঙ্গচ্ছেদের পটভূমিকায় স্বদেশ-আত্মার উন্মেষ এবং তার প্রবাহ-শক্তির পথ কি ভাবে জাতীয় চেতনায় বয়ে যাবে সে সম্পর্কে ললিতবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সময়োপযোগী থাকায় তাঁর প্রবন্ধ 'প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' এক সময়ে বহুপঠিত এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ। 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি শ্লেষাত্মক কবিতা 'গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা' একসময়ে বুদ্ধিজীবী তথা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। বঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে 'গোরাচাঁদ' ইংরেজ আর 'শ্যামা মা' বঙ্গজননী দুর্দশার ছবি আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন,

> ... ভেদবুদ্ধি ভেবে সার পাকা চাল চাললে এবার
> সোনার বাংলা চুরমার করলে তুমি দুটা দু'ঠাই

'বয়কট' ভাবনার কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন।

> ...তোমার মুলুকের আমদানী, বসন ভূষণ চুড়ী চিরুণী,
> ছড়ি জুতা, চোখরাঙানী, প্রেমের গৌর আর না চাই।
> চুরুট সাবন পাঙ্গা লবণ, দোবরা চিনি লোহার বাসন
> সাগর জলে দেই বিসর্জন, তোমার ভজলে ধর্ম নাই।

. এখন গৌবচাঁদকে ছেড়ে দিয়ে ভজ্‌বো মোদের শ্যামা মা রে,
কালী কালী নাম জপিয়ে মনের কালি মুছবো ভাই।
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে। সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে
আবেগভরা চাপা সুরে। স্বদেশপ্রেমের গুণ গাই।
লাঞ্ছনার আর বাকী নাই, পর হয়েছে আপন ভাই,
সবাই মিলে কানমলা খাই, মিটেছে মোদের বিলাতি বাই।

দেশজুড়ে দেশের-শক্তিব জাগবণেই বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে যে কি প্রচণ্ড ব্যাপক আযোজন সে সময় মনন চিন্তায় আলোড়ন জাগিয়েছে তার প্রকাশ তখনকার পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার : স্বদেশাত্মক রচনায় তেজশক্তির যুক্তি-নির্ভর গভীর বিষয়কে টেনে এনে বাঙালির চিন্তাকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লিখিত প্রবন্ধ—যা 'ভারতী'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুবসম্প্রদায়কে শক্তিদান করতো। 'ভারতী' প্রকাশিত 'ইংরাজস্বার্থ ও দেশের হিত'—প্রবন্ধে ভারতবাসীর আত্মসমর্থনের অধিকার, কিভাবে স্বদেশীর হাত থেকে বিদেশীব 'হিতবাদী'দের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বক্তব্য বিস্তার করেছেন।

...ইংরাজ সরকার যখন বৃটিশ-ইন্ডিয়ার শাসন এবং পালনের জন্য কোন বিধান করেন, তখন যদি কেহ লুপ্ত ভারতবর্ষ অথবা সাবেক হিন্দুস্থানের বংশধরদিগের হিত বা অহিতের কথা লক্ষ্য করিয়া উহার সমালোচনা করেন তবে তিনি নির্বোধ। শাসনকর্তারা কোন ব্যবস্থাকে যখন 'উপকারী' বলেন, তখন উহাকে অহিতকর প্রপঞ্চ মনে করিবার পূর্বে যদি 'কাহার'? এই বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে মায়া-মোহ কাটিয়া যাইবে।

বঙ্গচ্ছেদের উদ্দেশ্য এবং তার পরিণতি যে বাঙালি জাতির তথা ভারতবর্ষে কোনভাবেই হিত নয় তা বার বার বিভিন্নভাবে যুব সম্প্রদায়কে, নারীদের কাছে তথ্য সহ কখনো সরাসরি কখনো বা হাস্যাত্মক, ব্যাঙ্গাত্মক রচনায় প্রকাশ করার গভীর প্রবণতা সে সময়ের বুদ্ধিজীবীদের কাছে 'বড় উপায়, হয়ে উঠেছিল।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রার্থনা' ও 'নবজীবন' দুটি কবিতার মধ্য দিয়ে স্বদেশ-প্রেমের হিতরূপটি প্রকাশ করেছেন। তাই মাতৃভূমিকে 'দেবী' 'অনুভবে প্রার্থনা করে বলেছেন,

...জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য
সকলের আগে সেবিতে চরণ
সকলের আগে লভিতে মরণ

'নবজীবন' কবিতায়

...আসিয়াছি আমি জাগিয়া প্রভাতে
প্রবেশিতে নব জগত-সভাতে,

শুভ্র পূণ্য বসন অঙ্গে
পরিয়ে দে মা!
...সময়ের পথে হইব যাত্রী
দেহ গো শস্ত্র জগত-ধাত্রী
প্রীতির ধর্মে অটুট বর্ম
গড়িয়ে দে মা,
তূণেতে আমার শর সাধনার
ভরিয়ে দে মা।

শিবনাথ শাস্ত্রী : স্বদেশ-ভাবনার প্রবাহকে সামনে রেখে শিবনাথ শাস্ত্রী দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের উন্নতি এবং সুস্থতাকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে জন-জাগরণের মূলধারাটি কার্যত সার্থক হবে না বলে অনুভব করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন, অধিকার—এ সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের উত্তরণের পথ। এই পথ তখনই সামনে আসবে যখন দরিদ্র শ্রমজীবীদের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে অন্তর ও বাইরে। তার জন্য শিক্ষাবিস্তার দেশের ভাবনাকে অনুরণিত করার মূল আধার। তা যদি আমরা সঠিকভাবে স্বীকার করে অগ্রসর না হই তাহলে জাতির শক্তি বার বার ধাক্কা খাবে—নুইয়ে পরবে আত্ম-শক্তির সমস্ত পরিকল্পনা ও আয়োজন।

...একটা বিষয়ে আমাদের এইরূপ অপর জাতিদিগের অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়াছে—সেটি বর্তমান শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। মাস এডুকেশন, মাস এডুকেশন বলিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার চিৎকার শুনিতে পাই। কিন্তু প্রকৃত কথা এই—এই বিষয়ে গর্বনমেন্ট বা দেশের লোক কাহারও প্রকৃত অনুরাগ বা আগ্রহ নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী অত্যন্ত গভীরভাবে বঙ্গচ্ছেদের প্রতিরোধে সমাজ-জীবনের গভীরে যা করতে হবে তার প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে 'ভারতী'তে 'অনুকরণ ও 'অনুসরণ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্টভাবে বললেন।

...দারিদ্রের তাড়নায় প্রজাবৃন্দ বৃকতাড়িত মেষযুগের ন্যায়। জ্ঞানালোক নাই, উদ্ভাবনী শক্তি নাই, ফলাফল ভাবিবার সামর্থ্য নাই; হাতের কাছে যে দ্বার খোলা পাইতেছে, তাহাতেই মাথা ঢুকাইবার চেষ্টা পাইতেছে, এবং তাড়া খাইয়া ঘরে আসিয়া অনাহারে থাকিতেছে। প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন এ অবস্থা কখনই অপনীত হইবে না।

অমৃতলাল বসু : নাট্যকার-নামকরা অভিনেতা এবং প্রহসন রচয়িতা অমৃতলাল বসু দেশব্রতী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি নিকট শিষ্য ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই

দেশ-প্রেমের সোনার কাঠির জাদু তাঁর অন্তরকেও প্রভাবিত করেছিল স্বদেশ-ভাবনায় এগিয়ে আসতে। তাঁর 'সাবাস বাঙালি' রচনাটি 'ভারতী'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জাগরণের প্রবাহ দুর্বার হইয়াছিল। ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অপশাসন বাঙালির জীবনকে যেভাবে বিধ্বস্ত করছে—অমৃতলাল অত্যন্ত সরল ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। 'ওরা জোর করে দেয় দিক-না বঙ্গ বলিদান' গানটি সে সময় বহু প্রচারিত শুধু ছিল না-গানটি গাইতে গাইতে বাংলার ছেলেরা আরো বেশি শক্তি-তেজে রাঙা হয়ে উঠত প্রতিরোধের জন্য।

প্রমথ চৌধুরী : প্রমথ চৌধুরীর 'বয়কট' এবং 'স্বদেশীয়তা'[৫] খুবই তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক উঁচু মানের দুটি প্রবন্ধ 'ভারতীতে' প্রকাশিত হওয়ামাত্র ইয়ংবেঙ্গল যুব সম্প্রদায়ে চিন্তায় মননে গভীর রেখাপাত ঘটিয়েছিল। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে লেখকের মনন সাধারণ মানুষের ভাবনাকে খুব একটা সায় না দিলেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ববোধের চিন্তাকে বেশ ভাবিয়েছিল। স্বদেশীদ্রব্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে—কিন্তু সেই স্বদেশ-প্রস্তুত মার্কা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদনে ব্যবস্থা না করে অস্বদেশী জিনিষ বয়কট কিম্বা স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের নির্দেশ কোনভাবেই সফল হয় না। প্রমথ চৌধুরী দ্বিধাহীনভাবে জানালেন,

> ...আমাদের কোটি কোটি ইতর-সাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নেই। ...নিজের দেশের গড়া জিনিষ চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার। আমরা সব পুঁথি-পড়া লোক demand এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply এর সৃষ্টি করতে পারিনে।

স্বদেশী দ্রব্য চাই, তার ব্যবহার চাই—কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য, স্বদেশী শিল্প কোথায়। যদিও বা কিছু আছে তার আকর্ষণ তেমনভাবে আমাদের টানে না।

'ভারতী'তে 'বয়কট' সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য খুবই স্বাভাবিকভাবে দেশের বুদ্ধিজীবিদের ভাবিয়েছিল গভীরভাবে—তিনি বলেছেন,

> ...বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে, অথচ আজকের দিনে ধনী-দরিদ-আবালবৃদ্ধ বনিতা বাঙালীমাত্রেই বৃটিশ মাল বয়কট করব-এ কঠিন পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই 'বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দু'দিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করছে। কেবল Economics এর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাব, এত দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তা পার্টিশানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তাঁরা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন।...বয়কট, আমরা রাজার অবিচারের

প্রতিকারে উপায় স্বরূপ মনে করি। ইংরাজ জাতের পকেটে টান পড়লে, চাই কি বাঙালীর প্রতি ও তাঁদের নজর পডতে পারে, এই বিশ্বাসে, এই আশায় বয়কটের জন্ম।

স্বদেশীয়তা ও বয়কট এর নীতিগত গুরুত্ব বোঝাবার দিক থেকে জাতীয় লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেষ 'প্রমথ চৌধুরী গভীবভাবে জাতীয় ভাবনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলছেন,

> ...স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপায়। বয়কটের প্রাণ ক্ষতি স্বীকাবের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেকটা স্বজাতি-বৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে ধীরে চর্চা করিবার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায়।

বয়কট ও স্বাদেশীয়তার চরিত্র বিশ্লেষণে প্রমথ চৌধুরী আরো বলেন,

> ..যাঁরা বলেন বয়কট রাজনীতির কথা, তাঁদের কথাও ঠিক, যাঁরা বলেন স্বদেশীয়তা অর্থনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক। আর আমরা আপামরসাধারণ যারা মনে করি ও দুই-ই এক দেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেশের প্রাণ, আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক।

জাতীয় চরিত্রে দীঘদিনের বিদেশী আদব-কায়দার অনুসরণে যে পরিণাম অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে গ্রহণ বর্জনের স্বচ্ছ-সীমানা স্থির করা খুবই জরুরী। আমরা অনুকরণের মোহ থেকে কতটুকু নিজেদের ছাড়তে পাবো কতটুকু ফিরে আসব সে সম্পর্কে আমাদের চর্চা দরকার। আজ সেই বিলেতি সভ্যতার ভাবনার আসর থেকে মুখ ফেরাতে হবে—এবং তা নির্ভর করবে মানুষ হওয়া চাই, কারণ যে ফেরে সে নিজের ভাবনা জ্ঞান-চিন্তার নির্দেশে স্ব-ইচ্ছায় ফেরে। এইভাবে স্বদেশানুভূতির স্থির-বোধকে কার্যকর পথে সঞ্চারিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধের মূল আহ্বান দেশ জননীর দিকে ফিরে তাকাবার আহ্বান। আর ইংরেজের অত্যাচার প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার উচিত জবাব দেবার জন্য নিজেদের তৈরী করা। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র বসুর 'বিলাতী বুটের আত্মকাহিনী ; হরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'শ্মশান কালী' কবিতা প্রকাশের সূত্রে অত্যাচার প্রতিরোধে বৈপ্লবিক কর্মধারায় শক্তি ও উৎসাহ দিয়েছিল।

স্বদেশ-কাজে, স্বদেশের ভাবনায় যাঁরা নিত্যদিনের নিয়মিত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করতেন তাদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের নজর ছিল প্রতিকূল—তাই কারণে অকারণে নানা অছিলায় সেইসব দেশ-প্রেমীদের শাসকের শাসনদণ্ড ছিল গভীরভাবে তৎপর। এমনি একজন, ময়মনসিংহের রাজেন্দ্রলাল সাহার স্বদেশ-কাজের জন্য শাস্তি হল জেল। জেল থেকে যথাসময়ে যখন তার মুক্তি হল তখন তাঁকে

জেল ফটকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্থানীয় মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সেই জমায়েতে আবেগ ছিল, ছিল উত্তেজনাও। তাই গোরা শাসক শ্রেণী তা সহ্য করতে না পেরে সেই নিরপরাধ জমায়েতের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালালো ঘোড়া চালিয়ে। তাতে হত না হলেও আহত-রক্তশোনিতে সিক্ত হল অনেকেই। এই দৃশ্য অত্যন্ত বেদনা জাগিয়েছিল, ক্ষোভের অপ্রকাশ-ক্রোধ জমে উঠেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী **'শ্মশান কালী'** কবিতায় লিখলেন,

আজি মাগো খুলে রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুন্ডমালা,
ভয়ংকরী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী
সাজ তুমি কপালকুন্ডলা।
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলে হেম বাঁশী
দৈত্য বধি রক্তপান কর মাগো আসি।
শুভদে, বরদে, শ্যামা, শুভংকরী কালী
সন্তানের শিরে তুলি কলংকের ডালি
কেমনে মা সহি' আছ এতদিন সুখে
দানবের পদাঘাত শত শেল বুকে?
তুচ্ছ মোর এ শোণিত দিতেছি হে ঢালি
আজি মাগো সাজ তুমি শ্মশানের কালী।

কবিতাটি খুবই উত্তেজনা জাগিয়েছিল ঘটনার বিস্তার প্রসঙ্গে। কিন্তু স্থানীয় সাধারণ নিরপরাধ দেশবাসীর কথা চিন্তা করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সেই অনিবার্য উত্তেজনাকে প্রশমিত করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর ক্ষত মাথা চাড়া দিয়েছিল গোপন গোপন আলোচনায় গুপ্ত সমিতির নাম না জানা অনেক কিশোরের মনে প্রাণে। সময়টা অগ্নি উদ্‌গারণের—কিন্তু উপযুক্ত পরিস্থিতির ইন্ধন তখনও পর্যন্ত্য দেশে সর্বত্র জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নেতৃবৃন্দের মানসিকতার সর্বসম্মত কোন প্রক্রিয়ার রূপ ও পথ স্বচ্ছ হয়ে উঠেনি। বিচ্ছিন্নভাবে অত্যাচারের প্রতিকারে প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথাও গোপনে গুপ্ত সমিতির কার্যধারা আবার কখনও বা বুদ্ধিজীবী স্থানীয় নেতাদের শান্ত মনোভাব—শক্তি ও তর্ক এই দুয়ে রাজনৈতিক পরিবেশের বাতাবরণে গভীর কোন প্রত্যয় দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল না। একটা ধোঁয়াশায় ঘেরা কিছু নির্দেশ এবং প্রবন্ধে সমস্ত বিষয়টাকে মিথিয়ে দেবার একটা প্রবণতা তখন দেশের রাজনৈতিক ভূমিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমনি সময় 'ভারতী' পত্রিকার ভার পেয়ে সামনের সারিতে এলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বর্ণকুমারী দেবী :

দেশের বেদনা ও ক্ষোভ একত্রিত হয়ে অদৃশ্য শেকড়ে আপন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে শাসকদের দমনীতির তীব্র প্রতিরোধ প্রকাশ্য হয়ে দেখা দিচ্ছে

প্রায় বাংলার প্রতিটি শহরে গ্রামে-গঞ্জে। তারই প্রতিক্রিয়ায় শাসকও মরিয়া হয়ে সর্বত্র নিয়ম অনুশাসন মান্য না করে বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার, লাঠিপেটা, এমন কি রক্তস্নাত করে সাধারণ জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করে তুলেছে। এককথায় বাঙালির শান্ত স্নিগ্ধ জীবনকে তছনছ করার সকল প্রকার আয়োজন ব্যাপকভাবে কার্যকর। দেশের ভেতর থেকেও শাসকের চন্ড-ব্যবহারের প্রতিরোধে নানা কৌশল—বোমা-গুলি এবং নানাবিধ অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল।

'ভারতী'তে সেসময় দু'ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ হতে লাগল। একদল শাসক সরকারের অত্যাচারকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে বিপ্লবী মানসিকতায় কার্যকর পন্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান। অপরদিকে ইংরেজের শাসনের অবসানের কল্পনার বিরূপতা তথা শান্ত চিত্তে সরকারি নীতি ও কর্মধারাকে যথাসাধ্য মান্য করে শান্তিতে বসবাস করার যুক্তিসহ আলোচনা। 'স্বর্ণকুমারী দেবী' এমনি পরিবেশে নিজে 'ভারতী'তে তিনটি প্রবন্ধ—(১) 'লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজনৈতিকতা (২) 'আমাদের কর্তব্য' (৩) 'কর্তব্য কোন পথে'—রচনা করেন।

বাংলার মাটিতে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির পুরোধা লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর বাঙালী তথা ভারতবাসী বিদ্বেষ নানাভাবে ছড়িয়ে রাজত্ব করতে এতটুকু বিলম্ব হয় নি। দেশ জুড়ে অত্যাচারের প্রতিরোধে অসন্তোষ আর অসন্তোষ। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে উদ্বুদ্ধ মানুষদের বিশেষ করে ছাত্রদের প্রতি নির্মম অত্যাচার বেড়েই চলেছে। বরিশালের অধিবেশনের সূত্রে ছাত্রদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার করা হল তাতে দেশ জুড়ে আর্তনাদ জেগে উঠল। এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন...

> ...তখন একথা পীড়িতের আর্তনাদ, পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ দেখিতেছি এইরূপ অত্যাচার অবিচার শান্তিপ্রিয় ধর্ম-ভিরু বঙ্গবালকগণকেও পাশ্চাত্য অরাজকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। বাহুবলহীন পাঠানুরাগী, নিরীহ রাজভক্ত জাতিকেও জঘন্য বিদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইংরেজ শাসন যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর, ইংরাজ রাজ্যলোপ কল্পনা করাও যে আমাদের পক্ষে অহিতজনক, এই ক্ষণিক অত্যাচারে তাহা পর্যন্ত ভুলিয়া দিয়া অবোধ বালকগণ হত্যারূপ পাপকার্য দ্বারা নিজের ও দেশের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। হায়! ইহা অপেক্ষা দেশের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে।

এখানে স্বর্ণকুমারী দেবী ইংরেজ আনুগত্যকে গভীরভাবে সঞ্চারিত করাতে চেয়েছেন দেশের সার্বিক কল্যান সাধনে অরাজকতায় মোহবিষ্টতা থেকে দেশের সন্তানদের সরিয়ে আনার জন্য। কারণ সন্ত্রাস আর হিংসায় রাজশক্তির শক্তি ক্ষয় হয় কম, জাতীয় শক্তি ক্ষয়ের তুলনায়—এই ভাবনায় 'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে লেখিকা

বার বার যুক্তি দিয়ে বলতে চেয়েছেন দেশকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশবাসীকে সংহত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার পথ দিতে হবে। বিদেশী জিনিষ আমরা ব্যবহার করব না এটা যেমন সত্য এবং জোরালো তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর প্রয়োজন মেটাতে স্বদেশীয় দ্রব্যের জোগান-প্রসার ও উন্নতি করাও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এই সময় 'ভারতী'তে শ্রীশচন্দ্রসেনের 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য', গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী প্রসঙ্গ' ; অরবিন্দ ঘোষের 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং কবিতা—'মাতৃহীনের প্রার্থনা', 'মাতৃভূমির প্রতি', 'স্বদেশের প্রতি' ; 'রাখিবন্ধন' ; 'ভিক্ষা' ; 'উদ্‌বোধন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বদেশ-আকুতির প্রেরণা-সিক্ত।

'ভারতী'র 'সাময়িক কথা'র পাতায় প্রবন্ধ-কবিতা-গল্প প্রকাশের সাথে সাথে সে সময়ের দেশের স্বদেশী-আন্দোলনের কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়। এমনি একটি ঘটনার বিষয় হল—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় গোলদীঘিতে একজন ইংরেজ ইংরেজীতে প্রায়ই উচ্চস্বরে জাতীয় সঙ্গীত করতেন—তাতে বহু ছাত্র অংশগ্রহণ করত। সন্ধ্যার সময় গোলদীঘিতে একত্রিত হয়ে এই সঙ্গীত হোত—তাতে গোলদীঘির আসে পাশের কিছু লোক পছন্দ করত না। ফলে সেই ইংরেজকে কিছু লোক তাড়া করতে লাগল। তিনি কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতেন না—তা সত্ত্বেও নানাভাবে হেনস্থা হতেন। এই ধরণের ব্যবহারে বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ের নিরীহ ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সেই ইংরেজ গায়কের প্রতি সমবেদনা জাগ্রত এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের চিত্তলোকে স্বদেশ ভাবনা ধীরে ধীরে উপ্ত হতে লাগল। ধীরে ধীরে একদিকে দেশভক্তদের প্রতি আনুগত্য অপর দিকে নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মবলিদানের ঘটনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধাবোধে শক্তি সঞ্চয় করত। এমনি একটি ঘটনার বিষয় 'ভারতী'র 'রাজ্যের কথা' বিভাগে পত্রস্থ হয়েছিল। কানাইলাল দত্তের ফাঁসির দিনটির বর্ণনা তখনকার 'ভারতী'র পাঠকদের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সহানুভূতি-পুষ্ট প্রেরণায় দেশ জুড়ে নূতন ভাবনার ও চিন্তার বীজকে উপ্ত করেছিল—

> "...কানাইলালের ফাঁসির দিন প্রত্যুষে চারিদিকে শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল—এবং ফাঁসির পরে মহাসমারোহে কালীঘাটে তাহার সৎকার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সহস্র সহস্র যুবক কানাইলালের ভ্রাতার সহিত মিলিয়া ফুলশোভিত মৃতদেহ চন্দন চিতায় তুলিয়া ঘৃতাহুতিদানে দাহ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'স্বদেশ-সঙ্গীতে' এবং 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল পুরুষ নহে, তাহাকে দেখিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত রমনী শ্মশানে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহার মুখে চরণামৃত দিয়াছেন। ফুল বিক্রেতাগণ বিনামূল্যে কানাইয়ের দেহ ফুল-সজ্জিত করিয়াছে। কালীমন্দিরের নিকট দিয়া লইয়া যাইবার সময় মন্দিরের একটি বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার কণ্ঠে ফুলমালা প্রদান করেন এবং মন্দিরে দেবীর নিকট হইতে সদ্‌গতি প্রার্থনায় মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকে। কানাইলাল আমৃত্যু তাঁহার অবিচলিত সাহস দেখাইয়া গিয়াছেন। ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠলগ্ন করিবার সময় তাঁহার মুখে যে সুগম্ভীর হাস্যের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল—দেহ ভস্ম হইবার পূর্ব পর্যন্ত সে হাসি তাঁহার মুখে শোভিত ছিল।

শবদাহের পর দগ্ধাস্থিখণ্ড ও চিতাভস্ম গ্রহণের জন্য দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। একজন ধনী স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহা লইয়া গিয়াছেন।"

'ভারতী'র সাময়িক অংশে এ ধরণের দেশ-ব্রতীর আত্ম-ত্যাগ পরবর্তী ফাঁসির ঘটনাকে পাঠ করে সেসময়ে' ঘরে ঘরে যুবশক্তির মধ্যে নানাভাবে দেশ ও দেশবাসীর কল্যান ও সুখ-শান্তির সুস্থিতির জন্য দেশের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে এবং তার জন্য শাসক ইংরেজের কবল থেকে কিভাবে তা করা যায় সে বিষয়েও গভীর মনন এবং আলোচনা সময় সুযোগে প্রায় সর্বত্র হয়েছিল। ঘটনার বিস্তারে দেশনায়কদের জীবন ও চলাফেরার থেকে যুবশক্তি নিজের জীবনের ইন্ধন খুঁজে পেতে লাগল।

'বয়কট' বিদেশীবর্জন তখনই সার্থক হবে যখন বিপুল জনসাধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজনে স্বদেশ থেকে তা মেটাবার প্রয়াস সহজভাবে হাতের কাছে আসবে। তা না হলে বয়কটের মূল আঁধারে কোন সার্থকতা থাকবে না। তাই দেশনেতৃবৃন্দ স্বদেশী শিল্পের উৎপাদন তথা বিপনণের জন্য মধ্যবিত্ত বাঙালির চিত্তকে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা চলল। দেশের বস্তুর প্রতি মমত্ব জাগাবার সচেতন প্রয়াস জেগে ওঠার চেষ্টা চলল। তারই ফলে দেশজ শিল্পকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির গ্রাস মুক্ত করতে নানা দিক থেকে ইতিবাচক পরিকল্পনা কার্যকর করা হল। তারজন্য প্রায় সকল স্থানে অনুকূল পরিস্থিতিতে শিল্প-প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয়কে বিশ্বস্ত করার চেষ্টা চলল অবিরাম গতিতে। প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা—কোন কোন জিনিষ, বিশেষ করে বিলেতী চিনি ত্যাগ করে স্বদেশী চিনি উৎপাদন কতদূর হওয়া প্রয়োজন ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেশের অভ্যন্তরে স্বদেশীদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছাকে শক্তিযুক্ত করা।

ব্যাপক কিছু পরিবর্তন হয় নি—সম্ভবও ছিল না—তবে ধীরে ধীরে দেশজ-শিল্পের চাহিদার আকাঙ্খা বাড়তে লাগল। যেমন, বিদেশ থেকে বস্ত্র রপ্তানীর হার আগের তুলনায় (বয়কটপূর্ব) অনেক অনেক কম হয়েছে—তার ফলে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে একমাত্র বস্ত্র ভারতে রপ্তানীর হার ছয় মাসে ১৯ কোটি দশ লক্ষ টাকার কম হয়েছে।

এইসব উৎসাহিত সংবাদ দেশের মানুষের আত্মশক্তি ও আত্ম-সমর্থনের দিকে কার্যকর হয়েছিল 'ভারতী'তে প্রকাশিত সংবাদের মধ্য দিয়ে।

॥ চার ॥

যুগান্তর :

বঙ্গচ্ছেদের প্রতিরোধে দেশজুড়ে দেশবাসীর প্রতিবাদ-মুখব এবং কর্মসূচীর নির্দেশসহ নানা আন্দোলন ও শাসকদের অত্যাচারের কাহিনীব বিস্তার যেভাবে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাবই সূত্র ও চিন্তাকে আরো বেশি বেশি কবে দেশবাসীর 'হৃদয়কে শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উৎসারিত ও সোচ্চার হয়ে উঠল 'যুগান্তর'এর প্রকাশে। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় শাসকের অত্যাচারে পাল্টা জবাব দেবার নির্দেশ অত্যন্ত 'plainer language'এব মধ্যে দিযে দেশবাসীর অন্তরে দানা বাঁধত—কিন্তু 'যুগান্তর' সেই দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র মানসিকতায় দেশের যুব-সম্প্রদায়েব কাছে আবির্ভাব হল। দেশের যুব-সমাজের প্রাণ ও যুব-সত্তায় যখন—কি করা যায়, কিভাবে অগ্রসব হব, কি করতে হবে—এই সব ভাবনায় মাথা খুঁড়ছিল ঠিক সেইসময় 'যুগান্তর' মোক্ষম নির্দেশ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে মরণযজ্ঞে তাজা জীবন দেশের নামে আহুতি দেবার কথা জানাল। ঘর-ছাড়া যুব সম্প্রদায় হাতের পাঞ্জায় জীবনটা নিয়ে ইংরেজের অসহনীয় অত্যাচারের পাল্টা জবাব দেবার জন্য তৈরী—ঠিক সেইসময় 'যুগান্তর' দেশের নামে, দেশজননীর নামে সাহস জুগিয়ে 'অভিঃ' মন্ত্র দান করেছে—সম্মুখপানে এগিয়ে যাবার জন্য—তাতে হয়েছে কারাবাস—ঘটেছে নির্বাসন—তার ও পরে মৃত্যু ফাঁস সবটাই যেন তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার উন্মাদনার উল্লাসে সতেজ হবার শক্তি সঞ্চারিত করল। সেখানে পরিপূর্ণ স্বাধীন স্বদেশের জন্য চরম প্রাপ্তি 'মৃত্যুকে' বরমাল্য দিয়ে এগিয়ে যাবার আহ্বান।

'যুগান্তর' ১৯০৬ সালের ৩ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত মুহূর্ত মধ্যে শাসক ইংরেজের নজর কেড়ে নিল। প্রথম সংখ্যায় জানিয়ে দেওয়া হল—"ভারতবাসীর একটা নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই—"। আকাশে-বাতাসে-পথে পথে ধূলিঝড়ের মত সেই 'নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই'—'নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই।' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম তথা বিষয়-বিস্তার এমনভাবে ছেপে ঘরে ঘরে যুব-শক্তির হৃদ-স্পন্দনে সাড়া জাগাতো-যার ফলে অচিরেই 'যুগান্তর' আপন স্থান স্বাভাবিকভাবেই আদরণীয় করে তুলল। কোন আবেদন-নিবেদন, কলহ নয়—সভাসমিতি ও নয়—প্রত্যক্ষতায় বলিদানের আয়োজন—মৃত্যুর সমারোহ—যুব-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি। শাসকদের বিব্রত করতে হবে—বিপদে ফেলতে হবে—তার জন্য 'যুগান্তর' নির্দেশ দিচ্ছে।

> ...অত্যাচার জর্জরিত লোক যদি একবার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, জীবন উৎসর্গ না করলে শত বৎসরের দাসত্ব মোচন হয় না, সেই মনোভাবই শাসক-গোষ্ঠীর বিপদের কারণ।...পাঠকের মনে হতে পারে যে, তারা অতি দুর্বল অথচ পরাক্রান্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি তাদের কোথায়? উত্তর : 'মা ভৈঃ। ইটালী রক্তস্রোতে

> আপনার মসী-রেখা মুছে ফেলেছে।...আজ কি দশ হাজার বাঙলার সন্তান পাওয়া যাবে না—যারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচন করতে বদ্ধ পরিকর!

কি দিয়ে আঘাত করতে হবে! শুধু 'মরণ'ই কি একমাত্র! অস্ত্র চাই, অস্ত্র! কিন্তু কোথায় অস্ত্র—কে দেবে অস্ত্র! টাকা কোথায়—বাইরের থেকে অস্ত্র ক্রয় কববার এত অর্থ কোথায় এই দরিদ্র বাঙ্গালায়!

'যুগান্তর' উত্তর দিল—

> অর্থের প্রয়োজন! এসে যাবে, লুঠ ও ট্যাক্স আদায় করে অভাব মেটাতে পারা যাবে।

'যুগান্তর' ভাষার মধ্য দিয়ে যুব-সম্প্রদায়ের চিত্তে আগুন জ্বালিয়া দিল।

সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)—অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ৪১ নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে ছিল কার্যালয়—ছাপার কাজ হত ৩৬নং বনমালী সরকার স্ট্রীটের 'কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে তবে ছাপার জায়গা কয়েকবার বদল হয়েছিল—। মাঝে 'যুগান্তর' হরিশ্চন্দ্র ঘোষের 'সাধনা প্রেস' থেকে ও ছাপা হত।

'যুগান্তর' পত্রিকায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই 'ভারতউদ্ধার' ভাবনার শরিক। প্রায়ই তাঁদের আড্ডা বসত ২৭, কানাই ধর লেনে অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে। ইংরেজ তাড়াতে হবে, তাদের শক্তি তছনছ্ করতে হবে। এই সংকল্প নিয়েই আড্ডার আলোচনা চলত।

> ....৩-৪ জন যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারা পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী বড় কাজ নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।

এই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত ভাবনায় উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিংগ ওদের চোখে-মুখে। বেশী লোক নয় ; কয়েকজন দামাল ছেলে মাত্র—দেশের প্রবল প্রাণ-শক্তির তেজে চঞ্চল। ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতেই হবে যে কোন মূল্যে, উপায়ে। তার জন্য মৃত্যুকে বরণ করার জন্য এগিয়ে যেতেই হবে এই প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত শরীর ও মন। মায়ের বন্ধন মুক্তির জন্য মরণের স্বাদ যত দ্রুত হয় ততই শক্তির উৎসাহ বেড়ে যায়।

'যুগান্তর'রে ইংরেজ তাড়াবার জন্য সেইসব যুব-শক্তির উম্মাদনার বারুদে মেশানো প্রবন্ধ ও সংবাদগুলি যেন আকাশে বাতাসে দেশের যুব-সম্প্রদায়কে

অনুপ্রাণিত করেছে অল্প কদিনের মধ্যে। পাঠক সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল। যুব সম্প্রদায়ের কাছে অতি প্রিয় উত্তেজক অস্ত্র হিসাবে 'যুগান্তর' পরিগণিত হল।

...the crowds seeking to parchase it (Jugantar) formed an obstruction on the street...

ইংরেজ বিব্রত হল। 'যুগান্তর' এ প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে, যথাদপ্তরে পেশ করা হত। পত্রিকায় প্রকাশিত 'লাঠ্যাষৈধি' এবং ভয়-ভাঙ্গা দুটি প্রবন্ধের জন্য সরকারের কর্তব্যক্তিদের ঘুম নেই—কে লিখেছে কোথা থেকে এর প্রকাশ হয়েছে—খোঁজ করার তাণ্ডব শুরু হল। কিন্তু প্রকৃত লেখকের নাম্ জানা গেল না—ছাপার স্থানের ও ঠিকানার বিভ্রান্তি গোলকধাঁধার মত গোয়েন্দা-পুলিশদের নাজেহাল করল। সম্পাদক কে? অনেকেই এগিয়ে এসে বলছেন, আমিই সম্পাদক। পুলিশের সন্দেহ—নবীন বয়সের ছেলেদের দেখে বিভ্রান্ত। অবশেষে

> ....ভূপেনই একটু মোটাসোটা ও তাহার মানানসই দাড়ি আছে বলিয়া তাহাকেই সম্পাদক স্থির করা হইল।

পুলিশ কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেই (স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই) সম্পাদক সাব্যস্ত করল এবং তার নামেই মামলা দায়ের করল। বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদর্পে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করলেন।

> ...আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক এবং মামলার বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধের জন্য আমি একাই দায়ী। আমার সরল বিশ্বাসে দেশের প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য বলে মনে করছি, তাহাই আমি পালন করছি। আমি আর দ্বিতীয় জবানবন্দি দেবো না, এবং রিচারধীন মামলায় আমি আর কোনও অংশ গ্রহণ করবো না।...

'ভয়ভাঙ্গা' প্রবন্ধটিই দেশের যুব-শক্তিকে ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বন্ধ দুয়ার খুলে বেড়িয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে—যা ইতোপূর্বে স্বদেশীয় কোন প্রেরণায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রভাব শহর-গ্রাম সর্বত্রই যুব-শক্তির অলস-মস্তিষ্কে প্রচণ্ডতম ঝড় বইয়ে দিল—

> ...আমাদের লক্ষ্যে পৌছবার পথে এত রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় আমাদের মুক্তি অবধারিত। ইংরেজের বিপরীত বুদ্ধি, রাজভক্তদের উন্মত্ত প্রলাপ, অবিশ্বাসীর অর্থহীন পরিহাস হতাশার পরিবর্তে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। যেসকল ঘটনা সাধারণের অন্তরে ভীতি বা নিরাশার উদ্রেক করে, কর্মবীরের নিকট তাহাই আশা উদ্দীপনা বহন করিয়া আনে। আঁধারের শেষে আলোকের প্রকাশ। মৃত্যুর মধ্যেই অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত। আর্ত্তের ব্যাকুল ক্রন্দনের মধ্যে ভবিষ্যতের

চিত্তাকর্ষক সঙ্গীতের সুর বর্তমান।..অবিশ্বাসী তত্ত্বের সন্ধানীকে এই বিপদসঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেই হইবে।...সমস্ত দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে, শিবা সারমেয় আনন্দে বিচরণ করিবে, নরকঙ্কাল, নরমুণ্ড যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত দেখা যাইবে। শ্যামল-আস্তরণ আবৃত ভারতভূমি রুধিরধারায় প্লাবিত হইবে। রণচণ্ডীর তাণ্ডবনৃত্য প্রতি চিত্তে এক অভূতপূর্ব রণন সৃষ্টি করিবে। যে অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় বিশ্বামিত্র চণ্ডালের কুটীরে প্রবেশ করিয়া কুক্কুরের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বুভুক্ষা প্রতি নরনারীকে বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া তুলিবে; যখন ধনজন প্রাণের নিরাপত্তা অর্ন্তহিত হইবে, গো ব্রাহ্মণ আর অন্তঃপুরিকাদের সম্মান বিপন্ন হইবে, পাশবিক শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সভ্যতা করালমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখন গোব্রাহ্মণহিতায় ভগবান অমিততেজে আর্বিভূত হইবেন। যতদিন না ধর্মের অবক্ষয় এবং অধর্মের বিস্তার পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত হইতেছে ততদিন ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হইবেন না। যেহেতু আজ অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, অধর্ম্মারেনর সূত্রপাত হইয়াছে—আমরা ভগবানের অনুকম্পা-লাভে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি।....আমরা কেবল বলিতে পারি 'মা ভৈঃ! হৃদয় দৌর্বল্য পরিহার কর।'

যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে,
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দী সহ সমকক্ষ হতে
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল হল। প্রেস বাজেয়াপ্ত হল। তাতে অসন্তোষের আগুন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। অত্যাচার-জেল-দেশের মানুষকে কাবু করতে পারল না। রাজশক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত হানল যুব-হৃদয়ের অতি-সন্তর্পণে রক্ষিত আত্মশক্তি। কোন ভাবেই দেশের প্রতি ভক্তিকে-হেয় করা যাবে না। ''যায় যাবে যাক্ প্রাণ' তবুও সদর্পে ঘোষণায় উদাত্ত আহ্বান 'বন্দেমাতরম'। সরকারী রোষবহ্নি জ্বলে উঠল—আর সকল উৎপীড়নের জন্য দেশের যুবশক্তি তৈরী হতে লাগল 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত পরপর প্রবন্ধের তীব্রভায়।

'ইংরাজের স্বরূপ', 'বসন্তর সাজ', 'আমাদের আশা', 'আত্ম-নির্ভরতা', 'বিধির

বিধান', 'স্বদেশ ও স্বধর্ম' প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুবকরা গোগ্রাসে পাঠ করে নিজেদের অন্তরকে দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য সচিষ্ট করে তুলতে শক্তি পেল।

'যুগান্তর' সম্পাদনায় এলেন ফনীন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি বাঁকিপুরে 'মাদারল্যান্ড' পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। 'যুগান্তর'-এর আহ্বানে তিনি সম্পাদনায় এবং মুদ্রকরূপে যোগদান করলেন। ফণীন্দ্রনাথ মিত্রর সম্পাদনায় 'যুগান্তর' পত্রিকায় উত্তেজক বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ—'আমরা শান্তি চাই না'—'ইংরেজের যথেচ্ছার, 'যুগান্তর-এর নমস্কার'-'বর্তমান সমস্যা'-'বিপ্লবের আবাহন'-নূতন রীতি প্রভৃতি প্রকাশের জন্য ইংরেজ ফনীন্দ্রনাথ মিত্রকে সমন জারি করল। কিন্তু ফণীবাবু হাজির হলেন না। অবশেষে কারাবাস অনিবার্য হল, মুক্তও হলেন।

কিন্তু 'যুগান্তর' চরিত্র বদলানো গেল না। আরো তীব্রতর বিদ্বেষপূর্ণ উত্তেজক প্রবন্ধ—'কালের ভেরী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফনীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পুণরায় কারাবাসের নির্দেশ জারি হল। 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকগণ সকলেই মানিকতলা বাগানে পুলিশেব হাতে ধরা পড়লেন। পরের সপ্তাহেই প্রতিবাদের ঝড় লেখনিতে প্রকাশ পেল—'যুগান্তর'এ প্রবন্ধ লেখা হল—'উত্তিষ্ঠত'. 'আমি এসেছি', 'বিদ্রোহী কে', 'পায়ে পিষে শত্রু হত্যা'।

ক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এর একটি কবিতাও প্রকাশিত হল—

'না হইতে মাগো বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচণ্ডি! জাগো মা আমার
পূজিব তোমার চরণ তট।
অগুরু চন্দন ধূলায় ধূসর
ভূমিতে লুটায় চামর চাঁচর
মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিভিয়া
হ'ল না বুঝি মা পূজন তোমার।
ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া,
জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া
পূজার সময় যায় যে বহিয়া
জাগো মা আমার সময় নিকট।।
দৈত্য-তেজ নাহি করি পরাভব
বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব?
হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব
অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট।
এস রণচণ্ডি! এস রণ সাজে
এস মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে

মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার
শিখাও জননি! সমর উৎকট।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে
সর্বাঙ্গ তোমার সাজাব কঙ্কালে,
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন
জাগো রণচণ্ডি! জাগো মা আমার
পূজিব তোমার চরণ তট॥

ফনীন্দ্রনাথ মিত্রকে পুলিশ ধরে নেবার সময় 'যুগান্তর' পত্রিকার সকল কাগজ ও প্রেসের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তরও পুলিশ নিয়ে যায়। অনেকেই ভাবল 'যুগান্তর' প্রকাশ শেষ হল। কিন্তু মাতৃ-আর্শীবাদ বৃথা হবার নয়। **'সুমতি প্রেস'** থেকে বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে **'যুগান্তর' প্রকাশ হল অপ্রত্যাশিতভাবে ভীম-তেজ শক্তিতে।** সম্পাদক হলেন **নিখিলেশ রায় মৌলিক।** **'শক্তিপূজা'** (বাঙালীর বোমা) প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় হতে লাগল যুবশক্তির জাগরণ এবং ইংরেজের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবার হিংস্র প্রতিশোধ তীব্র গতিতে কাজ করল—আবার ধরা পড়লেন মুদ্রক ও প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
'শক্তিপূজা' প্রবন্ধ প্রকাশ করায় বাংলার যুবসমাজে বেশ আলোড়ন উঠেছিল—যে কোন উপায়ে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেই প্রবন্ধ পড়া চাইই। বীরেন্দ্রনাথের সাজা হল তিন বৎসর কারাবাস। শুধু তাই নয় 'যুগান্তর' এর সঙ্গে যে কোন ভাবে যোগাযোগ রক্ষাকারীদের নানা অছিলায় খোঁজ করতে লাগল এবং হেনস্থার মাত্রা' বাড়িয়ে দিল ইংরেজের পুলিশ।
'শক্তিপূজা' প্রবন্ধের প্রভাব কারাবাস-লাঠিপেটা-এমন কি মৃত্যু-পায়ের ভৃত্য জ্ঞানে-ভয় ভীতি দূর হতে লাগল অত্যন্ত গভীরভাবে যুব-শক্তির মানসিকতার, আত্মানুভবের অনুভূতিতে। **ভয় মানব না, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করব না—ঘরে-বাইরে গোপনে গোপনে কখনও বা সভাসমিতিতে 'প্রকাশ্যলোকে জানিয়ে দেওয়া হল।** শুধু তাই নয়, 'যুগান্তর' সম্পর্কে জজসাহেবদের মন্তব্য—শাসক ইংরেজের উপর প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করে যুব-শক্তিকে হিংস্র করে তোলার সচেতন ব্যবস্থা। তাই 'যুগান্তর' এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ভালভাবে পড়ার ব্যবস্থা শাসকশ্রেণীর লোকজনেরা নজর দিতেন। এমনি পরিস্থিতিতে **অদৃশ্য ইংগিতে 'বিপ্লব' এর ভূমি তৈরি হতে লাগল।**
'অস্ত্রশক্তি' প্রকাশিত প্রবন্ধে সেই ভূমি আরো বেশী উর্বর হল—বিপ্লবের বীজ ভালভাবেই উর্বর হতে লাগল। অত্যাচারের প্রতিরোধে শাসক তথা পুলিশ ও পুলিশকর্তাদের কিভাবে সায়েস্তা করা যায় তার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ। অস্ত্র-প্রস্তুত কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হল।

......শাসককূল বিদেশী হলে, বিপ্লব সংগঠনের সুযোগ আরো বেশী। এইকথা

প্রসঙ্গে শাসকদের দেশীয় সৈন্য নিয়োগ এবং পরবর্তী সময়ে শাসকদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতে দেশীয় সৈন্যদের সমর্থন লাভ এবং তাদের হাতে শাসক শ্রেণী কর্তৃক শোভিত অস্ত্রসকল দেশের স্বার্থে বিদেশীদের উপর কার্যকব কবা.. ।

অস্ত্র সংগ্রহের অস্ত্র-ক্রয় করার উপায় সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত যাতে যুবসম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে চঞ্চল হয়ে উঠে। তার জন্য অর্থ লুণ্ঠনকে ন্যায়বোধের কাজ বলে বলা হয়েছে। বিপ্লব অনুভবে দেশের নানাদিকের গতিপ্রকৃতি নিয়েও প্রবন্ধে আলোচনা ও নির্দেশ দেওয়া হল যাতে যুবশক্তির উন্মেষে দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য সত্যিকারের কাজ করার প্রেরণা জেগে উঠে। কারণ 'যুগান্তর'-এর মূল উদ্দেশ্য—'ভারতবাসীর নিরঙ্কুশ' স্বরাজ 'চাই' এই সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই 'যুগান্তর' প্রকাশের সাথে সাথে শাসক পুলিসের রাতের ঘুম চলে গেল। পত্রিকা প্রকাশের দিন থেকে হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়েছে—কোন ক্রেতা পত্রিকার দামের দিকে (প্রতিসংখ্যা একটাকা) লক্ষ্য করত না—পত্রিকা হস্তগত করাই সচেষ্ট প্রয়াস। শাসক-মেধাবীগণ 'যুগান্তর' প্রকাশ বন্ধ করার জন্য প্রেস আইন নতুন কবে পর্যালোচনা করে উপায় স্থির করেছিল। তাই 'যুগান্তর' প্রকাশ মাঝে মধ্যে অনিযমিত হয়েছিল। চন্দননগর থেকে 'যুগান্তর' যখন প্রকাশিত হচ্চিল তখন সম্পাদকীযতে সরাসবি যুবশক্তির হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে অত্যাচারী শাসকদের অন্যায বিধি প্রতিরোধের প্রেবণা দিয়ে প্রবন্ধ লেখা হত। এক কথায় প্রতিহিংসার ইন্ধন বেশ ভালভাবেই প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দেওয়া হত। অন্তঃপুরের নারী শক্তিকে স্বদেশ-ভাবনায় উদ্‌বোধিত করার কাজে 'যুগান্তর' পত্রিকার ভূমিকা ছিল গভীর। যারা অনেক কৌশলে পত্রিকাটি সংগ্রহ করতেন তারা তাদের পত্রিকা পাঠ শেষ করেই স্ত্রী-মা-বোনদের হাতে তুলে দিত পড়ার জন্য, নিজেদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখে দাঁড়াবার জন্য।

।। পাঁচ ।।

।। বন্দেমাতরম্ ।।

'সন্ধ্যা-যুগান্তর' পত্রিকার প্রায় সমসাময়িক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা। পত্রিকাটি ইংরেজীতে লেখা তাই চারিদিক থেকে স্বদেশানুভূতির ঢেউ ঘরে-বাইরে ভাসিয়ে দেবার পরিকল্পনা থেকেই 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রকাশ। সন্ধ্যা-যুগান্তর যত খোলাখুলি প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার কথা বলা হত তেমন করে বলা হত না 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায়। বুদ্ধিবাদী মানুবের কাছে উপযোগী ভাবা ব্যবহার এবং পরিকল্পনার পরিচ্ছন্ন জাতীয় ঐক্য-বোধের সূত্রগুলি বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হত। শুধু হৃদয়-ভাব- প্রাবল্য বিস্তার না করে বুদ্ধির বিস্তারে বাঙালির মস্তিষ্কে কর্ষণ শক্তি দান করিয়ে ঘটনার ও ঘটনার সম্ভাব্যতার ইংগিত দিয়ে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি করায় প্রবাহ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিশেবত্ব।

'বন্দেমাতরম্' প্রথম প্রকাশিত হল ১৯০৬ সালের অগস্ট মাসে, 'যুগান্তর'এর প্রকাশের প্রায় পাঁচ মাস পরে। কালীঘাটের হরিদাস হালদার মহাশয়ের কাছ থেকে ৫০০.০০ টাকা নিয়ে 'বন্দেমাতরমের' প্রকাশ শুরু। কার্য্যালয় ক্রীক রো।

বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় স্বদেশনুভূতির ছক কষতেন এবং নির্দেশ দিতেন। এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হল,...

> **...ভারতবর্ষ যদি কখনও স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে কংগ্রেসের চিরাচরিত পথ ছেড়ে নিজ উদ্যম প্রয়োগ করতে হবে।**

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় মূল কথা আবেদন-নিবেদনের ভিরুতার পথ থেকে স্বাধীনতার জোরালো দাবী জানাবার দ্বিধাহীন কর্মপ্রবর্তনার প্রস্তাব—এবং তার সফল রূপায়নে পথ নির্দেশ করা। কোনভাবেই 'The Pro-petition plot'-কে 'বন্দেমাতরম' গ্রহণ করতে চাইল না। এককথায় সেই নরমপন্থী আবেদনবাদী মডারেটদের চিন্তা-ভাবনাকে আঘাত করে নস্যাৎ করার একটা জোরালো প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে যুবশক্তির উদ্‌বোধনের একটি হাতিয়ার করা। তার কারণ নানা দিক থেকে মার খেতে খেতে দেশের মানুষের চিত্তলোকে প্রতিরোধের পথ খুঁজতে খুঁজতে প্রতিবাদের প্রত্যক্ষতার সামনে এসে একটা উগ্রতার উষ্ণতা কাজ করে যাচ্ছিল। ঠিক সেসময় মডারেটদের মধ্যে কেউ কেউ সহনশীলতার আর উগ্রতার-এ দুয়ের মধ্যে একটা সমযতার পরিবেশ সৃষ্টিতে তথা ভারতের স্বাধীনতার' প্রশ্নে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে উভয়ের মূল সত্যকে উভয়ের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে সংহতভাবে যাতে চলা যায় তার জন্য সচেষ্ট হলেন। 'বন্দেমাতরম্' সেই দিকেই, যাতে রাজনৈতিক সংহতি রক্ষা হয়—কারণ উভয়ের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের নিরঙ্কুশ 'স্বরাজ', এগিয়ে বলল,

> ...As long as mendicany was their method and their ideal, it was necessary to preserve a show of unity, for it would not do for a 'family of beggars' to disagree and while in different keys, but-now that the nation is making for independence, it is not possible to the united on every possible question.

'বন্দেমাতরম্' খুব স্পষ্ট করেই ইংরেজ-পুষ্ট ও নির্দেশিত আদর্শের স্বরাজবোধি শিকড়কে দেশের মাটি থেকে সজোরে উপড়ে ফেলে দিতে চাইল। কারণ স্বাধীনতা **প্রতিটি মানুষ-জাতির মজ্জাগত পবিত্র অধিকার শুধু নয় বিশ্বসৃষ্টির মূল আধার ও বটে, তাই স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রকৃতির মতই সত্য, ও স্বাভাবিক তার ব্যাকুলতা। বন্দেমাতরম্ তাই বলেছে,**

> **...Eyes have we but see not, ears have we but hear not, so the path of progress, owing to this human folly and perversity is ever deluged with blood...we, where true patriotism and love of freedom inspire the masses, some day present an ultimatum to the present despotism its**

> the Country that unless they make room for the play of out natural rights, as God's children and free citizens cry 'hand off' and bring it at once to an absolute dead-lock.

স্বাভাবিক সত্যকে দেখেও যদি না দেখার ভান কবি তাহ'লে প্রকৃতির নিয়মে আমাদের আপন আশ্রয়-বোধকে লাভ করতে দৈহিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে আর সেদিন স্বাধীনতালাভের অমোঘ আকৃতি 'স্বেচ্ছাচারী শক্তিকে, তা যত বড়ই হোক না কেন, শাসন প্রক্রিয়াকে ধুলায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

'বন্দেমাতরম্' প্রকাশনায় নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চলতে হয়েছিল প্রথম থেকেই। পর্যালোচনার নিরিখে দেশে রাজনৈতিক স্বদেশীয় ভাবাদর্শকে একটা আলাদা মনন ও চিন্তার আলোকে অবগাহিত করিয়ে 'বন্দেমাতরম্' অনেকদিক থেকেই সাড়া জাগিয়েছিল। এবং তার পরিণামে স্বাধীনতার পটভূমিতে নতুন অথচ প্রবল শক্তির বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাই 'বন্দেমাতরম্'-এর চলার পথে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা তার বেগকে বাড়িয়ে দিযেছিল একটি আত্ম-প্রত্যয়ের ইচ্ছাশক্তির সার্থক প্রকাশের জন্য। তার জন্য অতীতের মালমস্লাব কোন গুরুত্ব সেখানে স্থান পেল না—নতুন পবিবেশের তথা পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মত শক্তিধারণের ও প্রকাশের উপযুক্ত আঁধার এবং অবলম্বন করতে হয়েছে। বোমা-আঘাত-প্রতিবোধের বাহন হয়ে এল নানা বচনার মধ্যে। এ কাজে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল পত্রিকার সম্পাদক—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সহকারী সম্পাদক আর অপূর্বকৃষ্ণ বসু প্রিন্টার।

ইংরেজ ভারতবর্ষের শাসন-কাজে যা মুখে বলবে, চোখ রাঙ্গিয়ে যা বলবে রগরগিয়ে যা নির্দেশ দেবে তাই আইন—অপরদিকে দেশকে ভালবাসা—দেশের কথা বলা, বাঙালীর তথা ভারতবাসীর তা অপরাধ-অন্যায়—তার প্রতিবিধান করাই শাসন ও সুশাসন। এই বিষয়টি গভীর মনোনিবেশে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়ে লিখেছিল—

> ....The Britishers' word is law, his very presence and existence in the land a signal for the supperssion and suspesion of many patiotic activities. Reconcilation with foreign despotism is perfect order. It is the height of inpertinance to be begging and asking. It is criminal to insist on the undoing of buroeaucratic actions. To wish for our eternal serfdom is prudence and peacefulness. To think ourselves irremiediobly unfit is wisdom and moderation. To imagine ourselves a nation of madness. To love our Country is superstition. To work for its emancipation is treason. To harbour any such sentiment is sedition. Thus the new nationalism with its boycott

> and Swadeshi, national education and Swaraj, is sulversive of law and order, religion and morality, justice and Fairplay obedience and discipline.

দেশকে ভালবাসা কুসংস্কার, তার পরাধীনতা থেকে মুক্তির চেষ্টা ও ভাবনা বিদ্রোহ এবং সমস্ত দেশের মানুষ এক মাতার সন্তান এই ভাবনা শুধু অন্যায় নয়—পাগলের প্রলাপমাত্র। 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশের গুরুত্ব গভীর ও অনিবার্যভাবে নিয়মিত পর্যায়ে প্রাণশক্তিতে ভরপুর হবার সব রকম প্রচেষ্টায় সম্পাদকগণ নানাভাবে যুব তথা বুদ্ধিদীপ্ত মননের কাছে স্বদেশাত্মার বাণী বিধৃত করার পথ খুঁজে পেল। ইংরেজ তাঁর নিজস্ব ভাবনায় ও চিন্তায় যেভাবে ভারতবাসীর জন্য শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি প্রচলন করেছে তাতে স্বৈর-মানসিকতার তথা স্বেচ্ছাচারিতার শক্তির আস্ফালনই বড় হয়ে উঠেছে। তার ফলে রাজশক্তির দম্ভ এবং শক্তির দাপট শতগুণে বেড়ে গেছে—ভাবটাই এই যে, ভারতবাসীর কোনদিনই আসবে না রাজশক্তিকে খর্ব করার। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। রাজশক্তির যা কিছু করার তার পুরোটাই অত্যাচার-দমনমূলক শাসন প্রক্রিয়ায় ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে।

'বন্দেমাতরম্' ও সেই পরিস্থিতি নিয়ে 'The Strength of India' প্রকাশিত হল। বারবার দেশবাসীকে সাহস জুগিয়ে 'বন্দেমাতরম্' বলে যাচ্ছে—যত অত্যাচার, যত দমন আসুক তাতে পিছিয়ে পড়া যাবে না—আপন শক্তির উৎসমুখে সাহস অবলম্বন করে তা প্রতিহত করতে হবে—ঘুমিয়ে থাকা ভয়ার্ত নেশায় বিভোর হলে 'চাবুক মেরে' বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ ইংরেজ বঙ্গবাসীর তথা ভারতবাসীর জন্মগত শত্রু—তার কাছ থেকে কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা পাবার আকাঙ্খা নিরর্থক। তার জন্যই বাঙালীর চিত্তে ও শরীরে শক্তির চর্চা ও সাহস অবলম্বন করতে হবে—সংহত মননে দেশকে স্মরণে রেখে মৃত্যুর ভাবনাকে হেলা করে তৈরী হবার জন্য নির্দেশ যুব-সমাজের কাছে, বুদ্ধিবাদী দেশ প্রেমিকদের কাছে 'বন্দেমাতরম' প্রবন্ধে অভিপ্রায় ও নির্দেশ দিত। জাতীর সংকটকে প্রতিরোধ করে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য শক্তির চর্চা এখুনি শুরু করা দরকার। দেশ ও জাতীর অপমান সহ্য করার অপরাধের ক্ষমা নেই—ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের উর্ধে উঠে স্বদেশভূমির জন্য এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল ছাত্রদের—সকল ভয়শূন্যতার তেজশক্তির আধারে প্ররোচিত করা। 'বন্দেমাতরম' স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল—দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূলে ইংরেজের দমনমূলক শাসন এবং ব্যবহার। নির্যাতনের প্রকোপ এত বেশী দেশ জুড়ে ইংরেজ শাসনের নামে করেছে তার প্রতিরোধে বাঙালির জাতিসত্তায় শক্তি অর্জন করার জন্য প্রকাশিত প্রবন্ধে ঘোষণা করা হত। শাসক যত শক্তিশালী হোক—একদিন তার পরিণতি ও ইতিহাসের অধ্যায় হয়ে যাবে—যদি দেশীয় যুবশক্তি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদমুখর হয়। তার জন্য হিংসার আশ্রয় অনিবার্য যদি হয় তাতে ও কোন দোষ নেই।

'বন্দেমাতরম' একটি প্রবন্ধে—রাজশক্তির অত্যাচার বিস্তার লাভ করুক, ধনী-দরিদ্র, নারী শিশু নির্বিশেষে—বিরামহীন অত্যাচার যতই বাড়বে তখনই ভারতের আত্মা মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে-মুক্ত বাতাসের আস্বাদনে মেতে উঠবে—জেগে উঠবে সর্বস্তরের মানুষ—নির্বিশেষে। তখনই অস্ত্রের আঘাত ও নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করার, এমন কি মৃত্যু বরণ করার জন্য যুবশক্তির তথা জন-শক্তির মধ্যে আলোড়ন উঠবে অত্যাচার প্রতিহত করবার জন্য, মনকে তৈরী করার প্রবলতা তীব্র হবে। বন্দুক-বারুদের ভয় তখন আর থাকবে না। জাতীয় কল্যাণ পথে প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয়কে সেইমত তৈরী হবার জন্য 'বন্দেমাতরম' প্রবন্ধে নির্দেশ দেওয়া হল।

অদমনীয় মনোবলের সাধনার জন্য নীরবে অত্যাচার সহ্য করে, কোন নির্দেশ মান্য না করে তথা আদালতের গৌরবকে একটুকু মর্যাদা না দিয়ে ইংরেজকে নাস্তানাবুদ করার একটা উপায় ও অনুসরণ করেছিলেন সেই সময়কার কিছু মানুষ। তাতে ইংরেজের সমস্ত অত্যাচার-আয়ুধ ব্যবহার হওয়া সত্বেও কোন অবস্থাতেই ইংরেজের কাছে মাথা নত না করে উন্নতভাবে যাঁরা অনড় ছিলেন, দেশমাতৃকার স্বাধীনতার আপোষহীন সংগ্রামে তাদের উদ্দেশ্যে লেখা হল—

> আপন শক্তির প্রসারিত সত্তায় আমরা কাহারো আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবো না—নিজেদের ভাঙ্গা-গড়ার ভাগ্য আমরাই নিয়ন্ত্রণ করব—সেখানে কাহারো নির্দেশ আমরা মানব না—কারণ আমাদের জন্ম, আমাদের স্বাধীনতা অভিন্ন দৃঢ়তার বন্ধনে যুক্ত—তাই আমাদের পথ পরাধীনতার অন্ধকার ভেদ করে মুক্ত-আলোর সন্ধানে হাত বাড়িয়ে সর্বস্ব সঁপে এগিয়ে চলা।
>
> ...We nationalists declare that man is for ever and inalieuably free and that we too are both individually as Indian men and collecti.ely as Indian nation for ever and inalieuably free. As free men we will speak the thing that seems right to us without caring what others may do to our bodies to finish us as being free men....

আবার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বিরুদ্ধে রাজশক্তির দমনরোষ বহ্নির যন্ত্রনার মামলা শুরু হল। ইতিমধ্যে The Yugantar case এবং The Politics for Indians প্রকাশিত দুটি উত্তেজক প্রবন্ধের জন্য মামলায় প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হল—অবশ্য অল্পকিছুক্ষণ পরেই তাঁকে জামিন দেওয়া হল। কিন্তু 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার ম্যানেজার হেমেন্দ্রনাথ বাগচি এবং মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসু ও অরবিন্দ ঘোষ সহ আদালতে হাজির হতে হল—অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রবাবু মুক্ত হলেন—কিন্তু অপূর্ববাবুর ৩ মাস কারাদণ্ড হল।

কৌশলগত কারণে সেসময় বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম' থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। ইংরেজ উল্লসিত হয়ে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষীরূপে হাজির করল। কিন্তু

বিপিনচন্দ্র পাল সমাজের স্বার্থে, দেশের কল্যাণে আদালতে হাকিমের মুখের উপর দীপ্ত কণ্ঠে সেই মামলায় বিবেকগত কারণে শপথ গ্রহণ করার আপত্তি জানালেন—কোন সহযোগিতা না করে আপন আদর্শ ও মতের উপর দেশবাসীর সত্যব্রতকে শক্তিশালী করার দৃষ্টান্ত দিলেন। কিন্তু আদালত তা সহজভবে হজম করল না-আদালতের সহিত অসহযোগিতা করলেন যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অনিবার্যভাবেই বিপিনচন্দ্র পালকে আদালত অবজ্ঞা করার অজুহাতে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল ছয় মাসের।

বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রবল ঝড় উঠল। আদালতে বিপিনচন্দ্র পালকে আনা হল। কাতারে কাতারে যুবকরা জেগে উঠল-ভীড়ঠাসা আদালত লালবাজারের কাছারি ঘরে এবং রাস্তায়। হাকিম তা সহ্য করতে পারলেন না, হুকুম দিলেন ভীড় কমাবার জন্য—বিশেষ করে উত্তেজিত যুবকদের। হাকিমের নির্দেশে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টরা বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাল—ছত্রভঙ্গ করার জন্য। নিমেষের মধ্যে উভয় পক্ষে প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় বিচারালয়ের প্রাঙ্গণ রণক্ষেত্রে পরিণত হল। 'মারের বদলে মার' পদ্ধতিতে উভয় পক্ষ মেতে উঠল। পনর বছরের সুশীলচন্দ্র সেন মারমুখী একটি সার্জেন্টকে প্রবল জোরে ঘুষি দিল—সার্জেন্ট সুশীলকে ধরে নিয়ে গেল হাকিমের কাছে। কিছু বলার আগেই সুশীল রাগত হয়ে বলল,

> ...সার্জেন্ট-সাহেব বেপরোয়াভাবে সবাইকে মারছে এবং তার মধ্যে আমাকেও, তাইতো আমি ঘুষি মেরেছি...শুধু তাই নয় আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মেরেছে কয়েকটি পুলিশ—

হাকিমের ক্রোধ আরও বেড়ে চলল—সুশীলের ভয়শূণ্য সত্য প্রকাশের জ্বালায়। হাকিম তাঁর রায়ে সুশীলের উপর ১৫ ঘা বেত মারা্‌ আদেশ দিলেন। প্রেসিডেন্সী জেলে সুশীলকে নিয়ে যাওয়া হল—তারপর শুরু হল বেত মারা। সুশীল এক-এক-ঘা করে বেত খেয়েছেন আর 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনিতে নিজের রক্তে অভিষিক্ত করছেন মাতৃ-চরণ।

> ...যায় যাবে জীবন চলে
> জগৎমাঝে তোমার কাজে
> বন্দে-মাতরম্ বলে।
> বেত মেরে কি মা ভোলাবি
> আমরা কি মার সেই ছেলে?
> হবে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
> কে পালাবে মা ফেলে?

'পুলিশ মারা'র কাজের জন্য সশস্ত্র আঘাত হেনেছে রাজশক্তি দুর্বার গতিতে। আবার অনেকস্থলে অপরাধে জড়িত নয় এমন যুবকদের, যারা প্রতিবাদ মুখর, পুলিশ আটক করেছে—বিচারালয়ে নিয়েছে—প্রহসন হয়েছে—সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি দিয়েছেন

হাকিম—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাণিকলাল দে ও প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়দের।

এত অত্যাচার, এত বেত্রাঘাত, এত নিষেধাজ্ঞা কিন্তু 'বন্দেমাতরম' এর কণ্ঠ স্তিমিত করতে পারেনি সরকার। যত আঘাত এসেছে, অন্তর-শক্তির তেজ ততই জ্বলে উঠেছে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে। 'Strength out of weakness' প্রবন্ধে স্বাধীনতার কামনায় আঘাত এলে দুর্বলের মধ্যেও শক্তির জন্ম নেয় এবং তা নিমেষের মধ্যে সঞ্চাবিত হয় দুর্বার বেগে। প্রবল দমন প্রাথমিকভাবে মানসিক অবসাদে মন প্রাণ বিষাদগ্রস্থ কবে তোলে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন করতে পাবে না। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি ভেতবের কামনার পরিপূর্ণতার বেগে আবাব জেগে উঠে সেই জাগরণে সোনাব কাঠিব স্পর্শ **'বন্দেমাতরম' ছুঁইয়ে দিল যুব-শক্তির অন্তরে অন্তরে।**

ছলনাব কৌশলে যুবশক্তিকে তছ্নছ কবাব পরিকল্পনায় ইংরেজ তখন মেতে উঠেছে। দেশের মানুষের এক অংশ নানা অছিলায় নীরব থাকলেও সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ মানুষের মানসিক উত্তেজনা অসন্তোষেব মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। কিছু পেতে কিছু দিতেই হবে—এই ভাবনায় বাঙালার ঘরে ঘরে অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি চলছে—নানা ধবনের অত্যাচাব সহ্য করার। **শুধু একটি মাত্র বিশ্বাসকে অবলম্বন করে—অন্ধকারের পর আলো আসবেই, অত্যাচারের পর মঙ্গলের, কল্যাণের আনন্দ উৎসব সামনে আসবেই। স্বদেশের স্বাধীনতা—এই কামনা এই আরাধনা—অন্য কোন কথা নয়, উদ্দেশ্য নেই—তাই, এই অকপট আকাঙ্ক্ষার স্বার্থক ফল বিনা দুঃখে, উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে পাওয়া যাবে না।** বঙ্গজননীর ছেলেরা তা বুঝতে পেরেছে—আর সেই অভিজ্ঞানে চিত্তকে মরণ-নৃত্যে সচল করে রাখতে দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করতে এতটুকু দুর্বলতা সেদিন জাগেনি।

'বন্দেমাতরম'এ প্রকাশিত হল 'Bengal on Trail' প্রবন্ধ। প্রবন্ধে-ঝড়ে যুক্ত হল সর্বনাশা আগুনের লেলিহান শিখা।

> ...We feel no doubt very strongly for those who are bearing the brunt in the struggle, But we have no other consolation to offer to them than that sorrow is at once the lot, the trial and privilege for those who work for leaving the counity better than they found it. There is no royal road, no safe path from misery to happiness, from darkness to light, from weakness to strength, from shame to glory. Reason and intellect, wisdom and experience cannot suggest any other course than what we have adopted. We must pay for things worth having.

প্রবন্ধটি প্রকাশের পর বিদ্যুৎ প্রবাহের মত ছন্নছাড়া যুব-চিত্তে আগুন জ্বলে উঠল স্বদেশের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য প্রাণ সমর্পন করতে। নগরে, নগরে জেলায় জেলায় **পুলিশী অত্যাচারের প্রতিরোধ দুর্গ স্থাপিত হল—সংহত মানসিক চিন্তায় দেশ ও দেশজননীর কল্যাণ কর্মে উদ্বুদ্ধ কর্মধারার প্রবাহ বইতে লাগল।** দেশ-গৌরবের

অতীত ঘটনা ও উচ্চ-আদর্শ তথা দেশাত্মক চিন্তার প্রবলতাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য সর্বস্তরের সর্বধর্মের মানুষের মধ্যে জাগণের শিখা ধীরে ধীরে জ্বলে উঠতে লাগল। থম্‌কে থাকা মৃতপ্রায় গ্রাম-নগর-বাসীদের নতুন পথের আদর্শে অভিষিক্ত করার আয়োজন নানাভাবে রূপ লাভ করতে লাগল।

নির্যাতনকে আর ভয় নয়—অত্যাচারকে মাথায় রেখেই এগিয়ে যাবার শপথ নেবার আয়োজন সর্বত্র। শাস্তি আর মৃত্যু একাকার হয়ে গেল। ত্যাগ ও লালসার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল—কিন্তু ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল যুব-চেতনা দেশের স্বার্থে, লোভকে জয় করে এগিয়ে যেতে চায়। স্বদেশের আহ্বান, তাতে সাড়া দেবার জন্য, নিজেকে যুক্ত করার জন্য আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় আত্ম-শক্তির সংহতজ্ঞানে মাতৃ-ভূমি স্বাধীনতা, দেশ-জননীর শৃংখল-মোচনের জন্য ঘর পথে নেমে এল।

'বন্দেমাতরম' জানিয়ে ছিল,

> ...These workers must be sefless, free from the desire to lead or shine devoted to the work of country's sake, absolutely obedient and full of energy. They must breathe the spirit of the seffless faith and aspiration derived from the spiritual guidance of the institution.

দেশ-মাতার চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন। একমাত্র ধ্যান দেশ, দেশমাতা। দেশই আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রাণ-আমাদের দেহ, আমাদের যা কিছু কামনা, ভাবনা। এতটুক শিথিলতা তাতে স্থান যাতে না পায়, সেজন্য প্রতিনিয়ত মাতৃ-ধ্যান ও মাতৃ-ভাবনায় নিজেদের অনুধ্যান করতে হবে। মাতৃ-আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হলে তেমনভাবেই সন্তানকে তৈরী হতে হবে—আমাদের মনে রাখতে হবে—**আমাদের যা কিছু সম্বল সবটাই মাতৃ-প্রসাদ। তাই মাতার জন্যই আমাদের সব শ্রম, সব সঞ্চয়।**

এইভাবে ত্যাগের ধর্মে যুব-শক্তিকে অনুপ্রাণিত করার বিপুল আয়োজন।

> ...For every store that is added to the national edifice a life must be given. ...She asks for our hearts, our lives nothing less nothing more. she will look to see how much of ourselves we have given, how much of our substance, how much of our labour, how much of our ease, how much of our safety, how much of our lives. Regesseration is literally rebirth-rebirth comes not by the intellect, not by the fulness of the purse, not by policy, not by change of machinery but by getting of a new heart, by throwing away all that we were into the fire of sacrifice and being reborne in the mother...

মৃত্যু ভয়শূণ্য প্রাণের সমারোহে 'বন্দেমাতরম' আহ্বান জানিয়েছিল যুব-সম্প্রদায়কে। ত্যাগ এবং ভয়শূণ্যতাকে মাতৃ-চরণে নিবেদন করার আহ্বান। অত্যাচার ইংরেজের চিত্তে ভারত-সন্তানে ভয় জাগাতে হবে-তবেই তাদের দমনের যথেচ্ছা স্তব্ধ হবে।

পরাধীন দেশের মানুষের আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান জাগাতে হবে—বাধাহীন গতিতে দেশ

ও জাতির প্রতি কাজ করে যেতে হবে—সত্যিকারের অধিকার-দাবী জানাতে গতিশীল হতে হবে-তবেই পথ সামনে এসে যাবে-প্রেরণার উৎসের গতি বেড়ে যাবে। তখনই মহাগতিবেগ ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারা কোনভাবেই আমাদের ধরে রাখতে পারবে না। 'বন্দেমাতরম' তার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে নূতন যুব-শক্তির আবাহনকে জোরালো তেজে সামনে আনার জন্য সচেষ্ট। নব-জাগ্রত শক্তির দ্বারাই দেশ ও জাতীর সংকল্পের মন্ত্র সার্থক হবে-যোগ্য নেতৃত্বে পথ দেখাবে। তাই পত্রিকায় প্রকাশিত হল,

> ...There are jimctures in the affairs of the world, when new men are produced-the men, of the moment, the men of the occassion, the men of destiny where spirit attracts, unites and inspires, where capacity is congenial to the crisis, where power is equal to the convulsion who are the outcome of storm.

ভারতের স্বাধীনতা কোন ব্যবহারিক কাজের জন্য নয়-নব যুব সম্প্রদায়ের কাছে বন্দেমাতরম তা জানিয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক সম্মিলিত পরিপূর্ণতার সাধনাই ভারতের স্বাধীনতার সাধনা। বন্দেমাতরম তাই জানালে,

> ...This freedom is essentially a spiritual fact. It is not politics. It is not democracy as democracy is understood up till now is Europe. It is religion, this noble freedom that we desire to posses.

'বন্দেমাতরম' এ প্রকাশিত ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে দেশের ভেতরকার যুব-সম্প্রদায়ের চিত্তকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে-দেশের স্বার্থে, দেশবাসীর স্বার্থে ইংরেজ তা বুঝতে পেরেছে। তাই নানাভাবে .সেই 'বন্দেমাতরম'কে স্তব্ধ করার বিভিন্ন ছল-কৌশল যখন সম্পন্ন ঠিক তারই সঙ্গে যুক্ত হল পত্রিকার প্রকাশ-সংক্রান্ত আর্থিক দুরবস্থা। দিনরাত পুলিশী নজর, বিশ্বাসঘাতক কিছু দেশীয় মানুষের তৎপরতা সব কিছুর প্রবলতায় সরকারী নির্দেশে 'বন্দেমাতরম' এর উপর নোটিশ জারি হল। সেই সময় 'Traiter in the camp' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে আরোও স্বচ্ছ পরিকল্পনার ছকে পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেবার দুর্বার প্রচেষ্টা।

একদিকে বিশ্বাসঘাতকদের পরিচয়—উর্মিচাঁদ কাহিনীর উল্লেখ আর একদিকে দেশে আত্মত্যাগের কানাইলাল দত্তদের কাহিনী সব মিলিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশের শেষ প্রহর এসে গেল। কিংসফোর্ড পত্রিকাটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> ...In my opinion the article is an encourgement to others to follow the example of Kanai and hence is an incitement to murder or acts of violence. Kanai is to be written of in history ; he is to be written of as the first of the avengers.
>
> Kanai's life is a spelndid one-no longer shall the betroyer be safe from avenger's hand. Gossain is a hated monster. His death was needed.

॥ ছয় ॥

প্রবাসী :

বঙ্গদেশের বাইরে বর্হিবঙ্গে মাসিকপত্র প্রকাশিত হল এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। ছাপার ব্যবস্থা হল এলাহাবাদের চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে। পত্রিকাটি ছাপা ও অন্যান্য বিষয়ে রামানন্দবাবুর সহযোগী ছিলেন মেজর বামনদাস বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এলাহাবাদের হাইকোর্টের উকিল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র আগে 'প্রদীপ' এই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। যে সময় 'প্রবাসী'র (১৩০৮) প্রকাশ হয় তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশ বঙ্গদেশে উত্তাল। এলাহাবাদে তেমন ছোঁয়া না লাগলেও বাঙালির মানসিকতায় রাজনৈতিক তাপ বেশ উপ্ত হচ্ছিল। তা ইংরেজ সরকার ভালভাবেই অনুভব করেছিল। তাই তাদের নজর সেই প্রবাসের বাঙালীদের প্রতিও কঠোর ও বিশেষ দৃষ্টি থাকত অনবরত। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'প্রবাসী' পত্রিকার উন্মেষ-সংখ্যায় 'আবাহন' এই নামে একটি কবিতায় 'প্রবাসী'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন—

...প্রবাসী স্বদেশী হবে! এক পরিবার
সব নরনারী-বিশ্ব একই সংসার।

কিন্তু স্বদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে স্বাধীনতার জন্য যে তোলপাড় হচ্ছে সর্বত্র প্রতি গ্রাম-গঞ্জে, নতুন নতুন ভাবনায় যুব-সমাজের চিত্তলোকে নব-উন্মাদনার সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে প্রবাসের বঙ্গ-সন্তানরা বিচ্ছিন্ন, অনেক দূরে। অথচ তাঁদের অন্তরেও সেই আলোড়নের ঢেউ আছড়ে পড়ছে অনবরত-কিন্তু কিছুই করার নেই—একটা স্থবিরত্বের নাগপাশে আবদ্ধ মরণযন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করছে প্রবাসের বঙ্গসন্তানদের হৃদয়। এই অভাববোধ প্রবাসের বঙ্গ-জীবন বেশ কাতর। সর্বজনীন যোগসূত্রের অভাব থাকলে কিভাবে প্রবাসী স্বদেশী হবে। এমনি ভাবনায় স্বদেশ ও প্রবাস তথা বিশ্ব নানাভাবে যোগসূত্র তৈরী করতে পারলে সত্যিকারের 'প্রবাসী'র অভাব পূরণ হবে। তার জন্য প্রয়োজন সাহিত্য। এই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রবাস ও স্বদেশের মেল বন্ধন হতে পারে। আত্মীয় বন্ধনের সূত্র সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি এই প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বলা হল—

আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির জনমের ভিটাতে?

প্রায় এক যুগ পরে (১৩১৫) কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'প্রবাসী'তে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়—

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।

পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে।
পব ভাষণ আসন আনন রে,
পর পণ্যে ভবা তনু আপন রে।
পব দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

কবিতা প্রকাশের পব থেকেই 'প্রবাসী' পত্রিকার মূল ভাবনায় বেশ একটা স্বাদেশিকতার রং এর ছোঁয়া যেন আপনা থেকেই লেগে গেল। আমার স্বদেশ অথচ আমার অজানতে স্বদেশের ভাল-মন্দ আয়-ব্যয় বিবেচিত হচ্ছে। স্বদেশের কোন কিছুই বঙ্গবাসীর আয়ত্বের মধ্যে নেই।

'প্রবাসী'র সাময়িক প্রসঙ্গে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর গোবিন্দচন্দ্র রায়ের প্রকাশিত কবিতার বিষয়ে যে ভুল বুঝাবুঝির কথা উঠেছিল সে সম্পর্কে লেখেন

...আমবা স্বদেশে বাস করি বটে, কিন্তু দেশের কোন ব্যবস্থা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাপেক্ষ নহে। আয়-ব্যয়ের বন্দোবস্তও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপব নির্ভর করে না। সুতরাং আমরা স্বদেশে থাকিয়াও প্রবাসী।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের প্রকাশিত কবিতার মূল কথা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ হবার অনেক আগে থেকেই স্বদেশভাবনায় দেশ মাতৃকার কথা প্রবাসী পত্রিকায় কিছু কিছু থাকলেও ব্যাপকভাবে আলোর মুখে রবীন্দ্রনাথেব লেখা দেশাত্ববোধের অনুভবে সঞ্চারিত প্রবন্ধগুলি গভীরভাবে বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করেছিল।

—প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি—ব্যাধি ও প্রতিকার; যজ্ঞভঙ্গ; পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনতে সভাপতির ভাষণ ; সমস্যা ; সদুপায়; পূর্ব ও পশ্চিম এবং শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বাঙালি জাতির মধ্যে ভাবের আলোড়ন যতটা গভীর ও ব্যাপক তার তুলনায় কর্মের প্রতি, দেশের ও দেশবাসীর প্রতি কিছু কাজ করার গতি ততটা প্রবল নয়, বরং অনেকটা কৃত্রিম। কাজের জন্য স্বাভাবিকভাবে আবেগ-উত্তেজনা থাকতে পারে-কিন্তু কোন কাজ করব না-কাজের জন্য ভাবনা করব না অথচ আলোড়ন সৃষ্টি করব—এ ব্যাপারটাতে দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ হয় না। তাই স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা জাগাতে হলে কাজের নির্দেশ তার পথ নির্ণয় করা একান্তভাবেই আবশ্যিক। তা না হলে শুধু নেতৃত্বের মুখে বড় বড় কথার ফুলঝুরিতে কাজ এগুবে না বরং প্রতিপক্ষ ইংরেজ তাতে আমাদের আত্মশক্তির অভাবের কথা জেনে আরও বেশী করে আমাদের প্রতি অমার্জিত আচরণ করতে এতটুকু পিছপা হবে না। বাঙালির এই চরিত্রগত দুর্বলতার সুযোগ ইংরেজ পুরোপুরি সদ্‌ব্যবহার করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

...ভাবিয়া দেখ দেখি ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি

ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে আমরা 'বন্দেমাতরম্' হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত কবিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়েব দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্ন আদালত হইতে সুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তার পরবর্তী আন্দোলনের সূত্রে বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ তেমনভাবে যুক্ত হয়নি। এটা বাঙালি নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একবারটি ভাবনা আসেনি—কেন মুসলমানরাও আমাদেরই, আমার দেশের, আমার ভাষার, আমার ভাবনার সহধর—ভাই। তবে মুসলমানদেব অবস্থান আছে নেতৃবৃন্দের এই অনীহার শূন্যতায় ইংরেজ তার কৌশলকে রাজশক্তির সঙ্গে এক করে অনুভব করে কাজ করেছে। এটা দুর্ভাগ্য—আর এর মূলে রয়েছে দীর্ঘদিনের উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের ভেতরের পাপ শক্তি যার ফলে আমরা দু'সম্প্রদায় মিলতে পারিনি। বাইরের প্রচ্ছদটাতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা থাকলেও ভেতরে ভেতরে এ ব্যাপারটা আন্তরিকভাবে অনুভব করিনি। প্রতিদিনের আচার ব্যবহার থেকে উভয়ে উভয়কে দূরে রেখেছি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন,

...আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়-আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহু শত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখের মানুষ তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধে মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায়, শাস্ত্রও মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার ত কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনদিনই হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বারবার অনুভব করেছেন স্বরাজের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে যুক্ত হতে হবে-নতুবা ইংরেজ সেই সুযোগ গ্রহণ করবে এবং কোনদিনই 'বন্দেমাতরম'

এই ধ্বনির দ্বারা কিছুই লাভ হবে না। দেশের জন্য দেশবাসীর কল্যাণের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সত্যকে সামনে না রাখলে কোনদিনই কোন আলোড়নে দেশের ভাগ্য ফিরবে না। স্বরাজ সার্থক হবে না।

সেসময় রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মনোভাবের সমর্থন অনেক নেতৃস্থানীয়রা সহজে গ্রহণ করতে পারেননি।

স্বরাজের প্রশ্নে বাঙলাদেশের নেতৃবৃন্দের 'বয়কট'-'স্বদেশী' ইত্যাদি প্রস্তাব ও ভাবনা তখনকার কংগ্রেসী নরমপন্থীরা গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তার ফলে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) বিষয়টির উপর বাদ-প্রতিবাদ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং তাদের দলীয় শক্তি ও বড়। প্রথম অধিবেশনটি এই সূত্রে কর্মশালা হয়ে গন্ডগোলের সৃষ্টি করে। পরদিন (২৭ ডিসেম্বর) অধিবেশন শুরু হবার মধ্যে তিলক একটি সংশোধনী প্রস্তাবের উপর তাঁর বক্তব্য পেশ করতে উঠেন তখন মঞ্চের উপর প্রচণ্ড বাধা পান এবং গণ্ডগোল এমন পর্যায়ে যায় যে, বিবদমান দুপক্ষের সমর্থকরা নানাভাবে চেয়ার-জুতো ছুঁড়তে থাকেন। বিরাট বিশৃংখলার মধ্যে অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায়।

কংগ্রেসের নরমপন্থীরা কোনভাবেই চরমপন্থীদের কথা ও চিন্তাকে আমল দিতে চাইল না। অথচ এই চরমপন্থীদের মানসিকতার বীজ তৎকালিন অবস্থার উপরই উপ্ত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে, জন সাধারণের আস্থা পেয়েছে। একটা অহংকারজনিত মানসিক হীনমন্যতায় প্রভাবিত নরমপন্থীদের কথাবার্তা-ব্যবহার চরমপন্থীদের প্রতি খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। রাজনৈতিক গতি প্রকৃতিতে অনিবার্যভাবে চরমপন্থীদের প্রকাশ, তার ব্যাপকতার বিস্তার স্বাভাবিক পথ ধরেই চলেছে। কিন্তু নরমপন্থীরা তা স্বীকার করতে, গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। তর্ক ও বাদ-প্রতিবাদের ঘোলা অস্বচ্ছ পরিবেশের সৃষ্টি করে চরমপন্থীদের কার্যধারাকে বিদ্রূপ করে দেশের মানুষকে বিরত থাকার প্ররোচনা দেবার নানা কৌশল নরমপন্থীদের তখন বিশেষ ভূমিকা। কংগ্রেস এ ধরনের অর্থহীন চিন্তায় আপন সত্তার স্বকীয়তাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হতেছিল। রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থীদের একঘোয়ামীর পথ পরিহার করার জন্য 'যজ্ঞভঙ্গ ' প্রবন্ধটি প্রবাসীতে লিখলেন।

> ...বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কংগ্রেস ভাঙিয়াছে।...

সত্যকে অস্বীকার করার মাশুল কংগ্রেসকে দিতে হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের ভিত্তিভূমি যে কংগ্রেস এতদিন নানাভাবে দেশের সামনে তুলে ধরেছিল আজ কংগ্রেসের ভেতরকার নরমপন্থীর কিছু অবিবেচক নেতৃত্বের জন্য কংগ্রেসকে কেউ আর আদর করতে পারছে না—ভরসা করতে পারছে না। এতদিন দেশের কাছে দেশ ও ইংরেজ এই দুই ভাগ ছিল ; আজ আমাদের অর্থাৎ দেশের মধ্যেই নরম-চরম দু'পক্ষ হয়ে গেল—ইংরেজ সেই একপক্ষ-অত্যন্ত ক্ষমতার পক্ষ হয়ে দেখা দিল।

ইতিমধ্যে পাবনার (অধুনা বাঙলাদেশ) প্রাদেশিক সম্মেলনে (১০৭) রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করার প্রস্তাব হল। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করার প্রস্তাবে কোন কোন মহলে অসন্তোষ জেগেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন—তবুও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।

সভাপতির ভাষণে (বাঙলায় ভাষণ দেন) রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগে সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনের ঘটনার উল্লেখ করে স্পষ্টভাবেই বললেন।

> ...চরমপন্থী বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায় সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি এদেশে সকলের চেয়ে বড় এবং মূল extremist কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেইটানেই আপনি চরমে উঠিয়া যায়। এটা আমাদের নিজের কাহারো দোষে হয় না, এটা বিশ্ববিধাতার নিয়মেই ঘটে। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুন দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত।

বঙ্গবিভাগ আটকাবার জন্য যে নিষ্ঠা ও শ্রম করা হয়েছে—তার চেয়ে আরো আরো বেশী করে সচেষ্ট হতে হবে আত্মবিভাগকে প্রতিরোধ করতে। কংগ্রেসের নীতি ও তার পরিবেশন ধারায় অহংকার ও শক্তির দম্ভে দেশের সত্যরূপকে অস্বীকার করে যে আত্মবিভাগের সৃষ্টি করা হয়েছে—বাংলার তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মধারায় তথা রাজনৈতিক প্রেরণার শক্তিতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করবে। রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন তাই, পাবনা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সেই অনাগত অন্ধকারের কথা বলতে সুযোগ গ্রহণ করলেন।

কংগ্রেস জাতীয় শক্তির প্রকাশ—সেই কংগ্রেসের পরিচালনায় নরম-চরম এই বিচ্ছেদের কাঁটা ঘায়ে দু'পক্ষের দ্বারা নুনের ছিটা দেবার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। এই দিক থেকে চরমপন্থীদের পথকে স্বাভাবিকভাবেই দেশের মানুষ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় সত্তায় বিপন্নতার ঘনঘটা যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল তখন দেশজুড়ে স্বদেশীয়গণ আবেগ ও উত্তেজনায় বিভোর হয়ে বিদেশী বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ এই আন্দোলনে বাঙালির বৃহত্তর অংশে তার প্রভাব তেমনভাবে গৃহীত হয়নি—যার ফলে বাঙালির লাগামহীন ভাবাবেগের মধ্যেই বদ্ধ হয়ে রইল। স্বদেশ-অনুভবে সবচেয়ে বড় যে দিক তা হচ্ছে, আত্মশক্তির উদ্‌ভাবনের জন্য সক্রিয় হবার দিক। কিন্তু তা না হওয়ায় আত্ম-বিরোধ, স্ববিরোধ গভীরভাবে বিদেশীশক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেখানে দেশবাসীর অন্তরসত্তার প্রতি তেমনভাবে মনসংযোগ করা

হয়নি যতটা ইংরেজকে গালমন্দ করে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে উদ্যোগী হয়েছি। তাতে বাঙালির অন্তর থেকে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা—আন্তরিকতা কতটা জেগেছে তার পরবর্তী সময়ের প্রভাব থেকে বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'সদুপায়' প্রবন্ধে সে সম্পর্কে বলেছেন,

> ...সত্যকথাটা এই যে ইংরাজের উপর রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম। দেশের লোকের প্রতি ভালবাসাবশতই যে গিয়েছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় 'ভাই' শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।'...বিলাতি ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এতবড় অহিত আর কিছু নাই।...

রবীন্দ্রনাথ বার বার ভারত-ঐতিহ্যের সেই সনাতন মানসিকতার নিরিখে তৎকালের আন্দোলনের ভাবনাকে বিচার করতে করতে ভারত-আত্মার শাশ্বত বিশেষত্বকে অনুভব করেছেন-যা বিরোধের মধ্যে মিলনের সত্যকে বিকশিত করার ব্যাকুলতা। তাই ইংরেজের প্রতি দেশের মানুষের বিদ্বেষকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। মনুষ্যত্বের বিরাটতম পরিধিতে ইংরেজকে তিনি দেখেছেন—শাসক, বণিক বা অত্যাচারী বিদেশী হিসেবে নয়।

> ...ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা, সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান। (পূর্ব ও পশ্চিম)

ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচ্ছিন্নতার বীজ নানাভাবে উপ্ত হয়েছে—সংহতি, ধর্ম বার বার সেই বিচ্ছিন্নতার কালো পর্দায় আবৃত থেকেছে বহুবার। বারবার সেই বিচ্ছিন্নতার পর্দা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুদ্ধ হয়েছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যুদ্ধ প্রতিহিংসার, আত্মরক্ষার তাদিগে। বিচ্ছিন্ন মানসিকতার উত্তরণ তখন ও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই পর্বে শিবাজীকে, তাঁর ভাবনাকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্টা হয়ে দেশবাসীকে শিবাজীর মূল চেতনাকে অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন। শিবাজীরও পরিকল্পনা এবং প্রেরণার শক্তি তেমনভাবে ফলদায়ক হয়নি। দেশের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে শিবাজীর মনন-শক্তির আকাঙ্ক্ষার মিলন হয়নি—তার ফলে শিবাজীও জাতীয় বিদ্বেষকে অতিক্রম করার শক্তিকে সার্থকভাবে কার্যকর করতে পারেন নি। বিচ্ছিন্নতার শক্তি বার বার জাতিসত্তার নাট্যমঞ্চে শোরগোল করেছে। বিচ্ছিন্নতার অদৃশ্য শক্তি বাঙালির তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের প্রতিটি অধ্যায়কে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধে বলেছেন,

> ...আমাদের সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আর অন্ত নাই। ধর্মে, কর্মে আহারে-বিহারে, আদানে-প্রদানে সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা। এইজন্য ভাবের বন্যা নামে কিন্তু

> বালুর মধ্যে শুষিয়া যায়। তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে কিন্তু ইতস্ততঃ সামান্য ধোঁয়া জাগাইয়া নিভিয়া যায়—এই জন্য মহৎ-চেষ্টা, বৃহৎ-চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বান লাভ করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশজুড়ে যে আবেগ ও উন্মাদনার ঝড় বইবার কথা ছিল তা তেমনভাবে পরবর্তী বৎসরে দেখা গেল না। উত্তেজনার সূত্র ছিল 'বিদেশী বর্জন' ইংরেজের অপশাসন ও অপভাবনার প্রতিরোধ জোরালো করা। কিন্তু তেমন কোন সর্বজনীন বিধিব্যবস্থার রূপ স্থায়ীভাবে দাগ কাটল না। রবীন্দ্রনাথ বাইরের উত্তেজনার কথা বললেও **ভেতরে সারবত্তাহীন যুক্তিকে স্পষ্টভাবেই সকলের সামনে, বিশেষ করে দেশনায়কদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের নেতৃবৃন্দের মনে রবীন্দ্রনাথের মানসিক-ভাবাদর্শের কোন প্রভাব তখন তেমন করে ভাবায়নি'।** স্বদেশী গ্রহণের আনন্দবোধ রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ-চিত্তে গ্রহণ করেছেন, মান্য করেছেন হৃদয়-প্রাণ বিস্তার করেও কিন্তু অতি-উৎসাহের লাগামহীন আনন্দকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি **বারবার দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে 'আত্মশক্তির' উন্মেষের কথা, স্বনির্ভরতার কথা মনে প্রাণে কার্যকর করার বিধিনির্দেশে দৃঢ় থাকার কথা বলেছিলেন।**

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঃ 'প্রবাসী'র প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর লেখা ৪টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—**'ভারতের স্বরাষ্ট্র'** ; **'স্বদেশী ও বহিষ্কার'** ; **'প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি'** এবং 'ভারতে বৃটিশ **শক্তি'**।

ইংরেজের অনমনীয় অত্যাচার এবং শাসন পরিকাঠামোর প্রতিবাদ গভীরভাবে প্রবন্ধগুলিতে স্থান পেয়েছে। স্বদেশবাসীর উপর অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে লেখক চরম মানসিকতার আশ্রয় নিতে দেশবাসীকে বলেছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবেই ইংরেজের Divide and Rule এর কথায় দেশবাসীকে সেবিষয়ে সচেতন থাকার কথা বলেছেন। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান এই দু'সম্প্রদায়কে নিয়ে ইংরেজ যেভাবে পাশা খেলছেন সেবিষয়ে ধীরেন্দ্র বাবু খুবই স্পষ্টভাবেই সবাইকে জানিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধে কোথাও কোন চিন্তা গোপনে বা ভেতরে রেখে বলেন নি। স্পষ্টভাবে মুসলমান ও হিন্দুদের সম্পর্কে বলেছেন,

> ...আর রক্ত দেখিয়া মুর্ছা গেলে চলিতেছে না। **জননীর, ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্যও তোমাকে অস্ত্র ধরতে শিখিতে হইতেছে। সরকার যখন তোমার রক্ষার ভার লইতে নারাজ তখন তোমাকেই আত্মরক্ষার ভার লইতে হইবে।...**

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে লিখলেন,

> **...আর কেন ভাই, সোজা পথে ঘরে এস, দুই ভাইয়ে মিলিয়া মায়ের দুঃখ দূর করি...**

বাঙালির তথা ভারতবাসীর নিজেদের উন্নয়নের তথা মনুষ্যত্বের জন্যই স্বরাষ্ট্র চাই— তারজন্য আমাদের সংগ্রাম আমাদের অবস্থান। সে অবস্থানের জন্য যদি চরম হয়ে হিংসারও আশ্রয় নেওয়া দরকার হয়, তাহলেও তা আমাদের স্বাধিকারের জন্য একান্তভাবে যোগ্য। স্বদেশী-স্বদেশ-দ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাবেও লেখকের দৃষ্টিভংগির মধ্যে সত্যি কোন কিন্তু নেই। বিদেশী বর্জ্জন করতেই হবে তবেই প্রয়োজনে স্বদেশী গড়ে উঠবে। তারজন্য যদি ইংরেজ প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে তাকেও প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। দেশ আমাদের, আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও নির্ভর অপরিহার্য বিষয়। তার প্রতি কোন শিথিলতা কাম্য নয়। একসময় বলা হত, ভারতের ভেতরে মানুষে মানুষে ব্যবহারিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে নানাভাবে বিশৃংখলার অপ্রতিহত প্রভাবে অশান্তি বিরাজ করছিল— ভারতবাসীকে সেই অশান্তি থেকে মুক্তি দেবার জন্য ইংরেজের প্রয়োজন ছিল, ইংরেজের শাসন দরকার ছিল সে সম্পর্কে ধীরেন্দ্রবাবু লিখলেন,

> ..দেড়শত বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজ এ দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করে, ঐতিহাসিকগণ বলিতেছিলেন, তখন পরস্পরে বিবাদ করিয়া আরো উচ্ছন্ন যাইতেছিলাম, সুতরাং ইংরেজদের পক্ষে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর এই দেড়শত বৎসর পরেও শুনিতেছি, ইংরেজ চলিয়া গেলে, আমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিনাশ পাইব। তবে জিজ্ঞাসা করি এই দেড়শত বৎসর ইংরেজ শাসনের শান্তিতে বাস করিয়া আমাদের লাভ হইল কি? মনুষ্যত্বের দিকে কি এক পদও অগ্রসর হই নাই? তাই যদি হয়, তবে যতদিন এই শান্তি থাকিবে, ততদিনই তো আমাদের মনুষ্যত্ব চাপা পড়িয়া থাকিবে, প্রকৃত শান্তি লাভ হইবে না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ শান্তির বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি?

পৃথ্বীশচন্দ্র রায় : পৃথ্বীশচন্দ্র রায় রাষ্ট্রচিন্তায় গভীর সচেতন অনুসন্ধানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবধারার প্রতিপক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মন ও পথকে দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধন তো করবেই না, বরং দেশের মানুষের অনিষ্ঠ সাধনই করবে বলে পৃথ্বিশবাবুর বক্তব্য 'প্রবাসী'তে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজ-আদর্শের সংহত সংযমের কথা বলেছেন। পৃথ্বীশবাবু এই ধারনাকে গ্রহণ করতে চাননি, কারণ তা কেবল কল্পনামাত্র।

> ...যে সমাজে পনেরো-আনা লোক শূদ্র, এবং শূদ্রকে কোন প্রকার বিদ্যাদান করা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে পরিগণিত হইয়াছে, যে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের লোক এখনো একসঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করাকে ঘোরতর বিপ্লব বলিয়া মনে করে, যে সমাজে জাতিভেদজনিত সংস্কারাদি গ্রামের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া পরস্পরের সৌহার্দ্যের অন্তরায়

হইয়াছে...সেই সমাজে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে মনুষ্যত্ব-চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা ধর্মভাবে রক্ষিত হইত এ কথা রবিবাবুর ন্যায় লোকের লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে দেখিযা লজ্জায় ও দুঃখে মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।...

সামাজিক বিপর্যয় ও অভাববোধকে পৃথ্বীশবাবু বাস্তবদৃষ্টিভংগির পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন কিন্তু তা থেকে অব্যাহতির কোন পথ তাঁর রচনায় ছিল না।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার : বিজয়চন্দ্র মজুমদার মূলতঃ কবি। কিন্তু একটি প্রবন্ধে যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়—তাতে নব্য হিন্দু পরিবারে ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী জীবন-চর্চায় যে পরিণতি হয়েছে তার চিত্র অত্যন্ত আন্তরিক মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে দেশবাসীর চিত্ত ও মননকে উপহার দিয়েছেন। বঙ্গ বিভাগের বেদনা এবং তাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির জন্য ইংরেজ-পুলিশ যে অত্যাচার করেছে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কবি-সত্তায় তীব্র বেদনা ও ক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছিল-যার প্রকাশ কবিতাব মধ্যে আমার দেখতে পাই। 'প্রবাসী'তে **'লাটবিদায়', 'আয়, আজি মরিবি কে!'** ; **'এ জগতে যদি বাঁচাব'** ; **'ঠিক বলেছ'** ; **'মনের কথা'** ; এবং **'অগ্নিমন্ত্র'** প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রত্যেকটি কবিতায় কবি বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে দেশের যুব-সম্প্রদায়কে অত্যাচার অনাচার প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। সেই আহ্বানে মৃত্যুকে ও সামিল করে প্রেরণা দিয়েছেন। সার্থক জন্ম সার্থক মৃত্যুবরণে আর তা মা'র নামে দেশের জন্য শত্রু নিধনে—

> পিশিতে অস্থি শোষিত রুধির,
> নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।
> থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র
> প্রেত ভয়ে, ছি, ছি, ডরিবি কে?
> মরার মতন না লভি মরণ
> সাধকের মত মরিবি কে?
> আয়, আজি আর মরিবি কে?
> অসুর নিধনে কিসের তরাস?
> পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস?
> না গণি বিজন কানন ভীষণ
> বিষম বিপদ বরিবি কে?
> নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
> বীরের মত মরিবি কে?
> আয়, আজি আর মরিবি কে?

বাঙালি জাতির অন্তরে মৃত্যুভয় গভীর। নানাভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তা কবি অনুভব করেই লিখলেন,

. ছি ছি মিথ্যা গরিমা গাহিয়া
নিজে আত্ম-মহিমা কহিয়া
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি?
... মায়ের আশিস্ লভিতে পারিস
শূর সম যদি রাজিবি
মায়ের উপর নির্ভর কর্
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

'অগ্নিমন্ত্র' কবিতায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইংরেজের অত্যাচারে বিপর্যস্ত কবিমন বলছেন,

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি মন্ত্রে কি না?
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়
দড়িতেছে অরি চরণ তলায়
পোড়াতে অরিকে পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না?
.. পাশব আচার নিষ্ঠুরতার
নিশ্চয় আছে সীমা।
কর পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কিনা।
... মরণে আদেশ দিতেছে স্বদেশ
পালিবি কি না?
সৃজি হলাহল শোণিত তরল
ঢালিবি কি না?
জাগে অপমান বিন্ধ্য সমান ;
ঘোচে কি মরণ বিনা
আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

বঙ্গ-বিভাগ প্রতিরোধ আন্দোলন সূত্রে পূর্ববঙ্গে যেভাবে সরকার অত্যাচার করেছে তা অবর্ণনীয়। তখন বড়লাট লর্ড মিন্টো এবং ভারত সচিব ছিলেন লর্ড কুলার। কুলার প্রথম থেকেই লাগামহীন অত্যাচার চালিয়েছেন যা দেশের মানুষ, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা তা মেনে নিতে পারেন নি। কুলারের অত্যাচার অনেক সময় বড়লাট সমর্থন করতে পারেন নি—তাই কুলারকে কখনও কখনও অত্যাচারের পরিধিও মাত্রা সম্পর্কে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কুলার তা গ্রাহ্য বা মান্য না করে পদত্যাগ করেন। সে সম্পর্কে ও 'লাটবিদায়' কবিতার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গল্পকার-উপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্বদেশ

ভাবনায় দেশ ও জাতীর ঘর বাইরের নানা চরিত্র নিয়ে গল্প 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'সর্ব বিষয়ে স্বদেশী' প্রকাশিত প্রবন্ধটি সে সময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

> ...এই যে বন্দেমাতরম—Patriotism—অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতি ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী। পূর্বে আমরা রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্মের জন্য মাথা দিয়াছি—কিন্তু দেশের জন্য প্রাণদান, এ ভাব আমাদের মনে পূর্বে ছিল কি? আমি ত কোথাও দেখিতে পাই না।...দেশ যে মা ইহা আমরা কস্মিনকালেও জানিতাম না। বঙ্কিমবাবুকে মুখপাত্র করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ষ্মীই আমাদিগকে এ মধুর বাণী শুনাইলেন।

প্রভাতকুমার বিশ্বাস করতেন স্বদেশ ভাবনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য সহায়তা অপহির্য। কেবলমাত্র স্বদেশী আচরণ ও অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে জাতীয় শক্তির লাভ হবে না। প্রয়োজনে ইংরেজের আদব-কায়দা, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে হবে। ইংরেজ দেশের অনিবার্যভাবে আমাদের দেশের অন্তর্ভূক্ত। তাকে বাদ দিয়ে কোন কাজ, কোন সংস্কৃতি সম্ভব নয়। প্রভাতকুমার অনুভব করতেন, দেশের উন্নতি ইংরেজের অবদান ছাড়া সম্ভব নয়। তাই সংস্কৃতিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সঙ্গত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের এক জায়গায় "সমগ্র দেশকে মা বলে সম্বোধন করার শিক্ষা আমাদের কাছে নতুন—কথাটির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তথ্য দিয়ে প্রভাতকুমারের ধারণাকে সঠিক নয় বলে জানান।

প্রভাতকুমার 'প্রবাসী'তে ৩টি গল্প—'খালাস' ; 'উকিলের বুদ্ধি' ; 'হাতে হাতে ফল' প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি স্বদেশ-আর্তিতে বিশেষ করে স্বদেশী আন্দেলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

একজন ডেপুটি জীবনের শেষ প্রান্তে স্বদেশ ভাবনায় অনুপ্রাণিত হন। শুধু তাই নয়—স্ত্রী স্বদেশ-ব্রতের অনুরাগিনী—তাঁর কথায় ও আচার আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডেপুটি অবশেষে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন—এই নিয়ে 'খালাস' গল্প।

তৎকালীন লাটসচিব কুলার সাহেবের প্রতি আনুগত্যের ভান জানিয়ে কোন একজন কিভাবে ডেপুটি পদ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন তার কাহিনী আছে 'উকিলের বুদ্ধি' গল্পে।

শেষ গল্পটি খুবই আকর্ষণীয়, তৎকালিন স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনা—সরকার পক্ষ থেকে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য ভদ্র সন্তানদের উপর বাধা সৃষ্টি করার চমৎকার কাহিনী।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'প্রবাসী'র প্রকাশ লগ্ন থেকেই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একসময় তিনি পত্রিকার সহঃ সম্পাদকও ছিলেন। প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প এবং কিছু কিছু কবিতার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা বঙ্গদেশের স্বদেশী আলোড়নের প্রভাব খুবই গভীর এবং বীররসাত্মক উদ্দীপনা সঞ্চারিত করতে সহায়ক ছিল। 'অসির গান' ; 'সুস্বপ্ন' এবং 'মাতৃযজ্ঞ'তে স্বদেশানুরাগ

সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নানাভাবে দেশের মানসিক চেতনা যখন স্তব্ধ হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অলসতায় নিমগ্ন তখন চারুচন্দ্রের কবিতা সেদিক থেকে ঘর থেকে সজোরে বের করে আনল যুব-শক্তিকে :

...এ দুর্দিনে পশেছে কাণে মায়ের স্নেহ-আহ্বান,
জড়ের কি রে হয়েছে আজ চেতনা
আবার কিরে পেয়েছে ফিরে হারানিধির সন্ধান,
ঘুচাবে যাহে দীন মায়ের বেদনা?

চারুচন্দ্রের বিখ্যাত গল্প 'মা' স্বদেশী-আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে। পথ ও নির্দেশ নিয়ে তখন সর্বত্র বিশৃংখলা—ইংরেজকে হটাবার নানা পরিকল্পনা-কোনটাই চূড়ান্তভাবে কার্যকর সীমা টানতে পারছে না। কখনো প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস, কখনো প্রত্যক্ষ বোমা-গুপ্ত হত্যা-নির্মম প্রতিশোধ-এমনি রাজনৈতিক পরিবেশ সমগ্র দেশ জুড়ে। ফলে অনিবার্যভাবে নেমে এসেছে প্রতিরোধের উপায় স্বরূপ কারাদণ্ড-ফাঁসি-নির্বাসন।

দেশের এইরকম পরিস্থিতির অন্দরমহলে আবার ত্যাগ-গভীর আনুগত্য ও মাতৃ প্রসাদের দ্বারা বিধৌত প্রেম-স্নেহ-মাতৃত্ব বোধ-বিশ্ববোধ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মা' গল্পে সর্ব সংস্কার যুক্ত উদার মাধুর্য্যের প্রীতিঝরা আকুতির সঙ্গে গভীর আত্ম-প্রত্যয়ে দৃঢ়চেতা কঠিন। বিধবা 'মা'র একটি পুত্র ষষ্ঠীচরণ। মা-ছেলের সংসারে ছেলের গ্রামের বাল্যবন্ধু মুসলমান জহর। 'মা' দয়াঠাকুরানীর কাছেই জহর-ষষ্ঠী বড় হয়ে উঠেছে-লেখাপড়া করেছে—এম.এ. পাশ করেছে—বৃহত্তর জীবনে যাবার আয়োজন হচ্ছে। ষষ্ঠী বি.এ. পড়বে—কিন্তু জহর দয়াঠাকুানী মা'য়ের গলগ্রহ না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য লোভনীয় চাকুরী 'দারোগা' হয়ে সরকারী কাজে যোগ দিল।

দারোগা হয়ে জহর নবাবগঞ্জে পোস্টিং হয়ে এল। নবাবগঞ্জ তখন স্বদেশী-ওয়ালাদের নিভৃত আড্ডার স্থান। দারগা জহরের মন পাল্টে গেল—স্বদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ তীব্র। তারফলে কারণে অকারণে-নবাবগঞ্জের স্বদেশী-ওয়ালাদের আড্ডায় হানা দিয়ে অত্যাচার করতে শুরু করল।

এদিকে 'মা' দয়াঠাকুরানীর ইচ্ছায় ষষ্ঠীচরণ কলেজে পড়তে পড়তে স্বদেশী-কাজে যুক্ত ছিল।

জহর তা পছন্দ করত না। একদিন কৌশল করে দারোগা জহর রাজশক্তির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য ষষ্ঠীচরণ সহ কিছু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে জেল-হাজতে ভরল। ষষ্ঠীচরণ জহরের উপর রেগে গেল। 'মা' যখন হাজতে পুত্রকে দেখতে এসেছেন ষষ্ঠীচরণ জানাল, এ সব কাজ জহরের দ্বারাই হয়েছে, ওই আমাদের হাজতে পুরেছে।

'মা' ষষ্ঠীর কথায় শান্তভাবে বললেন,

...বাবা, জহর তোর অবোধ ছোটভাই। তার প্রতি তুই রুস্ট হোসনে। সে আমাদের ছেড়েছে বলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি নে। তুই আপন কর্তব্য করেছিস্। ফলের ভার ভগবানের ওপর। যে পবিত্র 'বন্দেমাতরম' নাম গ্রহণ করে তুই সেবাব্রত গ্রহণ করেছিস্ তাতে নির্যাতন-ক্লেশ সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস্, আমি আপনাকে ধন্য মনে করব। আর এক কাজ তোকে করতে হবে, জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্মসমর্থন কতে হবে।

ষষ্ঠীচরণ 'মা'র দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বলল,

...আত্মসমর্পন করতে গেলে জহরকে দোষী করা ছাড়া ত উপায় দেখি না। মা অকম্প কণ্ঠে বললেন, তবে তোর আত্মসমর্থনে কাজ নেই। কিন্তু নিরপরাধ বালকগুলির কি উপায় হবে! অমনি কতকগুলি কণ্ঠ ভাসিয়া উঠিল, মা, আমরা তোমার কুপুত্র নই ; আমরা একটুও ভয় পাইনি। আমরা কেউ কিছু বলব না। আদালত যা খুশি তাই করুক।

'মা' বললেন,

...আশীর্বাদ করি, বাবা সকল, এই হৃদয়বল লাঞ্ছনার দ্বিগুণিত হোক। যে মাকে বন্দনা করে ব্রত-গ্রহণ করেছ, তাঁর মুখ উজ্জ্বল কর।

ষষ্ঠীচরণ সহ পাঁচজন বালকের যথাক্রমে ছ'মাস ও দু'মাস জেল হল। আদালতের রায় হবার পর দারগা জহর থানায় ফিরে এসে দেখে থানার সামনে একটি গরুর গাড়ী।

...গাড়োয়ান বললে, একজন স্ত্রীলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চান। জহর গিয়ে দেখল, মা-দয়াঠাকুরাণী।

জহর দারগা বিস্মিত হল—কাতর হয়ে গেল-মা দয়াঠাকুরানীর পায়ের কাছে মাথা নত করে নিজের কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে জহর দারোগার কাজ ছেড়ে দিল—সেই পালিতা মা-দয়াঠাকুরানীর সঙ্গে মিলনে আনন্দিত হল।

চারুচন্দ্র তৎকালিন বঙ্গদেশের আছড়ে পরা স্বদেশী আন্দোলনের মর্মসত্যকে গল্পের মাধ্যমে দেশের মানসিকতার শক্তি বাড়াবার জন্য সাহিত্যক্ষেতে অবতীর্ন হলেন।

প্রমথনাথ চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের স্বদেশানুভূতির ভাবনাকে কেন্দ্র করে 'প্রবাসী'তে প্রমথনাথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-কবিতা এমন কি গান প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশমূলক প্রবন্ধে-কবিতায় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাঙালিকে কথার চেয়ে কাজ করার, বিশেষ করে দেশবাসীর কল্যাণ-কাজে মন প্রাণ যুক্ত করায় কথা বেশী করে বলেছেন। সেদিক থেকে প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের 'এমন কাজ চাই, কাজ কর' বিষয়ে বলতে গিয়ে 'কাজ বনাম কথা' প্রবন্ধে বলেছেন,

...কাজ ত করিবই, কথা কেন ছাড়িব? তবে যখন সরকার আইন করিয়া

কন্ঠবোধের ব্যবস্থা করিলেন, তখন সেই অধিকারটিকে অব্যাহত রাখিতে যে লড়াই করিয়াছিলাম, তা কি এইরূপে হারাইবে? বহুবাব কথার বাজে খরচ হইয়া দিয়াছে, জানি, মাঝে মাঝে কাজে আসে নাস, এ কথা মানি না। ভাষা বিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন কি পন্ড হইয়াছে? এ ক্ষেত্রে একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গিয়া হঠাৎ একটা কো-অপরাটিভ, স্বদেশী স্টোর খুলিয়া ফেলিলে খাসা হইত বটে, কিন্তু ভাষাকে অক্ষুন্ন রাখা যাইত কি না সন্দেহ।...

প্রমথনাথের একটি প্রকাশিত কবিতা '**প্রেমে পক্ষপাত**' সেসময় স্বদেশানুভূতির বহু সভায় পাঠ-আবৃত্তি করা হত।

তুমি ধন্যা, তুমি গণ্যা, ইহা মিথ্যা কথা,
তুমি দীনা, তুমি হীনা, পর পদানতা ;
তোমার সন্তানগণ লক্ষ্মীছাড়া প্রায়
পরের পাদুকা বহি অন্ন করি খায়।
তব বক্ষে মহামারী দুর্ভিক্ষ ভীষণ
শ্মশান সৃজিয়া নিত্য করিছে চর্বণ
তব লক্ষ সন্তানের শীর্ণ অস্থিগুলি
ও পদ-নিগড়ে ঠেকি হইতেছে ধূলি
সন্তানের জয়-চোটা। হা জননী মোর,
পারিছ না কিছু দিতে, তাই কোল তোর
যাব আজ ত্যাগ করে? পরের মা মোরে
কি দিবে সান্ত্বনা? কিছু নাই! তাই তোরে
আরো বেশী চাই পেতে ; হাসিতে হাসিতে
প্রাণ দিতে পারি তোর অরাত্রি নাশিতে!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ-বিদেশী বর্জন ইংরেজের সঙ্গে-কোন সহযোগিতা নয়-শাসক ইংরেজের অত্যাচার প্রতিরোধ-জেল-জরিমানা সহ সব রকম শাস্তিতে দেশবাসীকে বিশেষভাবে যুব-শক্তিকে 'মৃত্যু ভয়' থেকে সমস্ত অনিবার্য পরিণতিকে বরণ করার যে প্রয়াস নানাভাবে দেশের কাছে দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের লেখা 'বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা'; 'সমসাময়িক ভারত' ; 'ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। মননশীল গভীর ভাবনার মত ও আদর্শের সুনিপুণ গাঁথুনীতে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে নিবিষ্ট করেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাগুলি। রবীন্দ্রনাথের ভাব সত্যের সঙ্গে তাল রেখে জাতিরসত্তাকে পরিণত করার প্রবল আকাঙ্খার পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা' প্রবন্ধে এক জায়গায় দ্বিধাহীন ভাবে বলেছেন,

> ...আজকার ভারতবর্ষে মুসলমান-সমস্যাই একটি প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনো হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, মুসলমানেরা দেখিতেছে যে হিন্দুরা অন্যপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে-বাজারে-সরকারী চাকরিতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।... এই বিপদ নিবারণের একটিমাত্র উপায়—মুসলমানদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা।...

দেশের সর্বত্র ইংবেজের অত্যাচার-বিনা বিচারে জেল-নির্বাসন-বেত মারা সহ বিচিত্র শাস্তির নিদারুণ ঘটনার মধ্যে বিভ্রান্ত, ক্লান্ত অসহায় দেশবাসী কিভাবে, কেমন করে স্বদেশ-উন্নতির জন্য কাজ করবে! এই বিষয়টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিন্তার দর্শনকে বেশ নাড়া দিয়েছিল—। তিনি লিখলেন,

> ...আমরা এ পর্যন্ত আইন মানিয়া চলিতেছি ; ভবিষ্যতেও বিবেক-বিরুদ্ধ আর ধর্ম-বিরুদ্ধ না হইলে আইন মানিব। কোনকালেই পরের অনিষ্ট চেষ্টারূপ অধর্ম করিব না। কিন্তু কোনও কারণে দেশের মঙ্গলসাধনেও বিরত থাকিব না।

অত্যাচার-জেল-জরিয়ানার সীমা অতিক্রম করলে দেশবাসীকে কোনভাবেই আর মানানো যাবে না-অধর্ম কাজ তাকে করতেই হবে স্বদেশের, স্বদেশের জন্য দেশবাসীর কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন তখনই আমরা মান্য করব-যতদূর পর্যন্ত আইন মানায় ধর্ম-বিরুদ্ধ, দেশ বিরুদ্ধ না হয়। কিন্তু যে আইন মান্য করতে গিয়ে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, দেশ-ধর্মের অন্তরায় হয়, তাকে কোন ভাবেই সায় নয়-বরং তা জাতীয় জীবনের সর্বস্তর থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আইনের বিরুদ্ধচারণ অবশ্যই অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এই সবল-সতেজ যুক্তি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উপর যুব-শক্তির চেতনা-বোধকে লালন করার কথা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হত।

১৯০৫ বঙ্গব্যবচ্ছেদ হল—তাকে কেন্দ্র করে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে নানাভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ; সভা-মিছিল ; অত্যাচারের পাল্টা ব্যবস্থা সহ জাতীয় জীবনে জাতীকে স্বাবলম্বন তথা সামগ্রিকভবে জাতীকে আত্ম-মর্যাদা ও আত্ম-উদ্‌বোধনের বিচিত্র কথা বহু মনীষীর চিন্তাকে আলোড়িত করেছে—সাহিত্যে, গানে, কথকতায়, নানা সেবাকর্মের মধ্যদিয়ে জাতীয়স্তরে নানা বিষয়কে অবলম্বন করে দেশবাসীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদি কাজ করতে করতে এল ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণা অনুসারে (১১ই ডিসেম্বর ১৯১১)—সাড়ে ছ' বৎসর পর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ উঠে আবার বঙ্গযুক্ত হল।

দেশ-বাসী কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল—স্মিত-সুখানুভব হৃদয়কে পুলকিত করল। কিন্তু তাতেও কিছু প্রশ্ন থেকে গেল যা সমাধান হয়নি। একদিন যুক্ত বাঙালিকে দ্বিযুক্ত

করার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য রাখি-বন্ধনে হলুদ সুতার বন্ধনে পরম করুণাময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল

.. "বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।।

আশা করে বলা হয়েছিল

.. বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হোক, এক হোক হে ভগবান ...

সেই ৩০শে আশ্বিন একটা চিরকালের জাতীয় ঐক্যবোধের আকুতিতে উৎসারিত সত্যকে জানবার, জানাবার সুতীব্র মিলন আকাঙ্খার আয়োজন ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে হতে ১৯১১ সালে তা একেবারেই জাতীয় জীবনের কর্মকান্ডের কোলাহলের মধ্যে পর্দার আড়ালে চলে গেল। এই অকস্মাৎ অভাবনীয় ভুলে যাওয়ার আদর্শ-ভ্রষ্টতা বাঙালিকে যেন আত্ম-শক্তির অবিশ্বাসের অন্ধকারে পুনরায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিও সেইভাবে কেমন যেন একটা অবহেলায় মৃত-প্রায় অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে হারিয়ে যেতে বসল। সেই তেজ নেই, বেত মেরে মরে 'বন্দেমাতরম' ভোলাবার বৃথা প্রয়াসের মাধুর্যভরা প্রাণের স্পন্দন নেই। এই বিস্মৃতি হঠাৎ যেন বাঙালির মননকে আচ্ছন্ন করল—ঠিক সেই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'প্রবাসী'তে লিখলেন।

রাখী! তোরে রাঙিয়েছিলাম
প্রাণের রাঙা রঙ দিয়ে!
(ওরে), বানিয়েছিলাম অখন্ড ডোর
(গহন,) আঁধার-রাতি বঞ্চিয়ে!
ভাঙ্গা আমার চরকাটিরে
জুড়ে তুলেছিলাম ফিরে,—
বন্ধ করে আঁখির ধারা
(ও সেই) অভয় শরণ নাম নিয়ে।
রাঙা ব্যথা! ভয়ে ভয়ে—
বেঁধেছিলাম তয়ে তয়ে।
(তাই) উঠ্‌ল পুরে-জুড়ল দু'মুখ
(এ মোর) প্রাণের পুঁজি সঞ্চিয়ে।
ফুরিয়েছে কাজ এখন তোমার—
বিসর্জনের নেই দেরি আর,
(তবু) আমন্ত্রণের বরণডালাই
(সাজাই) মনের ভুলে'-মন দিয়ে!

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : 'প্রবাসী'র জন্মদাতা, রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচ্ছন্ন চিন্তায় দেশ ও জাতীকে আত্ম-উৎসাহের বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করার সংকল্পে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যপত্রের শিরোনামে এমন অনেক প্রবন্ধ-কবিতা-গল্প তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন যা সেকালের দুঃসাহসিক অধ্যায়। তিনি নিজে ও **'প্রবাসী'র সাময়িক বিভাগে দেশের সাম্প্রতিক ঘটনার চুম্বকে পরিবেশনায় যে সোনার কাঠির পরশ দিয়েছেন পরবর্তী সময়ে অনেকেই তা অনুসরণ করেছেন**। একটি মাত্র মূল সত্য-জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নানা ফলনে জাতিকে আত্ম-শক্তির বিশ্বাসে বলিয়ান করে তোলা, এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ব-অধিনতায় স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল করা। রামানন্দবাবু তাই নিজেও 'প্রবাসী'তে **'আগামী কংগ্রেস' ; হাতের তাঁত ও কলের তাঁত এবং 'ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য'** তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে মূল্যবান তথ্য যা আছে তা পরবর্তী সময়ে অনেক বিষয়ে আমাদের জাতীয় জীবনযাত্রার মূল্যায়নে শক্তি দিয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে পরাধীন জাতীর প্রতি ইংরেজের ব্যবহার-আচার-শাসন কিভাবে হচ্ছে তা প্রকাশ্যে জন-সাধারণে সামনে তুলে ধরেছেন।

রাজনৈতিক তিনটি প্রবন্ধ ছাড়াও সমসাময়িক বাঙলার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিধৃত মানসিকতাকে একেবারে ভুলে থাকতে পারেন নি রামানন্দবাবু। তিনি **'স্বদেশী-প্রচেষ্টা' ; 'বঙ্গ-বিভাগ' ; 'ছাত্রজীবন ও সার্বজনিক কাজ' ; 'স্ব ও দেশ' ; 'ইরেজ শাসন কি বিধাতার বিধান'; 'স্বদেশী প্রসঙ্গ' এবং 'স্বরাজ ছাড়া আর কি চাই'** বিশেষ ভাবে যুব-শক্তিকে ইন্ধন দিয়েছিল, স্বাধীন চিন্তার রসদ জুগিয়ে দেশের কাজে এগিয়ে যেতে সাহস ও শক্তি দিয়েছিল।

॥ সাত ॥

ভাণ্ডার :

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ-সংকল্পের রাজনৈতিক কর্মধারা-চিন্তাসহ যে ব্যাপক আয়োজন ও আলোড়ন বঙ্গদেশের সর্বত্র ছড়িয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে দেশবাসীর অন্তর-সত্তার আশা-আকাঙ্খা, স্ব-অধিকার স্থাপনের প্রস্তুতির নানাদিক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কিত প্রবন্ধ-কবিতা-গল্প উপন্যাস পাঠ করে নব-যৌবনের যে জোয়ারের বেগ সর্বত্র জেগেছিল 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি তার মধ্যে অন্যতম। শুধু অন্যতম নয়-সুনির্দিষ্ট পথকে অনুসরণ করার না করার কি ফল হতে পারে তার সার্বিক পরিচয় এই 'ভাণ্ডার'এ প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে বহুল পরিমানে স্থান পেয়েছে। **সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**। ১৩১২ বৈশাখে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। **প্রকাশক কেদারনাথ দাসগুপ্ত**। **সময়টা বঙ্গদেশের জাতীয়তাবোধের তপ্ত ভূমি**। বদ্ধ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা সুখ-নিদ্রায় বঙ্গচ্ছেদের তর্জনী এবং তাকে কেন্দ্র করে নেতৃবৃন্দের নানা ধরণের প্রস্তুতি ও নির্দেশ দেশ-জুড়ে জাগরণের তপ্তশলকার আঘাতজনিত উন্মাদনার অন্তর-স্থল যেন ভীমরবে সব তছনছ

করে মত্ত হয়ে ছুটে যেতে চাইছে-যেন তেন প্রকারের রাস্তা বয়ে। তাতে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র সমস্যা, বিচিত্র প্রশ্ন, বিচিত্র প্রত্যাশার জটিল আবর্তে আপন আপন ভাবনার মাশুলে কখনও সমাধান হচ্ছে, আবার তা থেকে নূতন সমস্যায় লন্ডভন্ড হয়ে হতাশার সৃষ্টি করছে। সেই সমস্যাগুলির পুনর্বাসন হলেও মাঝে মাঝে চিন্তার বৈষম্য দেশ জুড়ে সাদাপথে বিভ্রান্তি জাগিয়ে তোলে—তারই পরিচয়সহ সমস্যার সহজসাধ্য সমাধানে দেশের চিন্তাশীল মরমী ব্যক্তিত্বের ধারণা ও মত 'ভান্ডার' এ প্রকাশিত হয়ে জটিল গোলকধাঁধাঁ থেকে মুক্তি দিত। জাতীয়তাবোধের স্লোগানে দেশের অন্তর-প্রবাহী কর্মধারার মধ্য থেকে নানা প্রশ্নের সমাধান এই 'ভান্ডার' পত্রিকায় বেশী করে প্রকাশিত হত। একদিকে যেমন 'সাহিত্য' অপর দিকে, বিশেষভাবেই তৎকালীন দেশীয় রাজনৈতিক মানসিকতার বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হত।

'ভাণ্ডার' এর আকর্ষণীয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশ করা হত, তার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের।

'ভাণ্ডার'এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি তৎকালিন রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নেতৃবৃন্দের মানসিকতাকে কেন্দ্র করে দেশের সঠিক কল্যাণপথকে সামনে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা। 'প্রাইমারী শিক্ষা', 'বিজ্ঞান সভা', 'ইতিহাস কথা', 'স্বাধীন শিল্প', 'বহুরাজকতা; 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ'; 'শোক-চিহ্ন', 'পাটিশনের শিক্ষা', 'করতালি', 'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা', 'বিলাসের ফাঁস', 'রাজভক্তি', 'স্বদেশী আন্দোলনের নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন', 'দেশনায়ক', 'স্বদেশী আন্দোলন, 'শিক্ষা সমস্যা', 'শিক্ষা সংস্কার', ও 'জাতীয় বিদ্যালয়।

রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব এবং বিষয়বস্তুর অনুভাবাত্মক চিন্তার প্রসার ও কর্মউদ্যোগে প্রভাব বিস্তারের পথ নির্দেশ এমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে অনেক দেশনায়ক, চিন্তাশীলদের আপন আপন চিন্তা ও পথকে প্রভাবিত করতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। যদিও অনেকদিন থেকে রবীন্দ্রনাথকে সহজভাবে অনুসরণ করার বাস্তব-পটভূমিকারও অভাব ছিল।

একদিকে 'ভাণ্ডার'-এ প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অপর দিকে 'গান' রচনা—যা রাজনৈতিক মানসিকতায় দেশ ও দেশবাসীর হৃদয়-মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত তথা গতি দান করতে সাহায্য করেছিল প্রবন্ধের চেয়ে অধিক মাত্রায় সর্বক্ষেত্রে সর্বজনে। প্রকাশিত গানগুলি—

...'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে আপনি'...

...'মা কি তুই পরের দ্বারে' পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?'

...তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

...ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি...

...যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা...

...যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু...

...ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,...
...যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না...
...আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
...জোনাকি, কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ'...
...'ওরে ভাই মিথ্যা ভাবনা...

স্বদেশ ভাবনাকে তরান্বিত করতে বিচিত্র লয়ে 'ভাণ্ডার'-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সোনার কাটির জাদু-শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি গানের ভাবা গভীরভাবে দেশের মানুষকে স্পর্শ করে একটা অদৃশ্য বেগের সঞ্চারে দেশ ও মাতৃভূমির জন্য প্রেরণায় উদ্‌ভাসিত হয়েছিল অতি অল্প সময়ে ও আয়াসে যা প্রকাশিত প্রবন্ধের দ্বারা ততটা সম্ভব হয়নি।

প্রকাশিত গানে জাতির মানসিকতাকে গভীরভাবে দেশ ও মানুষের প্রকৃত অবস্থায় যুক্ত করে এগিয়ে যাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। মোহগ্রস্ততার জাল ছিন্ন করে অলস-নিদ্রার পাশমুক্ত করার জন্য লুকিয়ে থাকা আত্ম-শক্তির বাণীধ্বনিত হয়েছে গানগুলির মধ্যে। সেখানে কোন ব্যক্তিনির্ভর প্রেরণায় নয়—সামগ্রিক মনুষ্যত্বের প্রকৃত ভাবনাকে প্রকাশ্যে আনার এবং ব্যবহারিক জীবনে তার ছন্দময় সুরে আন্দোলিত, আলোড়িত করার কাজে খুবই উদ্দীপনা জাগিয়েছিল গানগুলি। 'প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহারিক জীবনচর্চায় বুদ্ধিকে বোধের অনুসন্ধানে জাতির মানসিককতাকে তর্কজালে সময় ক্ষেপ না করে এগিয়ে যাবার জন্য চিন্তাকে শান দিয়েছেন।

'বহুরাজকতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের ভাবনায় স্পষ্ট করে বলেছেন,

...বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানতেন সমস্ত ভারতবর্ষই তাঁরই, এখন ইংরেজ জানে তাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবার মাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের যা কিছু সবটাই ইংরেজের নিজস্ব অধিকার—এই মানসিকতার মূলে আঘাত করা এখুনি প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মানুষের নিত্য নিত্য প্রয়োজনে ভারতবাসীরাই যা করবে তার হিসাব তার নিজের কাছেই। তার জন্য ইংরেজের কাছে জবাবদিহি করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ইংরেজের একটি বড় ভয় দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। তাঁদের সবদিক থেকে অচল করার, অগ্রে থাবা দেবর সুনিপুণ পরিকল্পনার বিশেষত্বই ইংরেজের আধুনিকতায় নরকতা। বিশেষ করে উত্তেজিত এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের চাবি যাদের হাতে, সেই মধ্যবিত্তকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করার ফন্দী ইংরেজ দীর্ঘদিন থেকেই পরিকল্পনা করে এসেছে। এগোপন ফন্দীর অনুমান রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন থেকেই অনুভব করেছিলেন—শুধু উত্তেজনার আলোড়ন সৃষ্টি করে দেশ ও দশের অধিকার স্থাপন করা সম্ভব নয়। শাসকের আসল শক্তির

রূপটা জানা দরকার। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ নিঃসংকোচে কংগ্রেসের ভাবনা ও নীতিকে পরিমার্জন করা প্রয়োজন বলে অনুভব করেছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনের রাজাকে বড় বেশী তোষামোদ করার অসঙ্গত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ মোটেই সমর্থন করেন নি।

বঙ্গদেশের মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক যখন বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে ঠিক সেইসময় ইংরেজ তা ভেবে চিন্তা করতে সময়ক্ষেপ করেছে। বঙ্গচ্ছেদের প্রাথমিক চেষ্টা বাঙালির অন্তর-প্রবাহে যে রক্ত সঞ্চালিত তাকে বিচ্ছিন্ন করা—প্রবাহ-নাড়ীকে কেটে দেওয়া। কিন্তু বঙ্গচ্ছেদের প্রচণ্ড আঘাত বাঙালি সহ্য করেছে—নুয়ে-ধূমরে তলিয়ে যায় নি। মাথা উঁচু করে সকল দুঃখ-বেদনার অত্যাচারে তাকে বিচলিত করতে পারেনি। চরম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার আপন শক্তিকে জাগ্রত করেছে—প্রাণশক্তির উচ্ছল প্রকাশে আন্দোলনকে সর্ব হৃদয় জুড়ে অনুভব করে চরম সফলতা লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির এই প্রাণশক্তির বাঁধন-হারা প্রবাহের মধ্যে অন্তর-আত্মার প্রেমশক্তিকে অনুভব করেছিলেন।

সেই সময় বঙ্গচ্ছেদের চিন্তাকে কিছু মানুষ 'শোক চিহ্ন' বহন করে প্রতিবাদের প্রচার চালিযেছিলেন। কিছু পত্র পত্রিকার প্রথম-পাতায় এক ধারে কালো কালির গাঢ় দাগ লেপে দিয়ে বাঙালির 'শোক' এই বার্তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এতটা হতাশা মোটেই পছন্দ করতে পারলেন না। তিনি 'শোকচিহ্ন' প্রবন্ধের শিরোনামে লিখলেন,

> ...বঙ্গবিভাগে লইয়া আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ অঙ্গপ্রান্তে মসীপ্রলেপের দ্বারা শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি। এ বিড়ম্বনা কিসের জন্য? আমরা যে শোক অনুভব করিতেছি এ কথা এখন বিজাতীরূপে চোখে আঙুল দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে কাহার কাছে?...

বঙ্গচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশজুড়ে বেদনা হয়েছে—হতাশা এসেছে এটা খুবই সত্য ও স্বাভাবিক সত্য। কিন্তু এই বিচ্ছেদের বেদনায় একে অপরে মিলনের আকুতি যে জেগেছে তাকে অস্বীকার করা উচিত হবে না। বেদনার কাতরতায় বিবশ না হয়ে মিলনের যে শক্তি অন্তর-বাহিরে গভীরভাবে ঘরে-বাইরে জেগেছে তা তো অসফল নয়। দীর্ঘদিন জাতীয় ঐক্যবোধের কথা বলে আমরা বাঙালির চিত্তলোকে যে সত্যবন্ধন জাগাতে পারিনি—বঙ্গচ্ছেদের প্রচণ্ডতম আঘাত আমাদের এক হতে, দেশজুড়ে এক চিন্তায় অনুরণিত হতে সাহায্য করেছে। 'পার্টিশনের শিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন,

> ...এবারকার আন্দোলনের একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, লাভ লোকসানের কথা সকলে স্থির হইয়া ভাবিতেছে না। বঙ্গবিভাগে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা অনেকেই জানে না, কিন্তু একপ্রকার গভীরভাবে

অন্ধভাবে আমরা সকলে মিলিয়া বেদনাবোধ করিতেছি। এই বেদনাটা তর্ক-বির্তকের বিষয় নয় বলিয়াই—ইহা অনুভবের বিষয় বলিয়াই দেশের স্ত্রীপুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই ইহা অধিকার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন,

...আমাদের এবারকার আন্দোলনে আমরা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশি জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাকে ইংরেজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে কিনা জানি না, কিন্তু এই ব্যাপারে দেশ যে আমার—এই কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এক যুগ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেও এমন ঘটিতে পারিত না।

বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ আন্দোলনে সারা বঙ্গদেশের উত্তাল প্রতিবাদ যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেই দিকে কংগ্রেস তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করল না। কংগ্রেসের এই 'অনীহার প্রতিবাদ করেছিলেন ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশন মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে লখনউ প্রবাসী বাঙালি কবি অতুলপ্রসাদ সেন।

বারাণসী কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারতে ভ্রমণ করার ঘটনায় উল্লাস প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়টি ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙালির মনন ও চিন্তায় একটা অভিমানের বেদনা গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কংগ্রেস ভেবেছিল—প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ ভারতবাসী কুটুম্বের আদরে গ্রহণ করেছে—তার ফলে প্রিন্স নিজের অভিজ্ঞতায় ভারতবাসীর মানসিক অবস্থা অনুভব করেছেন যার সুদূর প্রসারি পরিণতিতে ভারতবাসীর কল্যাণ ও সু-নিয়ম সাধিত হবে।

কিন্তু বঙ্গদেশে যুবরাজের আগমনের সূত্রে আনন্দের আয়োজন তেমনভাবে হয়নি—বঙ্গদেশের যুব-শক্তির প্রতিবাদ আন্দোলনের ছোঁয়া যাতে কোনভাবেই যুবরাজের কাছে না পৌঁছয় তার জন্য ইংরেজের অভাবনীয় ব্যবস্থা ছিল।

যুবরাজ চার্লস ভারতত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গে ফুলারের অত্যাচার নতুনরূপে দেখা দিল। তিনি মুসলমানদের সমর্থন নিয়ে, তাদের হাত করে হিন্দু বাঙালিদের উপর নির্যাতন করতে লাগলেন।

'ভাণ্ডার' এ এই বিষয়টি অত্যন্ত নন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ফুলারের অত্যাচারের ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি মর্মাহত বেদনায় আপন মতামত প্রকাশ করে লিখলেন,

...বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া

তুলিয়াছে।...রাজচক্রে যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপেই ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে।

...যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগতসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সার্থক, রাজরোষবক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দেমাতরম।

রবীন্দ্রনাথ কবি। চোখ-কান-মননকে স্তব্ধ রেখে কাব্যরচনা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। সমসাময়িক ঘটনা, তার আহ্বান কবিকে আন্দোলিত করেছিল ব্যাপকভাবে। কিন্তু তিনি কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সান্নিধ্যের মুখাপেক্ষি হন নি। সক্রিয় রাজনীতি করার অভিপ্রায়ও ক্যেনদিন তাঁব জাগেনি। কিন্তু মানুষের সত্য পরিচয়ের উদ্‌বোধনে যেখানে যত বাধা তা থেকে মানুষকে দেশবাসীকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। ইংরেজের অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের বেদনা দেশবাসী একত্রিত হয়ে যে প্রতিরোধের যে সংকল্প গ্রহণ করেছে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু জাতিয় নেতৃত্বের ভেতর থেকে ও মাঝেমধ্যে যখন 'কলহ' হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তা থেকে সরে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শক্তির উন্মেষে বিদেশী বর্জনের যে আহ্বান জানিয়েছেন তার প্রতি তিনি গভীর বেদনাসিক্ত অন্তরের আকুতিতে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন,

...আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে—যাহা কলহমাত্র।...আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালির মুখে "বয়কট" শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি।

বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, উহা দুর্বলের কলহ। ...দেশী কাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ কথা বললেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিক্যাল্ আখড়ায় টানিয়া আনিতে হয়।

...নিজের দুর্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছাপূর্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই।

রবীন্দ্রনাথের এধরনের আলোচনায় দেশের মানুষ অনেকেই, যারা পোলিটিক্যাল তারা গ্রহণ করতে পারেন নি—বরং দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর-সত্তার সুগভীর তল থেকে জাতীয় জীবনে 'বয়কট' বা স্বদেশী আন্দোলনের

অস্তিত্বকে পুরোপুরি অনুভব করতে চেয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন ব্যক্তির ভাব মত্ততায় তার কতটুকু জাতীকে প্রভাবিত করেছে। তাই ডন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রেখে বলেছেন।

> ...আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনে কতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য গর্ব অনুভব করিয়া থাকি.. এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যত বড় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা এ কাজে যোগ দিয়াছিলাম, এত বড় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইলে ও অন্য দেশের জনসম্প্রদায় যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিত, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারি নাই।

স্বদেশ ভাবনার দ্বারা ঘুমিয়ে থাকা জাতিকে জাগ্রত করে ঘর থেকে বাইরে আনা সম্ভব করে অসাধ্য সাধন হয়েছে। এ কথা সত্য। কিন্তু তা যতটা ভাবের দিক থেকে মত্ততার বেগ ছিল পরবর্তী সময়ে এর সার্থক রূপায়ণ জাতীয় জীবনে ও দেশে তার অবশিষ্ট রইল না। শুধুমাত্র 'বর্জন' এর জন্য বললে হবে না—কিন্তু তার অনিবার্য কিছু 'গড়া', কিছু একটা বাস্তবরূপের জন্য আমাদের মানসিকতাকে তেমন করে সজাগ করতে পারি নি।

> ...স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের মন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কলের অভাবে কাজ করিতে পারিতেছি না। দেশে যদি আজ বিচিত্র রকমের organisation বর্তমান থাকিত—যেমন পঞ্চায়েত, গ্রাম্য-সম্মিলন এবং এই ভাবের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান—তাহা হইলে এত বড় সুযোগের সম্পূর্ণ ফল আমরা পাইতাম।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাঙালির মানস-সত্তায় নানাদিক থেকে স্ব-চিন্তায় ও অনুভবে নানা ধরনের শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠার বেগ এসেছিল সত্য—তার সঙ্গে সঙ্গে জাতির শিক্ষাব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তনে আপন-সত্তার উদ্‌বোধনের প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চলতি শিক্ষাব্যবস্থা এবং শাসক ইংরেজের চিন্তা ও মতাদর্শে পুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা—এ দুয়ের কোনটাকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি—তিনি পুরোপুরি ভারতবর্ষের সনাতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ আদর্শের মোড়কে জাতীয় শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে বার বার দেশবাসী-দেশনেতৃদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন। এই 'শিক্ষা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় বেশ কটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তৎকালিন পরিচালকদের কাছে জাতি গঠন, আত্মার আলো বহনকারী ভারত-আদর্শের শিক্ষাকে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করার আবেদনও করেছিলেন।

> ...দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ-মা-ভাই-বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের

> শিক্ষার সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময় বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র হইয়া থাকে। তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

আমাদের বিদ্যালয়ে যে শিশুরা শিক্ষালাভ করছে তাতে শিশুদেব স্বাভাবিক সহজ সবল জীবন-পথ স্তব্ধ হয়ে আসে শৈশব থেকেই। বড় বড উপদেশের কঠিন তর্জনীঘেরা পরিবেশে শিশুদের মন হোঁচট খায় অনবরত। সেখানে শিক্ষার মূল কথা—আত্ম-উন্নয়ন, আত্মপ্রকাশ বারবার ব্যহত হয়।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্‌বোধন দিনে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার টাউন হলে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে যে সভার আয়োজন (১৩১৩ বঙ্গাব্দ ৩০শে শ্রাবণ) করা হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ 'জাতিয় বিদ্যালয় প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ/চন্দ্রনাথ বসু এঁদের প্রবন্ধ ও 'ভাণ্ডার'ও প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাসের স্বদেশানুভূতির মূল ভাবনাই ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশ ও দেশবাসীকে আত্ম-শক্তিতে প্রেরণা দেবার ব্যবস্থা করা। তিনি মনে করতেন দেশের দারিদ্র দেশের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। তাই স্বদেশী আন্দোলনের পথেই দেশেব দারিদ্র দূর করতে হবে। 'বয়কট' ও 'স্বদেশানুগত্য' একই আদর্শের প্রকাশ। তাই চিত্তরঞ্জনদাস এই দুয়ের আন্দোলনকে বাঙালির আত্ম-নির্ভরতার প্রথম ধাপ বলে অনুভব করেছিলেন।

চন্দ্রনাথবসুর 'ভাণ্ডার' ও প্রকাশিত প্রবন্ধ 'উপর নীচের মিলন'। উপরতলার চিন্তাবিদ্‌দের মাটির কাছাকাছি জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। যার ফলে নব-আন্দোলনের প্রাণসত্তায় দেশ ও জাতির সর্বদিক থেকে আত্মনির্ভরতা কেন্দ্রিক মঙ্গল সাধিত হবে।

॥ আট ॥

অত্যাচারের প্রতিধ্বনি জাগরণ

নবশক্তি

ইংরেজ শাসকের একটি বিশেষ কাজ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কার্যকর হয়েছিল—দেশের মধ্যে স্বদেশ-ভাবনার পত্রিকাগুলির উপর দলন, অত্যাচার আর পীড়ন। এ কাজে আইনের আওতার বাইরে খেয়ালখুশি মত কেবল কাজ করে যাওয়া—প্রতিরোধ করার ছলা-কৌশলের বেড়াজালে স্তব্ধ করে দেওয়া।

মামলা-জরিমামা-জেল ইত্যাদির পথে চলতে চলতে 'যুগান্তর'-'সন্ধ্যা'-'বন্দেমাতরম' ক্ষত বিক্ষত-প্রেস-প্রেসের মালিকের উপর অত্যাচার মুদ্রাকরকে শাসন-নিপীড়ন জেল সব কিছুর একটি মাত্র উদ্দেশ্য—প্রতিবাদ থামাতে হবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে। যতই আঘাত এসেছে প্রাণের তেজ স্বদেশনুভূতির দিকে ধাবিত হয়ে নতুন নতুন নামে পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা এবং উত্তেজনা বেড়ে গেছে অনবরত।

'যুগান্তর'-'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং সংবাদ বঙ্গদেশ জুড়ে প্রবলভাবে আত্মিক-সান্নিধ্যে প্রাণবন্ত—ঠিক সেইসময় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় হঠাৎ ধূমকেতুর মত প্রকাশিত হয়ে এল 'নবশক্তি'। সময়টা ১৯০৬ সাল। 'নবশক্তি'তে এলেন 'যুগান্তর'এর দেবব্রত বসু, এলেন অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। 'নবশক্তি'তে প্রকাশিত প্রতিটি লাইন যেন বোমা আগুনের তাপে ফুটন্ত। পুলিশের স্বাভাবিক তল্লাসি সহ নানা ধরনের 'হয়রানি'র ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল—হল মামলা সম্পাদকের বিরুদ্ধে।

'সোনার বাংলা' :

উত্তেজনার বারুদ ছুঁড়ে দিত 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত ছোট ছোট প্রবন্ধে-নির্দেশ দিত—'মারের বদলে মার' আর কোন দ্বিধা নয়।

পত্রিকাটিতে মুদ্রকের নাম ও প্রেসের নাম দেওয়া না থাকায় পুলিশ বিব্রত হলেও সাজা দিতে এতটুকু বিলম্ব করেনি।

'বরিশাল হিতৈষী' :

সাধারণ পত্রিকা—কিন্তু পুলিশের মতে ভয়ানক, যুব-উত্তেজনা তীব্র। মামলা হল রায়গঞ্জ দায়রা আদালতে—স্বত্তাধিকারী দুর্গামোহন সেন এবং প্রকাশক-মুদ্রক আশুতোষ বাগচী—তাঁদের সাজা হল সশ্রম কারাবাস।

'রংপুর বার্তাবহ' :

উত্তরবঙ্গের নিরীহ মানুষের মনকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছে—পত্রিকার সর্বেসর্বা জয়চন্দ্র সরকার। তিনি অত্যন্ত বাস্তব-অত্যাচারের ঘটনায় দেশবাসীকে তার প্রতিরোধ প্রতিকার করার ইন্ধন দিতেন—এই অভিযোগ। জয়চন্দ্রের সাজা হল কঠোর কারাবাস।

বরিশালের যজ্ঞেশ্বর দে—মুকুন্দলাল দাস (মুকুন্দদাস নামে স্বদেশী আন্দোলনে পরিচিতি)। 'মাতৃপূজারগান' 'দেশের গান' প্রভৃতি প্রকাশনা ও গানের মাধ্যমে প্রচারে সাজা হল—

সৈয়দ ইসমাইল সিরাজী লিখলেন 'অনল প্রভা' গ্রন্থ। পুলিশের রোষানলে সিরাজীর কারাবাস হয়েছিল।

বরিশালের রাজনৈতিক কনফারেন্সের পর সর্বত্র একটা পদ্ধতি চালু হয়েছিল 'মারের বদলে মার'। এই ভাবনায় তখন পত্র পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধ-কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। উত্তেজনা জাগিয়ে যুব-শক্তির অন্তর-শক্তিতে স্বদেশ-সম্মান ও স্বদেশ আকুতির উৎসারণ মূল সত্য। তার জন্য প্রকাশিত প্রবন্ধ-কবিতা'র পত্রিকাগুলির সম্পাদক-মুদ্রাকর-প্রকাশকগণ নির্বিচারে শাসকপুলিশের হেনস্থা থেকে শুরু করে কারাবাস জনিত মামলায় বিপর্যস্ত হয়েছেন। বারবার কবিতা-প্রবন্ধে বলা হত—

> ...কেবল প্রার্থনা দ্বারা ও অপরের দাক্ষিণ্যে দেশের দুর্দশা দূর হবে না। শক্তির আরাধনাই স্বাধীনতার একমাত্র পথ। অতএব অস্ত্রধারণ কর এবং দেশমাতৃকার ঋণ-পরিশোধে কৃতসঙ্কল্প হও। অনাহারে ধীরে ধীরে যখন মৃত্যু

অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়েছে, তখন রণভূমিতে তরবারি-হস্তে মরণে আর ভয় কেন? এ মৃত্যু স্বর্গে তোমায় অমৃত্ব দান করবে। বিদেশী শত্রুর রক্তপাতে প্রতিহিংসা গ্রহণ কর, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও, প্রচণ্ড নিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা করে ত্বরিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হও...

...যখন অপর সকল প্রক্রিয়া বিকল হয়, তখন এক প্রহারই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। অন্য কোনও ব্যবস্থাই ইহার সমকক্ষ নয়।

প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, জানা-অজানা নানা দিক থেকে স্বদেশানুভূতির একমাত্র পথ 'অস্ত্র ধারণ'—অত্যাচারের প্রতিরোধে পালটা পাটকেল ছোঁড়া—ব্যাপকভাবে প্রচারে গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল। 'দৈনিক হিতবাদী'তে স্পষ্ট করেই বলে দিল।

.প্রকৃতির নিয়মে স্বাধীনতাই সর্ব জীবের লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর স্বাধীনতাহীন মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা-লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

ইংরেজ শাসক যখন দেশবাসীকে শায়েস্তা করার জন্য 'রক্তঝরা' পথ নিয়েছে তখন নিপীড়িত দেশবাসী কেন চুপচাপ সহ্য করবে বিনাবাধায়—তাই প্রতিরোধে প্রত্যাঘাতই একমাত্র অবলম্বন। তাতে কোন শঠতা নেই, নেই কোন বিরোধ।

বার বার ইংরেজের সীমাহীন হিংস্র মানসিকতার ঔদ্ধত্য বঙ্গদেশের মানুষের অন্তরে প্রতিবাদের দুর্গ স্থাপিত হয়েছে। তার একমাত্র পথই প্রকাশ্যে তার মোকাবিলা করার দুরন্ত সাহস এবং তারপর মৃত্যুবরণ করার অবিশ্বাস্য আকুতি। এমনিভাবে প্রচণ্ডতার প্রবাহ দেশজুড়ে জাতিসত্তায় যেন ঘুম ভেঙে গেল। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া নয়—শ্বেতাঙ্গের অপমান-অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষেত্র আজ সামনে প্রস্তুত—কিশোর যুবক নির্বিশেষে 'বন্দেমাতরম', ধ্বনিতে ধ্বনিতে মুখরিত করে পুলিশের নির্মম প্রহারের প্রত্যাঘাত শুরু হয়ে গেল। ধর-পাকড় লাল-পাগড়ির পুলিশের সামনে 'বন্দেমাতরম' সুউচ্চ ধ্বনিতে মাতোয়ারা যুব-সম্প্রদায়।

..A boy from the Yugantar office was handled severely by the police, and he also dealt some letling blows on his assailant.

সুশীল সেন, পান্নালাল শেঠ, পঞ্চানন দাস সহ অনেকেই পুলিশের বেত্রাঘাতের তীব্রতা সহ্য করে করে দেশের যুব-শক্তিকে এগিয়ে যেতে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিল। একদিন বাঙালির নামে নানা অপবাদ ছিল। সেদিন বাঙালির যুব-শক্তির মন নির্যাতনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে মাতৃ-আশীর্বাদে মৃত্যু পর্যন্ত বরণে এগিয়ে চলেছে। সে এক ভয়ানক পরিস্থিতি বঙ্গদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রবাহে। কোন বাধা আর নেই—কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' আর দেহ-মন শিউরে উঠা অত্যাচারের জন্য প্রস্তুতি।

বঙ্গভঙ্গ আইনে পাশ হল—সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের সর্বত্র মানসিক অসন্তোষের তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়ল স্বাভাবিকভাবে। পুলিশও তৈরি হয়ে গেল তাণ্ডবের সমুচিত

জবাব দেবার জন্য। ধর পাকড়, বেত্রাঘাত, বেধড়ক কিল-চড়-ঘুষি। প্রত্যাঘাতে পুলিশকেও প্রহার। ঢিল ছুঁড়ে আহত করা সহ দেশীয়ভাবে চলল ব্যাপক কৌশল। ময়মনসিংহ-বরিশাল-কলকাতার ভবানীপুর-জলপাইগুড়ি—রংপুর-দিনাজপুর-মাদারিপুর -প্রভৃতিস্থানে সমবেতভাবে আবার কখনও বা একক সীমায় প্রত্যাঘাতের আয়োজন যেমন চলছিল স্বদেশীদের তেমনি ইংরেজের পুলিশ দারোগা ও বসে নেই। আত্মরক্ষার নামে অত্যাচারের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সজাগ।

এমনি অনমনীয় প্রত্যাঘাতেও যুবশক্তির উপর থেকে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার-নির্মম নির্যাতন বন্ধ হল না।

তার ফলে ব্যাপকহারে সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদের নিশানা হিসেবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত স্বদেশী-দামাল যুবকরা পথ পরিদর্শন করে হিংসার পথকে গ্রহণ করার ক্ষেত্র উর্বর করছিল ; পরবর্তী প্রজন্মের হাতেও সশস্ত্র বিপ্লবের বীজ উপ্ত হতে লাগল।

॥ নয় ॥

ক্লিবত্ব ত্যাগ কর
আহ্বান এল—জীবন তুচ্ছ।
জীবনের চেয়ে আর কি অমূল্য আছে!
বলা হল ভক্তি!

দেশ ভক্তি, দেশাত্ম ভক্তি, শরীরে-মনে-চরিত্রে-সর্বোপরি দেশের জন্য নিবেদিত সর্বস্বই ভক্তি'।

'আনন্দমঠ' এর আদর্শে বিদ্যুৎ গতিতে দেশ জুড়ে গড়ে উঠল ক্লাব-সমিতি-আশ্রম-আখড়া-কিন্তু কেন? না, **দেশাত্মবোধ জাগাবার জন্য দেশের মানুষের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস জাগাবার জন্য, মাতৃভূমি ও মাকে একমাত্র উপাস্য বলে জানার জন্য!** আর দেরী নয়—অনেক সময় হরণ হয়ে গেছে।—আর বিলম্ব নয়—প্রস্তুত হবার জন্য এল আহ্বান—**কোথায়! সেইখানে, যেখানে মৃত্যু হাসতে হাসতে আহ্বান জানাচ্ছে আলিঙ্গনের জন্য**—কাতারে কাতারে সবাইকে আহ্বান করছে—কিন্তু? আর কিন্তু নয়—**ইংরেজের অত্যাচার-নিপীড়ন দেশজুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব! দেশের-দেশবাসীর এই দুর্দশা বিনাশকারী 'হরে মুরারে'—সেই সুদর্শনধারী বাসুদেবের আহ্বান—ক্লিবত্ব ত্যাগ করে এগিয়ে চল।**

'গীতা'র বাণী স্বদেশাত্মার যুব-শক্তির শোণিতে ঢেউ তুলল। যাঁরা দেশের কাজে যুক্ত হবে—তাদের হাতে, মননে, চিন্তায়, ধ্যানে 'গীতা'—ক্লিবত্ব ত্যাগ কর। বুঝে না বুঝে কিশোর থেকে যুবা সবাই সেই আখড়ায়, সেই নাম না জানা গুপ্তস্থানে জড় হয়ে দেশের কথা দেশ-জননীর বেদনাসিক্ত ক্রন্দনের ধ্বনিতে তৎপর হয়ে উঠত। সবার হাতে 'গীতা'—যেন জলন্ত তরবারি হাতে শির উঁচু করে শপথ নেবার আয়োজন।

'দামাল ঘরছাড়া ছেলেরা একনিষ্ঠভাবে শুনল, দামোদর চাপেকারের বিচার কাহিনী :

বিদ্রোহী দামোদর মহারাষ্ট্রের পূণার প্লেগ-অফিসার ব্যান্ড সাহেবকে হত্যার অপরাধে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে শুনল-তাঁর মৃত্যুদণ্ড!

দামোদর হাসতে হাসতে বলল, মৃত্যুদণ্ড-এইটুকুমাত্র! কেঁপে উঠল আদালত— বিমূঢ় বিচারক—স্তব্ধ হয়ে গেল অত্যাচারের ঝনৎকার। 'এইটুকু!'

দামোদরের হাতে তখন একটি বই—গীতা।

ফাঁসির দড়ি স্থির—কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই—মৃত্যু প্রণয়ির বেশে দামোদরকে আহ্বান জানাল—দামোদর এগিয়ে গেল ফাঁসির দড়িতে লাগানো মৃত্যু প্রিয়ার কোমল হাত ধরবার জন্য। নিমেষের মধ্যে দামোদরের দেহখানা নুয়ে পড়ল। কিন্তু হাতে সজোরে আবদ্ধ হয়ে রইল 'গীতা'। শুধু দামোদর নয়—পর পর আরো দুটি ভাই। বালকৃষ্ণ, বাসুদেব—দেশজননীর আহ্বানে জীবন উৎসর্গ করল হাসতে হাসতে—হাতে তাদের তখন একমাত্র অবলম্বন সেই 'গীতা'।

ভগিনী নিবেদিতা গিয়েছিলেন সেই চাপেকার তিন সন্তানের জননীর সঙ্গে দেখা করতে-দেখলেন, জননী পূজার আসনে বসে গৃহদেবতার ধ্যানে নিমগ্না—পরম শান্তির শুভ্র-স্নিগ্ধতায় চোখদুটো অভিষিক্ত—শোক, তাপ, দুঃখ-বেদনার অঞ্জলি হাতে গৃহদেবতা নারায়ণ—বাসুদেবের চরণে দিনের অর্ঘ্য দিতে দিতে 'গীতা' থেকে স্তোত্র পাঠ করছেন।

নিবেদিতা বুঝলেন, চাপেকার ভাইদের শক্তির উৎস কোথায়। সেই শক্তি মাতৃভক্তি, দেশজননীর প্রতি ভক্তি—দেশই জননী, জননীই দেশ—দেশ জননীর অপমান, জননীর অপমান—তাই জননীর অপমানের অসহ্য বেদনায় দাসত্ব-শৃংখল ভাঙার জন্য প্রাণের তর্পণ—ফাঁসির দড়িতে চুম্বন—হাতে সেই 'গীতা'। ধ্বনিত হত—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
>
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

ক্লীবত্ব দূর করতে হবে—হৃদয়ের ক্ষুদ্র কামনাকে জয় করতে হবে—প্রতিটি 'রক্ত-শক্তিকে জাতির কল্যাণেই, দেশ-জনীর জন্য জাগাতে হবে।

ঘরের দুয়ার বন্ধ করে হাজার হাজার বছর আমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে অত্যাচার অপমান নির্যাতন সহ্য করে অন্ধকার কারাগারের যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছি। কিন্তু আর নয়— 'গীতা' আমাদের বন্ধ দুয়ারের কপাট জোর করে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়েছে—চারিদিক থেকে জীবনের আলোর বন্যা দেহ-মন চিন্তাকে প্লাবিত করে বলছে—এগিয়ে চল, আর ক্ষুদ্রতা—অন্তর শিথিলতার প্রশ্রয় নয়—অন্তর শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে—জানাতে হবে, অনুভব করতে হবে—সত্য যা নিত্য, আর নিত্যকেই বরণ করতে যত মূল্যই লাগে তা দিতেই হবে। তাই মৃত্যু-উৎসবে পরিণত করতে হবে।

যুব সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তুলবার জন্য 'গীতা'র বাণী শোনাতে হবে—'আত্মাই অবিনশ্বর—দেহ নশ্বর। তাই আত্মার আহ্বানই—দেশ জননীর আহ্বান—সেই আহ্বানে সাড়া দিতেই হবে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ

অন্তরের নিভৃতলোক থেকে সেই বাণী আহরণ করতে হবে। প্রতিরোধ-প্রয়োজনে যুদ্ধ—সেই যুদ্ধ ধর্মের জন্য, মায়ের জন্য। জননীর বাণীই শাশ্বত।

সত্যেন বসুর ফাঁসির হুকুম হল। ফাঁসির মঞ্চে সত্যেন বসু হাসতে হাসতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন তার মরণ-প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন পিয়াসে :

'When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said, 'be ready', he answered, 'well I am quite ready, and smile. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and love it cheerfully.

ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট-এর উক্তি

বিশ্বাসঘাতকদেরও শাস্তি দিতে এতটুকু করুণা করেনি সেদিনের দামাল সন্তানরা। মেরেছে—আনন্দে মেরেছে—পূণ্য কাজ করেছে। তার জন্য বিচার হয়েছে—ফাঁসির হুকুম হয়েছে। পরম আনন্দে ফাঁসির দড়ি ধরে খুশির জোয়ারে ভেসেছেন চারু বসু, বীরেন দত্তগুপ্তরা। কোথায় পেল এত সাহস, এত উদ্যম! সেই 'গীতা'—প্রত্যক্ষ শক্তির অবিরাম অবগাহন ওদের মৃত্যুভয় দূর করে দিয়েছিল।

নাসিকের একটি প্রেক্ষাগৃহে অত্যাচারী জ্যাকসনকে হত্যা—লন্ডনের একটি সভাগৃহে কার্জন উইলিকে হত্যা—কলকাতায় জেলের ভেতর বিশ্বাসঘাতক সেই নরেন গোঁসাইকে হত্যা— কোথা থেকে পেল এত সাহস! সেই গীতা—যা তাঁদের অন্তর-শক্তিতে অভাবনীয় আভরণে পুষ্ট করছিল নিরন্তর।

'গীতা' পাঠ, 'গীতা' ধ্যান, 'গীতা' প্রণাম—সবটাই দামাল ছেলেরা শ্রীকৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য' এর নির্দেশ ধ্বনিতে অস্থির হয়ে উঠত—কোন বাধার মোহ তাদের পথকে অবরুদ্ধ করতে পারত না। মৃত্যুকে বরণে স্বর্গ লাভ।

দামাল ছেলেরা মায়ের জন্য যুদ্ধ করেছে। আঘাত পেয়েছে কিন্তু ক্ষণিকের জন্য ও তাদের অন্তর কোন প্রশ্নে বিভক্ত হয়নি ব্রত পালনের মন্ত্র থেকে। সেই মন্ত্র 'গীতা'র মন্ত্র, 'গীতা'র প্রেরণা যেন প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ।

যতীন দাস—পাঞ্জাব জেলে আমৃত্যু অনশনে অচঞ্চল। অনশন তো উপলক্ষ্য মাত্র—আসল সত্যের শক্তি সেই চিরঞ্জীবী হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় নশ্বরতা থেকে উত্তরণ। সুখ-দুঃখ; লাভ-অলাভ, অনাহার-আহার সবটাই একই সত্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র। তাই স্বাধীনতার জন্য-দেহকে ছেঁড়া বস্ত্রের মত ত্যাগ করলেন—মরমী দেশব্রতীরা বলতেন।

...মৃত্যু সত্য কিন্তু দেহের জন্য দেহের শক্তি যে আত্মা সে যে অবিনশ্বর—কেউ তাকে মারতে পারে না—চেষ্টা করেও কেউ তাকে

নাশ করতে পারে না। সেখানে আগুন-প্রলয়-ঝঞ্ঝা কিছুতেই তাকে
নাশ করা যায় না।

স্বধর্মের ব্রত পালনে কাহারো চিত্তে ভয় ভীতি মোহ-কিছুমাত্র যেন না জাগে তার জন্য প্রতিদিন 'গীতা'র অনুধ্যান—'গীতা'র স্তোত্র পাঠে চিত্ত ও মনকে সবল করার সাধনাই প্রথম এবং তার পরিপূর্ণতাই শেষ—মাতৃচরণে অঞ্জলি হয়ে নিজেকে সমর্পণ।

দীনেশের জীবনটাই 'গীতা'র ধ্যানে প্রাণময়—যে কাজ দীনেশ করত তা পরম করুণাময় বাসুদেবের নির্দেশ বলেই অনুভব করত। তাই প্রতিটি কথায় ভয়শূন্যতা, একটা গভীর 'গীতা-নির্ভরতা' অনুভব হত। মৃত্যু আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়ে দুয়ারে—তুলে নেবাব জন্য অমৃতের আস্বাদনে সকল জড়তা ছেড়ে মায়ের জন্য পথে নেমে আসা। 'গীতা'য় বলেছে,

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন

তাই বাঙলার দামাল ছেলেরা দল বেঁধে কখনওবা একান্ত নিঃসঙ্গতায় দেশের মুক্তির জন্য যারা বাধা, তাদেব পথ থেকে সরিয়ে দিতে দিতে একদিন 'মা'কে রাজপথে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে—এই প্রেরণায় উৎসারিত মন বার বার কানাই-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকি-সত্যেন-নলিনী-প্রীতিলতা ধাংড়া-আসফাক্‌উল্যা-বসন্ত বিশ্বাস-বিনয়-বাদল-দীনেশ-ব্রজকিশোর-অনাথপাঞ্জা-প্রদ্যোৎ-মৃগেন-যতীন দাস-মতি মল্লিক-ভবানী-উধম সিংহ-রামকৃষ্ণ-নির্মল সেন—দীনেশ মজুমদার-ভগৎ সিংরা জীবন দিয়ে দিয়ে রাবণরূপী ইংরেজের হাত থেকে সীতারূপীকে উদ্ধার করার জন্য ভয় সমুদ্র বাঁধ দিয়ে পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'এর সেই 'বন্দেমাতরম'ই 'গীতা'র সার্থক ফসল। এই ফসল দেশপ্রেমের সমুদ্রমন্থন করেই বঙ্কিমচন্দ্র তা সবার কাছে বিশেষভাবে বাঙলায় যুবশক্তির কাছে অমৃত সুধা বন্টন করলেন। দেশপ্রেমের নতুন প্রেরণায় বাঙলা তথা ভারত মাতার চরণে হৃদয় মন সঁপে দেবার আর্তি জেগে উঠল।

'আনন্দমঠ' এর মধ্যে যুব-শক্তি শুনতে পেল মায়ের আহ্বান—জীবন-পণে আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে—তার জন্য সব ত্যাগ করতে হবে, আবার সন্তানধর্মের সার্থকতায় হাতে অস্ত্র ধরতে হবে। নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষরূপ 'আনন্দমঠ'। 'আনন্দমঠ' এর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত অরবিন্দ লিখলেন 'ভবানীমন্দির'। শহর থেকে দূরে, লোক-চিহ্নহীন নির্জনস্থানে এই 'ভবানীমন্দির'। অরবিন্দ অনুভব করছিলেন—সমস্ত বিশ্বের জন্যই ভারতকে বাঁচতে হবে—বড় হতেই হবে, বিস্তার লাভ করতে হবে। তার জন্য অলসতা, ভয়-সংকোচ-দ্বিধা সব জয় করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন গিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী-বহ বিবেকানন্দ।

তখনকার দেশব্রতী নেতৃস্থানীয়রা অনুভব করেছিলেন দেশের দেব-দেবীর ভক্তির দেউলের প্রেরণায় নতুন পথের সন্ধান দিতে হবে। কেননা, ভগবৎভক্তি সিক্ত সামাজিক পটে দেশ-জননীর আর্তি ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে দেশের বন্ধন-মুক্তির

প্রেরণা সঞ্চারিত হবে—তখনই **দেশ ও দেশজননীর ভাবনার শক্তি কার্যকর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে সাধারণ মানুষ-সন্তান—যাদের আত্মত্যাগেই দেশ জননীর শৃংখল মোচনে প্রবল আন্দোলন সম্ভব হবে।** তাই দেশজননীর জন্য ত্যাগী-সন্তানদের মিছিল চাই। দেশের জন্য কাজ করার আগ্রহও তখন বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে।

'ভবানী মন্দির' যদিও তেমনভাবে প্রচার লাভ করেনি। কিন্তু মূল সত্যকে আঁকড়ে ধরে একদল দামাল যুবক তৈরি হয়েছিল অনবরত।

দেশের কথা :

এমনি পরিমণ্ডলে **সখারাম দেউস্কর রচিত 'দেশের কথা'** প্রকাশিত হল। প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই সাড়া জাগালো সবার চিত্তে-দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজের প্রকৃত ছবি। কোন উত্তেজনা মূলক নির্দেশ নয়—বেদনার, বেত্রাঘাতের কোন ঘটনার ছবি নয়—শুধুমাত্র দেশের বিদেশী শাসক ইংরেজ কিভাবে আমাদের সোনার দেশকে রিক্ত নিঃস্ব করে তুলেছে—**দেশের মানুষ কিভাবে শাসনের নিষ্পেষণে 'দারিদ্রতার চরমে সর্বস্ব খুইয়েছে তার প্রত্যক্ষ ইতিহাস।** কিভাবে দেশের 'গড়ে উঠা' শিল্প-বাণিজ্যকে কূটনীতিতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে সুকৌশলে তার কাহিনী—যা পাঠ করে বাঙলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর নড়বড়ে রূপটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সখারাখ দেউস্কর 'শিবাজী চরিত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং **সেই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' এই কথাটি ব্যবহৃত হয় যা তৎকালের যুব-দেশব্রতীদের কাছে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল।**

'মুক্তি কোন পথে' :

'যুগান্তর' এ প্রকাশিত অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি থেকে বাছাই করে **'মুক্তি কোন পথে' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বাঙলার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল।** শাসক ইংরেজ-শক্তির অনমনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে যুবশক্তির মনোবল বাড়াবার জন্য পুস্তকটির প্রয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রামে-গঞ্জে শহরে এখানে ওখানে গুপ্ত আড্ডায় অত্যাচারের প্রতিরোধে নানা ধরণের পথের কথা ভাবা হত অনবরত। গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও দেশ-ভাবনা ও বিদেশী শক্তির অমার্জিত আচরণে **'সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শক্তি লাভের জন্য কথকতা-সঙ্গীতের আসর ; 'ঘরোয় আলোচনা—যাত্রা এবং কবিগানের মাধ্যমে বিষয়টিকে সহজভাবে গেঁথে দেবার পরিকল্পনা** কার্যকর হল। বিদেশী শাসকের শাসনব্যবস্থায় দেশ ও দেশবাসীর যে কোন কল্যাণ সাধিত হবার নয় বরং ছলনার বেড়াজালে দেশের সম্পদ লুটে নেবার যে আয়োজন তা জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। নানা ভাবে, প্রয়োজনে সম্মুখ সমরে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির যুব-শক্তির এতটুকু যাতে দ্বিধা না আসে তারও ব্যবস্থা করার প্রয়াস গভীরভাবে কার্যকর হচ্ছিল।

কিন্তু ইংরেজ বইটির প্রচারে আইন করে নিষিদ্ধ করল। একদল দামাল যুবক কিন্তু নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছিল প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের জন্য। তার জন্য অস্ত্র এবং তৎসম্পর্কিত আরো অনেক আগ্নেয় বস্তুর প্রতি নজর গভীরভাবে কার্যকর হতে বেশী সময় লাগল না। ঠিক সেইসময় দেশের বাইরে ছোটবড় নানাবিধ মারণাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারপত্র প্রকাশিত হতে লাগল। এমনি একটি **Modern Weapons and Modern warfare বইটি হাতে এল বারীন ঘোষের। বারীন ঘোষের দীর্ঘদিনের** ভাবনার শূন্যতা রসদ পেয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—তিনি লিখে ফেললেন 'বর্তমান রণনীতি' নিয়ে প্রবন্ধ সংকলন। এই সংকলনে যুদ্ধ, যুদ্ধের বিচিত্র রণকৌশল, অস্ত্রে বিভিন্ন কার্যকারিতা সহ নানাবিধ পরিচালিত তথ্য যা একটি যুদ্ধের পূর্ণতা দেবার পক্ষে অনিবার্য—সেই সব ঘটনার, বিষয়বস্তুর বিস্তার। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় বইটি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

...The book is a small manual which seeks to describe for the benefit of those who are entirely unacquinted with the subjects, the nature and use of modern weapons, the meaning of militacy terms, the use and distribution of various limbs of a modern army, the broad principles of guerilla warfare. These are freely illustrated by detailed references to the latest modern wars, the Boer and Russo—Janapees, in the first of which many new developments were brought to light or tested and in the second corected by the experience of a greater field of warfare under modern conditions. The book is a new department of Bengali literatures and one which shows the new trend of national mind...

বইটির 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রিভিউ প্রকাশের পর পরই যুবশক্তির মন আনচান করতে লাগল—প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য। এই ধরনের অনেকগুলি ইংরেজীতে লেখা বই বাংলার বাজারে বিপনণের জন্য এসে গেল। যুব-শক্তি গোগ্রাসে তা সংগ্রহ করে মানসিকভাবে নিজেদের আগামীদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে উদ্যোগী হল।

যুব-শক্তির ঘুম যখন ভাঙবার আয়োজন, ঠিক সেই সময় আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকা—**'উদ্‌বোধন', 'নব উদ্দীপন, 'উল্লাস', 'পল্লীবিলাপ'** প্রভৃতি এবং সংস্কৃত ভাষায় **'বঙ্গাঙ্গচ্ছেদ সন্তাপ' 'বঙ্গের পুনর্জন্ম'—'ছাত্রদমন কাব্য'** প্রভৃতি নানাভাবে বঙ্গ **ছেদের যন্ত্রণায় বিবস না হয়ে জাগিয়ে তোলার পথ দেখিয়েছেন। একাজে চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ, কেদারনাথ দেবশর্মা, ললিতমোহন সরকার, ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার সেনগুপ্ত ও ভুবনমোহন দাশগুপ্ত বিশেষভাবে সাহিত্যচর্চায় দেশবাসীকে জাগরণের মন্ত্র দিয়েছিলেন। 'স্বদেশগাথা' 'স্বরাজ গীতা' 'আমরা কোথায়'? পুস্তকগুলি খুবই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় সকলের কাছে বরণীয় হয়ে উঠেছিল।**

চারিদিক থেকে নানা তথ্য সম্বলিত হয়ে যুব-সমাজকে কার্যকর পথ গ্রহণের আয়োজনের চেষ্টা গভীর বেগে জেগেছিল। চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজা নন্দকুমার' 'ঝাঁসীর রানী' 'অযোধ্যার বেগম', 'সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'জালিয়াত ক্লাইভ' 'ছত্রপতি শিবাজী' 'প্রতাপদিত্য', দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'স্বাধীনতার ইতিহাস, রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস; মুকুন্দরাম চৌধুরীর 'মণিপুরের ইতিহাস', অক্ষয় মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ফিরিঙ্গিবণিক' 'জগৎশেঠ' প্রভৃতি পুস্তকগুলি সবিশেষে প্রেরণার ইন্ধন দিয়েছিল।

॥ দশ ॥

নব্যভারত :

'নব্যভারত' পত্রিকার পরিচালক, সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। এ পত্রিকায় কোন গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হত না। প্রবন্ধ-কবিতা, বিশেষ করে স্বদেশ ভাবনার চিন্তায় দেশ-গঠনের, দেশ ও দেশবাসীর কি কর্তব্য, তাদের কোথায় ঘাটতি, কোথায় পিছিয়ে থাকা—এই সব তথ্যনিষ্ঠ সংবাদের ভিত্তিতে আলোচনা এবং পথের সন্ধান দেওয়াই গভীরভাবে কার্যকর ছিল।

এই 'নব্যভারত' পত্রিকায় দেবীপ্রসন্নবাবু নিজে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করে পত্রস্থ করেছেন তাদের মধ্যে 'নিরাশার আশা' 'গোলামগিরির পরিণতি' 'কর্মসাধন' 'বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ' 'স্বপ্ন' 'সমাধান' 'অশ্রু' '৭ই আগস্ট' এবং '৩০ শে আশ্বিন' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙালি জাতির নিজের ভেতর থেকে, শক্তি জাগাতে হবে। তার জন্য জাতীয় চরিত্রে দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ করিয়ে তা থেকে মুক্ত হবার, সদর্পে উঠে দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ দেবার আয়োজন গভীরভাবে প্রকাশিত হত এই 'নব্যভারত' পত্রিকায়। সেদিক থেকে সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ব্যাপকভাবে সচেষ্ট ছিলেন এবং সেই মানসিকতায় বিশ্বস্ত লেখকদের লেখা পত্রস্থ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতেন।

বাংলা সামাজিক অপরিচ্ছন্নতার প্রতি নির্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির আনুকূল্য লাভের মোহ যেভাবে আপনজনের নিকটজনের প্রতি ও অপমানকে উৎসাহ দেবার জন্য যারা সমাজের নানাস্তরে প্রভাব বিস্তার করতেন তাদের মুখোস খুলে দেবার সযত্ন চেষ্টা ছিল আন্তরিক। জাতীয় কংগ্রেস তার চিন্তাধারায় নীতিনির্ধারণে সেই আবেদন নিবেদনের মধ্যে এমনভাবে জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল যার প্রত্যক্ষ ফল হয়েছে—বাংলার যুব-শক্তির উঠে দাঁড়াবার, প্রতিবাদ মুখর হবার সকল প্রয়াস আপনা থেকেই স্তিমিত হয়ে যাওয়া।

'নব্যভারত' ও বার বার পবিত্র স্বদেশ-আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'সবার সঙ্গে মিলিত হবার ইন্ধন জুগিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদনীতি সৃষ্টি করা শাসকশ্রেণীর একমাত্র আয়ুধ, তাকে খর্ব করার জন্য সমূলে নস্যাৎ করার জন্য বলা হয়েছে। স্বজন

নেতৃত্বের মধ্যেও বঙ্গভঙ্গজনিত দুর্বার জাগরণকে খুব একটা আমল না দিয়ে নানাভাবে প্রচার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতেন না এই বলে যে, বয়কট এবং দেশীগ্রহণ কেবলমাত্র বঙ্গভঙ্গ জনিত। বঙ্গভঙ্গ যদি রদ হয় তাহলে বয়কট—দেশীগ্রহণও উঠে যাবে—তখন আবার যেই সেই। তাই অযথা শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ না করাই উচিত। এ ধরনের মানসিকতার পুষ্টিসাধন করে একদল স্বজনবাসীর উদ্দেশ্যে 'নব্যভারত'ও প্রকাশিত হল দেবীপ্রসন্নের প্রবন্ধ—

> ..তাঁহারা বলেন, বঙ্গবিভাগ উঠিয়া গেলেই স্বদেশীদ্রব্য গ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইবে। এত লোক জেলে গেল। এত লোক নিষ্পেষিত হইল, এত লোক অপমানিত হইল, জলে অঙ্কিত চিহ্নের ন্যায় সে সকল কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে! ...হায় রে রাজভক্তি! তুমি প্রহার কর, নিষ্পেষিত কর, ঘৃণা কর, পদদলিত কর। তবুও আমরা রাজভক্ত! রাজভক্তের দল 'নব্যভারত' ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেন না, ইহাতে নাকি রাজভক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা হয়।... সে রাজভক্তিকে ঘৃণা করি, যে রাজভক্তি স্বদেশকে ভুলিয়া যাইতে আদেশ করে। আমরা রাজার আদর কেবল রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকি।...'আমরা বলি, যে রাজনীতি দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ নয় সে রাজনীতিকে আমরা আদর করিতে পারি না। ইহাতে যদি মৃত্যু বা নির্বাসন আইসে, আসুক।

দেবীপ্রসন্নবাবু 'বয়কট ও স্বদেশী গ্রহণ' আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন—'নব্যভারতে'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন।

> ...পার্টিশন চিরতরে থাকুক। তবুও এদেশের পক্ষে বিদেশী বর্জননীতি যেন পরিত্যক্ত না হয়, ইহাই আমাদের ব্যাকুল কামনা

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্খায়পুষ্ট মানসিকতায় দেবীপ্রসন্নবাবু বারবার যুবশক্তির কাছে ব্যাখা করে বলেছেন। যতদিন ইংরেজ আমাদের উপর অভিভাবকত্ব খাটাবে আর আমরা তা সহ্য করব ততদিন আমাদের স্বাধীনতা কোনভাবেই আয়ত্বে আসবে না, আমরা স্বাধীনভাবে জীবন ও জীবিকার পথ পাব না। এই চিন্তায় জাতীয় নেতৃবৃন্দের কর্মধারাকে ...'সাপও মারা চাই, নাঠীকেও বাঁচান চাই' অথবা ...'মাছ ধরতে হইবে, গায়ে কাদাও না লাগে'...মোটেই স্বাস্থ্যকর মনে করতেন না। তাই নানা অছিলায় বিচিত্র বিরূপতাকে অবলম্বন করে যুবশক্তির মনোবলকে ক্লান্ত অবসন্ন করার প্রচ্ছন্ন বক্তব্য প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করলেন দেবীপ্রসন্নবাবু তাঁর 'স্বপ্ন' প্রবন্ধে।

আবার শুধু বক্তব্য দিয়েই নয়—'সমাধান' প্রবন্ধে তিনি কালবিলম্ব না করে সর্বত্র স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি—তা সন্ত্রাসের মধ্যেই হোক আর গুপ্ত সমিতির বিপ্লবের কর্মপ্রবর্তনার মধ্যেই হোক—যেমন করে হোক স্বাধীনতার ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার সকল প্রকার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে হবে। যদিও স্বাধীনতার ভাবানুসঙ্গে স্বদেশী

চেতনা এবং বৈপ্লবিক তথা হিংসাত্মক সন্ত্রাস ভাবনার মূলগত বিরাট পার্থক্য। তবুও এ দুয়ের মধ্যে একটা মিলের পথকে খুঁজে বের করা এবং তা অনুসরণ করার কথা বারবার বলা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উষ্ণতায় স্বদেশী 'বয়কট' 'স্বদেশীগ্রহণ' এসব আজ তেমনভাবে যদি কার্যকর সাড়া না দেয় তবে নতুন পরিকল্পনা ও পথের সন্ধানে বিপ্লব তথা সন্ত্রাসকে গ্রহণ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা কবতে হবে।

এদিকে 'বয়কট', 'স্বদেশীগ্রহণ' আন্দোলনের জমিতে দেশ-ভাবনার বীজ ধীরে ধীরে উপ্ত-তপ্ত হয়ে যখন মুখ তুলে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়, সেই তৈরী জমিতে সন্ত্রাসের ঢেউ আছড়ে পড়ল—তছনছ করার প্রবল প্রবণতা ঘরে বাইরে মানুষে মানুষে হত্যা 'অত্যাচার' ছড়িয়ে গেল—সে এক বিপদজনক পরিস্থিতিব অবশ্যাম্ভাবী ফল কি হতে পারে তা বুঝতে পেরে দেবীপ্রসন্নবাবু আবার বললেন।

> ...কিন্তু অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার, এ কেমন কথা? সাত্ত্বিক ভারতের ইহা ধর্ম নয় ...আমরা ভাতৃহন্তা হইয়া দাঁড়াইলাম, তাই কত ভাই বিপথে গেল... এস ভাই, দিবারাত্র এই মরুভূমিতে বসিয়া কেবল অশ্রুর সাধনা করি।...

সন্ত্রাস তথা বৈপ্লবিক ক্রিয়া কাণ্ড কেমন ভাবে প্রশ্রয় লাভ করলে, মানসিকতায় তার পরিপূর্ণ ফলশ্রুতি কি হতে পারে তখন নেতৃবৃন্দ অনুমান করতে পারেন নি। দেবীপ্রসন্নবাবু 'অশ্রু' প্রবন্ধের পরপরই তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন জাতীয়স্তরে এক বিরাট মোড়কে নূতন কথা ও চিন্তার রূপ পেতে লাগল।

একসময় বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ থেকে জাতিকে যুক্ত করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্বস্তরে 'রাখি বন্ধনের' (৩০শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫) আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু পর বৎসর অর্থ্যাৎ ১৯০৬ সালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় স্বাভাবিকভাবে 'রাখি-বন্ধনের' ঘনঘটা স্তিমিত হয়। তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল না। কিন্তু 'রাখিবন্ধন' হয়নি। তবে বিষয়টিও জাতীয় নেতৃবৃন্দের মনেও কিছু প্রশ্ন, কিছু মতভেদ দানা বেঁধেছিল। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'রাখি-বন্ধন' না করার কথা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কেন, তা তেমনভাবে যুক্তি তর্কে বিষয়টি সামিল করতে পারেনি। সেইসময় জাতীয় দেশব্রতীরা—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, লিয়াকত হোসেন, 'রাখিবন্ধন' উৎসব চালাবার জন্য দেশবসীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নানাপর্যায়ে মতভেদ দেখা দিল এবং 'সংহত' শক্তির প্রক্রিয়গুলিতে উদ্দীপনার বেগ অনেকটাই গতিহীন হয়ে এল। এবিষয়ে দেবীপ্রসন্নবাবু '৩০শে আশ্বিন' প্রবন্ধে বলেছেন,

> ...আমরা জানি, শুধু পার্টিশন রাখি বন্ধনের কারণ নয়। বয়কটও তাহার অভিব্যক্তি নয়। শুধু পার্টিশন তাহার কারণ হইলে নব পার্টিশনে তাহা গেল কেন? কোন্ পার্টিশন ভাল—এ স্থান সে বিচারের জন্য নয়। পার্টিশন তখনও ছিল এখনও আছে। আরো

মূর্তিমান হইয়া আসিয়াছে। বাঙলা ভাবাভাবি তখনও বিভক্ত এখনও বিভক্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাইয়াছি—কিন্তু দিয়াছি কি? আসাম, উৎকল, বিহার, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর...যদি পার্টিশন শুধু 'রাখি বন্ধনের' কারণ হইত, তবে তাহা এমন করিয়া যাইত না.. জেদ রক্ষা হইয়াছে, স্বার্থ সাধিত হইয়াছে, আর 'রাখি-বন্ধন'কে নেতারা রাখিবেন কেন?

বিনয়কুমার সরকার :

''নব্যভারত' পত্রিকায় স্বদেশ ভাবনার বিভিন্ন দিক দিয়ে দেশ-নেতৃবৃন্দের নানা আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের কুফল সংক্রান্ত বহু অভিযোগ জানিয়ে। আবার কিছু কিছু প্রবন্ধে 'বয়কট', 'স্বদেশী গ্রহণ' সমাজের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের ভিত্তিতে জেগে উঠা যুবসমাজের কি করা উচিত, কোন পথে ভারতের স্বাধীনতা—যা সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের অভিপ্রেত, আয়ত্তে আসবে সে সম্পর্কে নির্দেশ সম্বলিত আলোচনা। বিনয় সরকার তখন যুবক, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের জাগরণ আবার নানা বাগ্-যুদ্ধের বিস্তারজনিত কিছু কিছু সমস্যা গভীরভাবে মানসিক স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করছিল। ঠিক সেই সময় 'নব্যভারত'-এ 'স্বদেশসেবা' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ তাঁর প্রকাশিত হয়। স্বদেশের জাগরণ ও তার ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে বিনয় সরকারের অন্বেষণ—প্রসূত স্বকীয় ভাবনা প্রবন্ধটিতে স্থান পেয়েছে। দোটানায় কোন কাজ সফল হবার নয়—এ বিশ্বাস তাঁর প্রথম থেকে ছিল। তাই তিনি লিখলেন,

> ...Govemment সকল কাজেই বাধা দিবে, এটা জানা কথা। আমাদের কাছে তা গুণ ও পূণ্যের জিনিষ। ওদের হিসাবে তা দোষ ও পাপের। আমাদের patriotism ওদের আইনে crime। মাতৃপূজার ওপর ট্যাক্স বসিয়েছে বলে তো মাতৃভক্তি বা মাতৃসেবা বন্ধ করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় Govenment-কেও খুশি করব ; আর দেশেরও উপকার করব এ অসম্ভব। ভগবানের অর্চনা আর স্বার্থসিদ্ধি এক সঙ্গে চলতে পারে না। শ্যাম ও কুল এ দুয়ের এককে ছাড়তে হবেই।

বিনয় সরকারের এই মানসিকতা তখন যুব-সমাজকে গভীরভাবে উদ্দীপিত করেছিল এমনভাবে যে রাতারাতি এই নব্য যুবকের নাম স্বদেশভাবনার পরিমণ্ডলে বেশ আদরণীয় হয়ে উঠেছিল।

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী :

ইসমাইল হোসেন সিরাজী একজন শক্তিশালী স্বদেশ-ভাবনার মানুষ। মুসলমানদের নিয়ে ইংরেজের পাশা খেলা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার

প্রয়াসহেতু 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হল তখন থেকেই জাতীয়তাবাদী কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবীর মন ও প্রাণ ইংরেজের ছলনা ও পাশা খেলার দান অনুভব করতে পেরেছিলেন। সিরাজগঞ্জ 'বয়কট' ও 'স্বদেশীগ্রহণ' আন্দোলনের কড়া জায়গা, যেখানে প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বদেশ-ভাবনার মানসিকতা বৃদ্ধি লাভ করছিল। সিরাজী তাদের মধ্যে একজন মুসলমান, যার স্বদেশভাবনার 'উৎস থেকে' কবিতা-প্রবন্ধ উৎসারিত হয়েছিল এবং 'নব্য ভারত' এ প্রকাশিত হল। হিন্দু-মুসলমান—এক জাতি এক প্রাণ এই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সিরাজীর 'নব উদ্দীপনা', 'উচ্ছ্বাস' দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। 'জ্বলন্ত প্রাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে সিরাজী স্পষ্ট করেই জাতীয়তাবোধের সত্যকে উপলব্ধ সত্যে প্রকাশ করলেন।

> ...সলিল. সিঞ্চন ব্যতীত ভূমি সরস হয় না, বৃক্ষে ফুল ফল ধরে না। তেমনি হৃদয়ের রক্তদান ব্যতীত জাতীয় জীবন-তরু অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হয় না...। সম্প্রতি নব্যবঙ্গে বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ এবং ইঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমের যে তুমুল আন্দোলন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে ওই প্রবাহ প্লাবনে দেশের নেতৃগণের মধ্যে যদি একজনও ম্যাটশনি, ওয়াশিংটন বা ওয়ালেসের মত আত্মোৎসর্গ করিতেন তাহা হইলে সত্য-সত্যই এ দেশ নব-জীবনের পথে অগ্রসর হইত।

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী :

'বঙ্গ-ভঙ্গের সূত্র ধরে বাঙলাদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় মত-অভিমত সহ নির্দেশাত্মক এবং আক্রমণাত্মক অনেক প্রবন্ধ-কবিতার মধ্য দিয়ে জন-সাধারণের অন্তরে 'বয়কট' এবং 'স্বদেশীগ্রহণ' এর প্রভাব ঘটিয়েছেন। 'নব্যভারত' সেদিক থেকে বিশেষ যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন তার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বহু প্রবন্ধ-প্রকাশের মধ্য দিয়ে। একটা গভীর আন্তরিকতার স্বচ্ছ বিশ্লেষণ-মেধা যুক্ত প্রবন্ধগুলি সে সময় বহু পাঠকের উৎসাহ জাগিয়েছিল 'দেশ ও দেশবাসী' সম্পর্কে। 'সংস্কার ও সংরক্ষণ' একটি গ্রন্থে ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী অনেকগুলি প্রবন্ধে পর পর দেশের বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ভাবনায় অত্যন্ত সংবেদন স্পর্শে জাগরণের সূত্রটি তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া আরো কিছু প্রবন্ধ যা গ্রন্থযুক্ত হয়নি সেগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়কে অবলম্বন করে যুবশক্তির ভাবনাকে শক্তিদান করেছে। প্রবন্ধগুলি—'নবভারতের স্বদেশ-প্রীতি', 'রাজভক্তের স্বদেশানুরক্তি', 'ভারতের রাজনীতি', 'ভারতের প্রজানীতি', 'জন্মকালে জন্ম নাই, মরণকালে ওষুধ নাই', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবাসী', 'ভারতের শিল্প-বাণিজ্য। 'ভারতের ব্রিটিশ শান্তি', 'বঙ্গে নবশক্তির অভ্যুত্থান', 'কংগ্রেস' এবং 'ভারত-শাসনে ব্রিটিশ রাজশক্তির স্থান'।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধের বিশ্লেষণে জাতীয় চেতনায় উন্মেষ ঘটাবার প্রবণতা অত্যন্ত গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের দোষত্রুটি বিস্তার করে

জাতীর ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করতে গিয়ে লেখক বার বার বিপ্লবী মানসভূমিতে বিচরণ এবং প্রত্যক্ষতার কার্য করতে প্রেরণা দিয়ে মত পোষণ কবেছেন। লেখক তাঁব অন্তরের তীব্র বাসনা উদ্বুদ্ধ করতে যত্নশীল ছিলেন আর তা হল ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-ব্রিটিশ রাজশক্তির বিধি-ব্যবস্থা থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি। কিছু মানুষ অর্থ-পদমর্যাদার মোহগ্রস্থ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের সুখ্যাতি করে করে দেশেব মানুষের অন্তরে রাজশক্তির প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে জন-জাগরণের ধারাটিকে স্তব্ধ করতে প্রয়াসী। প্রবন্ধকার ধীরেন্দ্রবাবু সেদিক থেকে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন—তিনি লিখলেন,

> ...ইংরাজের যে সুশাসন সে তো একটা মস্ত মিথ্যা কথা। কেননা দেড়শত বৎসরের শাসনের পরেও যদি ইংবাজেব এদেশে থাকিবার এই মাত্রই অজুহাত হয় যে, সে চলিয়া গেলে আমরা আপনারা পরস্পর মারামারি কবিয়া উৎসন্ন যাইব, তবে ইংরাজ 'এতদিন এ দেশে কি উপকার করিয়াছে? এর পরেও যদি আমাদের মারামারি কাটাকাটি করিয়াই শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হয় তবে সে কাজটি আর এক মুহূর্তেব জন্যও ফেলিয়া রাখা কর্তব্য নহে। আর দেরী করিলে ইংরেজের অনুগ্রহে আমার সে শক্তিও লোপ পাইবে। ...আমাদের বাক্যের স্বাধীনতা যতদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ততদিন কিছু গোল হয় নাই। কিন্তু যেই সর্বসাধারণকে এই স্বাধীনতার অংশভাগী করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের আয়োজন করিলে, অমনি পুলিশ রেগুলেশন লাঠির জোরে সভা ভাঙিয়া দিল। যতক্ষণ বাক্যের স্বাধীনতায় ইংরেজের সুবিধা, ততক্ষণ তোমার স্বাধীনতা কিন্তু যখনই তুমি ইহাকে তোমার প্রকৃত স্বাধীনতার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে, অমনি উহা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কংগ্রেস যতদিন কংগ্রেসে আবদ্ধ, ততদিন বাক্যের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ যদি কংগ্রেস গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশিক্ষিত চাষাকে তাহার রাজনৈতিক অধিকারের কথা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যে কথা নৌরজী মহাশয় বলিয়াছেন, এবং যাহা extremist মহোদয়রা এই পাঁচ বৎসরাধিকাল বলিতেছেন, তবে ইংরেজ রাজত্বের এই মহিমা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও থাকিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

'বঙ্গে নবশক্তির অভ্যুত্থান' একটি মামলার প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধকার দেশের মানুষেব অন্তর-শক্তিকে বর্ধিত করার প্রয়াসে গভীরভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে যখন কোর্টে দাঁড়া করানো হয়েছিল, তখন পুলিশের সামনে অত্যন্ত দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, তিনি ইংরেজের শাসন স্বীকার করেন না, একমাত্র স্বদেশ, জন্মভূমি এই ভারতবর্ষের অস্তিত্বের জন্যই কাজ করছেন, ব্রত পালন করছেন এবং তা চিরদিন করে যাবেন—সেখান থেকে কোন ভাবে সরানো যাবে না। মাতৃভূমির নির্দেশ ছাড়া আর কারু নির্দেশ তিনি মানেন না, গণ্য করেন না। একটি মানুষের বিবেক যে কত বড় শক্তিশালী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য এবং বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য দুটিতে সেদিন সমগ্র দেশবাসীর বন্ধ-দুয়ারের কপাট সজোবে উন্মুক্ত হয়ে গেল। মৃত্যু-অত্যাচার-কারাগার সব বিবেক-ঝড়ে উঠে গেল।

বন্দী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষী করেছিল ইংরেজ। ভেবেছিল 'এক ঢিলে দুপাখি মারা'—কিন্তু ঘটল উল্টো ঘটনা—দেশজুড়ে রাজনৈতিক চিন্তাধাবার গুরুত্ব তীব্রতর হল—উভয়ের বক্তব্যের বেগে। 'অত্যাচার-মৃত্যু-নির্বাসন'—সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে 'বিবেক' প্রভুত্ব করল ভূপেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল—উভয়ের অন্তর সত্তায়।

বিচাবাধীন বন্দী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, আমি সরল বিশ্বাসে আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য বিবেচনা করে যা শ্রেয় বুঝেছি তাই করেছি সে কথা অস্বীকার করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য আমি ফরিয়াদী পক্ষের অনর্থক শক্তি ও অর্থব্যয় করাতে চাই নে।

সদর্পে বলিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিব না'! এ বিকট উত্তরের জন্য আদালত প্রস্তুত ছিল না।...

বিপিনচন্দ্র বলিলেন, আমি শপথ করিব না, কেন না, ইংরেজের প্রভুশক্তিকে সকলের উপর বলিয়া মানি না, তার উপর আমার বিবেক। প্রজাশক্তির দমন করিবার জন্য তোমরা এই বেআইনী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতেছ। সুতরাং তাহার অংশ আমি হইব না, তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, হে ইংরেজ, আদর্শ থেকে তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার 'মা'। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন, হে ইংরেজ, কার্যক্ষেত্রে তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার 'আমি'—সমবেত প্রজাশক্তির প্রতিনিধি, 'আমি'। এই আদর্শক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র যদি একত্রিত হই, এই 'মা' ও 'আমি' যদি মিলিত হয় তাহা হইলে মাঝখান হইতে আর সব মুছিয়া যাইবে। ইহা যদি ইংরাজের বোধগম্য হয়। তবে সে নিশ্চয়ই ভাবিবে, 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

প্রজাশক্তির তথ্য জন-শক্তির জাগরণ না হলে জনশক্তির মর্যাদাবোধ না অনুভব করলে আমাদের স্বাধীনতার অর্থ অসার্থক, অসফল হবে। অত্যন্ত নির্ভীক স্বচ্ছ তেজযুক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ধীরেন্দ্রবাবু জন-জাগরণের মূলস্রোতে দেশ ও দেশবাসীর ভাবনা ও চিন্তাকে অনুরণিত করার জন্য যুবশক্তির উদ্দেশ্যে তিনি প্রবন্ধগুলি রচনা

করেছিলেন। একদিকে জন-জাগরণে প্রেরণা দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংহতভাবে আত্মসংগঠন করতে প্রবন্ধকার দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন। রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সাথে সাথে আত্মশক্তির উদভাবনের জন্য যে সকল কাজ করার দরকার তার জন্য সংগঠন প্রয়োজন—সেই সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে দেশাত্মশক্তিকে সংহত কবে তৈরী কবতে হবে যুব-সমাজকে। **বলতে হবে সবার উপর 'দেশ' বড়। 'আমি' বড়—'মা' বড়।**

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে যুব-শক্তিকে উদ্‌বোধিত কবার জন্য 'নব্য ভারত'ও একটি প্রবন্ধ **'আবারও রোদন'** লিখে আলোড়নের ঢেউয়ে প্লাবন জাগাবার চেষ্টা করেছেন।

> স্বদেশী আন্দোলন কেবল কথায় হয় না, স্বদেশী আন্দোলনে কিছু স্বার্থত্যাগ আব কিছু কলেব গুঁতা আছে বলিয়াই কি বড় রুচিকর হইতেছে না। **যদি আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস না ছিল, যদি মায়ের পূজা সুসম্পন্ন করিতে না পারিবে তবে অকালবোধন কেন করিলে? জানা উচিত মায়ের পূজা শক্তিপূজা ; কথায় হয় না', বলি চাই, রুধির চাই।**

বৃথা কান্নাকাটি করে লাভ নেই, আমাদের এ হচ্ছে না, ওরা আমাদের মেবেছে, খেতে পাচ্ছি না। এ সব সভা করিয়া গলা ফাটাইয়া সময় নষ্ট করা—কোন কাজ হয় না। তাই প্রত্যক্ষভাবে সামনাসামনি **প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে 'মা' এর নামে, দেশের জন্য—'আমি' এই বিবেকের আহ্বানে যুবশক্তিতে সাড়া দিতেই হবে—তবেই মাতৃসেবা মায়ের পূজা সার্থক হবে—দেশ মুক্তিস্নানে অভিষিক্ত হবে।**

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ **'অরন্ধন ও রাখি বন্ধন'** নব্যভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) তারিখে রবীন্দ্রনাথের 'রাখি-বন্ধন' সহ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবানুসারে ঐদিন **'অরন্ধ্যন'** পালন করে, দেশবাসী প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আন্দোলনের গতি প্রকৃতিতে 'বয়কট' ও 'বিদেশী বর্জন' ও 'স্বদেশী গ্রহণ' গভীরভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক রক্ত ঝরা মৃত্যু ঘটেছে— জেগেছে জন-রোষ সহ আন্দোলন।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের নির্দেশে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হল। ভাঙ্গা দেশ আবার জোড়া লাগল। তখন দেশের কিছু নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী **'বয়কট'-'স্বদেশীগ্রহণ'-'বিদেশী বর্জন'** এই প্রক্রিয়া তখন ও বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন—আর কিছু বুদ্ধিজীবী তা শেষ, প্রয়োজন নেই বলে প্রচার করতে লাগলেন। এমনিভাবে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ নানাভাবে সামনে এসে পড়ল। **'রাখি বন্ধন এবং 'অরন্ধন' একটি জাতীর নিজস্ব ঐতিহ্যের উপর আঘাতের ফলশ্রুতিতে জেগেছিল, প্রচলন হয়েছিল। তাতে জাতীয় আদর্শের মহত্ত্বর দিকের পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছিল কাহাকেও আঘাত না করে। শুধুমাত্রবিধাতার অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার**

জন্য শ্রদ্ধান্বিত হয়ে 'মা' ও 'মাতৃভূমি'র অন্তর সত্তার অনুরণনে ব্রত পালন। এমনি পরিস্থিতিতে চণ্ডীচরণবাবু প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেন,

> ...এই বেওয়ারিশ দেশে জাতীয়-জীবন-শিশুর রক্ষা-বেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য অভিভাবকতা করিতে নরম-গরম বা মধ্য ও চরণপন্থী বলে কি না কলহ! এরা বলে আমবাই ঐ শিশুর মা-বাবা, ওরা বলে, যেই মা-বাবা হউক, ওটি আমাদের কলমের চারা। যতক্ষণ জিনিষটা ছিল, ততক্ষণ উভয় দলের যে কলহ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র জ্বালা দেশের লোক এখন সহ্য করিতেছে, আর মাঝখান হইতে কেমন সহজে এ জাতীয়-জীবনের চিত্রপট হইতে ঐ মূল্যবান বস্তুটি—ঐ সাত রাজার ধন মানিক চুরি হইয়া গেল, কেহই দেখিল না
>
> ...তোমরা স্বদেশীর আসর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও বাঙালীর ঘরে এখনও এমন নিষ্ঠাবান লোক অনেক আছেন, যাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন বিদেশী ব্যবহার করেন না। সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে তোমরা পতিত।

'নব্যভারত' পত্রিকায় সেসময় এমন সব আলোচনা পত্রস্থ হত, যাতে রক্ত চঞ্চল হয়ে দেশের জন্য প্রাণ দেবার মানসিকতা সর্বত্র। সামনে সমানে সমানে যুদ্ধ করার, রক্ত ঢেলে দেবার তীব্র আকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল প্রকাশিত কিছু কবিতায়।

'নব্যভারত'ও সেই ধরনের অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে **'বিজয়চন্দ্র মজুমদার'**, **'কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত; 'গোবিন্দচন্দ্র দাস; 'ধীরেন্দ্রনাথ শাসমল'**; **'অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত'**; 'মানকুমারী বসু' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাগরে জাগ বঙ্গবাসী প্রভাত আজি উদিছে
জলদ ভেদি ভাতিছে নীল গগন রে!
গৌরবেতে সৌর করে আশার কলি ফুটিছে
সৌরভেতে মোহিয়া বন-পবন-রে!
হেরি পুলকে ধরা আলোকে রঞ্জিত
বঙ্গময় গাহরে জয় সঙ্গীত।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

'দেশের আশা আছে' কবিতায় কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেছেন,

দেশের আশা আছেরে ভাই, দেশের আশা আছে?
মরলে মানুষ আবার হয়,
ভাঁটার পরে জোয়ার বয়।
নতুন ডাল গজিয়ে ওঠে, দেখছি, মরা গাছে!
দেশের আশা আছেরে ভাই দেশের আশা আছে।

ইংরেজ শাসক তাদের অত্যাচারের স্তর বাংলার শিশু কিশোরদের উপরও চালিয়েছিল তার প্রতিবাদে **কবি কার্তিক দাশগুপ্ত** লিখেছেন।

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!
পরীক্ষা আজ বিষম অতি
ও মোর দেশের পদ্মাবতি,
ছেলে বলির সমারোহে আয়, মা ছুটে আয়!
কান্নাকাটি রাখ মা, দূরে
ও সব হবে অন্তঃপুরে,
রণাঙ্গনে মাতঙ্গিনীর বেশ তুলে দে গায়!
ওবা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!
একটি ছেলে দিবি বলি
উঠ্‌বে শত মৃত্যু ঠেলি
দেখ্‌ব এবার কত খেয়ে তৃপ্তি ওরা পায়!
জানিস তো মা, আগাগোড়া
রক্তবীজের বংশ মোরা,
বক্ত ফুটে লক্ষ হব ধ্বংস-সাধনায়
ওবা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!

এখন ইংরেজের কাছে **আবেদন নিবেদনের সমারোহ করছে কংগ্রেস**—যেটা গভীর ভাবে বেদনার ও বিরক্তির পরিবেশ সৃষ্টির করেছিল। কবি তাই **কিসের খোসামোদ** ক[illegible]য় জানিয়েছিল।

আবার কিসের খোসামোদ?
পায় ধরিলে কয় না কথা, তাহার সনে আত্মীয়তা?
পিও-খেকো চিত্তে আর নাইকো আত্মবোধ?
সেই সাতান্ন হতে শুরু—এক্ষণে পা করলি পুরু
মর্‌লি-গরু অতঃপরে দিচ্ছে না বেশ শোধ?
অতদিন তো দেখলি সাঁচা ও সব আশা বাঁদার-নাচা,
'রক্ষণে' কি 'লক্ষণে' নাই ভক্ষণে বিরোধ!
কাহার পদে কপাল ঠুকা, কিসের খোসামোদ?

স্বদেশানুভূতির সঙ্গে আত্মগঠন ও আত্মশক্তির জন্য দেশের মানুষের অন্তরে গভীর আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার কাজে কার্যকর পদ্ধতি জানাবার জন্য সে সময়ের অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন। কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস-পাঠকসমাজের বিভিন্ন রুচিকে অবলম্বন করে চিত্রিত চরিত্র ও বাস্তব ঘটনার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার ব্যাপক প্রচার হয়ে আসছে অনেক পত্র-পত্রিকায়, বিশেষভাবে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে 'নব্যভারত' সেদিক থেকেও পিছিয়ে নেই।

বরিশালের গোবিন্দচন্দ্র দাস সেই কাজ অনেকটা করেছেন তার সৃষ্টির উপাচারে। 'নব্যভারত' এ অনেক কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের বিশেষ করে যুব শক্তির মন ও প্রাণকে স্বদেশমুখী করার আবেগ ও চেষ্টা খুবই ব্যাপক ছিল। ইংরেজের একটি বিশেষ অস্ত্র ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে শক্ত বিরোধ প্রাচীর তুলে নিজেদের ফয়দা তুলে দেশ শাসন করা। এ কাজে ওরা অনেকটাই সফল হয়েছে। তাই 'বঙ্গভঙ্গ' করার সাহস এবং কার্যকরভাবে তা করা— সেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের মধ্য দিয়ে। মুসলমানদেরই বেশীভাবে বুঝিয়ে হিন্দুদের আচার-আচরণ তথ্য স্বদেশানুকরণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার সার্থকতা ইংরেজের কলা-কৌশলে দীর্ঘদিন হয়ে আসছে।

গোবিন্দদাস মৃত্যুকে অনিবার্য ভাবে সফল কবার জন্য যুব-শক্তিকে আহ্বান জানিয়ে মরণকে সার্থকভাবে এগিয়ে দেবার কথা বলেছেন। দেশের জন্য 'মা'র জন্য মৃত্যুকে বরণ করে জ্যোতির্ময় হতে হবে। নইলে মৃত্যুর অর্থ সার্থক হবে না।

মরতে হবে মরব, তাতে ক্ষতি কিছু নেই,
পচা মরণ দিও না আর তাজা মরণ চাই।
সিংহ মরে ব্যাঘ্র মরে মহিষ মরে বনে
বন্য পশুর ধন্য জীবন আত্ম সমর্পণে।
ক্ষুদ্র পোকা সেও মরে রুদ্র পিপাসায়
জ্বলন্ত আগুনে সেও আলোর মরণ চায়।
মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ প্রহারে?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিগ্ দিগন্ত ;.োলা
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলিগোলা!
কালান্ত তার তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়
মৃত্যুমারা মৃত্যু চাহি জীবন জ্যোতির্ময়
লহ পুত্র, লহ কন্যা, লহ ভগ্নী ভাই
অভিমন্যুর মত হর্ষ অভয়-মৃত্যু চাই।

ইংরেজের হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে কিছুতেই কবি গ্রহণ করতে পারেননি। হিন্দুর রক্ত থেকেই মুসলমানের রক্ত সঞ্চারিত বলে কবির বিশ্বাস। এ বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের প্রতিটি হিন্দু মুসলমানের আচার-আচরণ তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুষ্ঠানে। তাকেই নষ্ট করার, তাতে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে ইংরেজ শাসকদের রণনীতিকে আঘাত হানতে হবে। হিন্দু মুসলমান একই রক্তের প্রবাহমান শক্তি। এ কথাতেই গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস জানালেন।

হিন্দু মুসলমান!
দু'জনেতে হও হে মাল্লা, মাঝি কর খোদাতাল্লা

ভাসায়ে দিয়ে জীবন-তরী দাঁড়ে মার টান,
হাজার বজ্র আসুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে
আসুক ধেয়ে আকাশ, ছেয়ে প্রলয় ডাকে বান
ভক্তিভাবে কর্ম কর, কিম্বা বাঁচ, কিম্বা মর
মোর তরঙ্গে রণরঙ্গে কবুল কর জান্
বেহেস্তে খেরেস্তা শুন, ডাক্ছে সবে পুনঃ পুনঃ
নায়ের ওপর পাল তুলে দাও মায়ের আঁচল খান
হিন্দু মুসলমান।

স্বদেশানুভূতির শক্তিতেই হিন্দু-মুসলমান এক ও অভিন্ন। এই বোধের এতটুকু তারতম্য ঘটলেই তারই শূন্যস্থানে শাসকের নির্মম ষড়যন্ত্র কার্যকর হয়ে 'মা'র আঁচলখানি খসে যায়—একা হিন্দু, একা মুসলমান দুই বিপরীত শক্তিহীনতা। মাতৃভূমির পরিপূর্ণ প্রকাশ হিন্দু-মুসলমান এর মিলিত উপলব্ধির মূল। সেখানে একটাই পরিচয়—আমরা মায়ের সন্তান।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল একটি কবিতায় লিখেছেন,

তোমরা করগে গোল
পড়লে বিজ্ঞান ক'সে,
সাকার কি নিরাকার
ভাবগে আজন্ম বসে।
সগুণ বলিবে বল,
না হলে নির্গুণ ঠিক
দ্বৈত কি অদ্বৈত তিনি,
খুঁজে মর চারিদিক!
...আমার দেবতা দীনা
বঙ্গভূমি মা আমার
অনন্ত সংখ্য গড়
যুগল চরণে তাঁর!

দেশের ভৌগলিক ঐশ্বর্য্যকে জীবন্ত ভাবনায় 'মা' রূপে উন্নত করার গভীরতা স্বদেশ-ভাবনার মূল শক্তি-সেখানে অন্য কোন কথা বা জ্ঞান তেমন কার্যকর নয়।

'স্বদেশ-সেবায়' কবিতায় অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয়ে নিজের ব্রত রক্ষায় বললেন,

ছোঁব না বিদেশী বস্ত্র করিয়াছি পণ,
এস আজ সবে মিলি।
দাঁড়াইব গলাগলি,
করিব যাহাতে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।

সঁপিব জীবন-মন স্বদেশ-সেবায়
আপন প্রতিজ্ঞা স্মরি,
শক্তিরে স্মরণ করি
বঙ্গ-নিবাসিনী যত ভগ্নিগণ আয়।

আপন শক্তির উদ্ধার না করে ইংরেজ শাসকদের আঘাত করা যাবে না। তাই দেশের মানুষের শক্তি আহরণ প্রথম দরকার। সে সম্বন্ধে 'নব্যভারত' এ **মানকুমারী বসু** জানালেন।

চিরদিন 'রাজভক্ত' জাতি, আজি তারা 'রাজদ্রোহী' কিসে,
"লাল টুপী লাল কোর্তা-ধারী রক্ত পিয়ে নিমেষে নিমেষে!
প্রজাদের জাতীয় উন্নতি-মাতৃসেবা, স্বদেশ-পূজন,
তারি নাম 'রাজদ্রোহ' যদি, 'রাজভক্তি' নীরবে মরণ?
স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দল মর্মগ্রন্থি ফেলিবে ছিঁড়িয়া
অর্ধাসন, অনশনে মোরা মৃতবৎ রহিব পড়িয়া?
জননীর ধনরত্ন লুটি যাবে চলি বিদেশী বণিক
নিবারিতে পদাঘাত সব, আমরা কি পশু বাস্তবিক?

আজ দরকার হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক মিলন। সম্প্রদায়গত বিরোধকে দূরে রেখে 'মা' এর সেবায়, সবাইকে এক হয়ে লড়তে আহ্বান জানালেন 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত **সৈয়দ আবু মোহম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন** সিরানীর কবিতায়—

সোনার ভারত হয়ে গেল ছাই
বল বীর্য ধন আর কিছু নাই!
শিল্প-বাণিজ্য লুপ্ত সব ভাই!
গোলাম মজুর সেজেছি সকলে।
উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে
চলিতে ফিরিতে কিবা সে ভ্রমণে,
শ্বেতাঙ্গের ঘুষি সদা জাগে মনে
বুটের আঘাতে প্লিহা বিদারণে
নিত্য কত ভাই মরিছে অকালে
নেটিভ বিনার' সদা খাই গালি,
আপত্তি করিলে বন্দুকের গুলি
ভাঙিয়া দিতেছে মস্তকের খুলি
অহো কি ভীষণ অত্যাচার হায়!
পেটে নাই অন্ন পরিধানে বাস!
অর্থবল বিনা মানুস উদাস
কেবলি অভাব! কেবলি হতাশ।।
ফিরিয়া চাহে না কেহই ঘৃণায়

ভারতসন্তার কর আজি পণ
প্রাণ দিয়ে আজি লভিব জীবন
সাধন করিতে মায়ের কল্যাণ
মহোল্লাসে দিব প্রাণ বলিদান,
তথাপি রব না এমনি পড়ে।
হইব না আর মথিত দলিত,
বহিব না আব অধম ঘৃণিত
সহিব না আর কোন অত্যাচার
সহিব না আর বিন্দু অবিচার
জড়েব মতন এমনি করে।

এর একমাত্র শক্তিই মিলিত হিন্দু-মুসলমানের শক্তি—যার ফলে ভারতে বহিবে বিপ্লর প্লাবন—সে প্লাবনে বিরোধের তুচ্ছ তুচ্ছ খড় কুটো ভেসে যাবে—সকল অপভাবনা ধুয়ে মুছে 'মা'র চরণ ধুয়ে দেবে—ভারত আবার জেগে উঠবে।

॥ এগার ॥

সাহিত্য :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ধুরন্ধর সাহিত্য সমালোচক। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ এবং বিশেষভাবে প্রকাশিত সাহিত্যের বিভিন্নভাগের সমালোচনা সুরেশচন্দ্রেব চিন্তাকে অকৃপণ মাধুর্যে উন্নীত করেছিল।

শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' প্রথম প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদনা ভার গ্রহণ করার সময় 'কল্পদ্রুম' কথাটি বাদ দিয়ে শুধু 'সাহিত্য' কথাটি প্রচলন করেন। এই 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভা'ব স্বদেশী ভাবাত্মক প্রেবণোদ্দীপক কোন নাম নিয়ে রচনা প্রকাশিত না হলেও যাঁদের রচনা এতে প্রকাশিত হত, তাতে বাঙালিব অন্তব-চেতনার জাগরণের কথা বলতে গিয়ে দেশাত্মাবোধক ভাবনার অনুরণন সঞ্চারিত হয়েছে। যাঁদের লেখায় এমন প্রেরণার কথা আছে তাঁহাদের মধ্যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। 'স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স' নামক প্রকাশিত প্রবন্ধে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গভীর প্রশ্নের একটি মীমাংসা করতে চেয়েছেন। ইংরেজ শাসক 'কালাইল সারকুলার জারি করে শিক্ষার্থী যুবকদের স্বদেশী ভাবনায় যেখানে পলিটিক্স যুক্ত কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ না করার জন্য যে নির্দেশ জারী করেছেন সে সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পলিটিক্সকে একটি স্বতন্ত্র বিষময় প্রতিক্রিয়ার প্রশ্রয় না দেবার প্রয়াসের জন্য সরকারী তৎপরতা গভীরভাবে প্রচারিত হতে লাগল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্পর্কে লেখেন।

...বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে কোন্‌টা পলিটিক্স, কোনটা পলিটিক্স নহে
স্থির করা শক্ত। আমাদের ছাত্রজীবনে ইল্‌বার্ট-বিল লইয়া ঘোরতর

> আন্দোলন হইয়াছিল। সাহেব-মেম ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদি হইলে এদেশী হাকিম, তাহার বিচার করিতে পাইবে কিনা ইহা লইয়া তর্ক উপাস্থিত হইয়াছিল। কথাটা অতি সহজ, আইন ও আইনগত অধিকার লইয়া। কিন্তু এ দেশের জলবায়ুর দোষে বা আমাদের অদৃষ্টদোষে বিষয়টা অনতিবিলম্বে পলিটিক্স হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।...

তিনি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বাঙালি স্বদেশভাবনার উৎস সত্যকে স্বাভাবিকভাবেই আপন গতির প্রবাহে কিভাবে সামনে এসেছে সে সম্পর্কে বলছেন।

> ...দেশের মানুষ দেশের শিল্পীর প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে, বিদেশী জিনিষ কিনিয়া বিদেশীর পায়ে অজস্র টাকা ঢালিয়া দেশকে দিন দিন নিঃস্ব করিয়া তুলিবে না, ইহারই নাম স্বদেশী আন্দোলন। কথাটা অত্যন্ত সোজা। পলিটিকস বলিলে সহজবুদ্ধিতে লোকে যাহা বুঝে ইহা ত তাহার ত্রিসীমানায়ও আসে না। এটা অর্থনীতির কথা, বড় জোর সমাজনীতির কথা, রাজনীতির বা রাষ্ট্রনীতির নহে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের ঘোষণা অন্যরূপ।

বস্তুতঃ আত্ম-শক্তির উদ্‌বোধের তাড়নায় স্বদেশ-ভাবনার জন্ম। তাই পরবর্তী সময়ে স্বদেশী-আন্দোলন হয়ে এসেছে। **মূল কথা আত্মজাগরণ—বাঙালির ঘর-বাহির বাঙলার নিজস্ব-সম্পদের যথাযথ আদর ও গ্রহণের আন্দোলন।** এখানে শুধু প্রীতিঝরা উল্লাসের আয়োজন—দ্বেষ-বিদ্বেষ এতটুকু স্থান নেই, নেই অন্য কাহাকেও আঘাতের কোন অপরিচ্ছন্ন ভাবনা।

ইংরেজ এই বাঙালি জাতিকে বশে আনবার জন্য পলিটিকস্ করে বাঙালিকে চরম আঘাত দিয়েছে বঙ্গভাগ করে। সেদিন তার প্রতিরোধে বাঙলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঙলার কচি-কাঁচা ছাত্র-দল। সে এক বিরাট ঐতিহ্য-রক্ষার আন্দোলন-সেখানে দেশের জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিছুতেই নীরবে দাঁড়িয়ে আপন ধ্বংসের বীজকে উপ্ত হতে দিতে পারে না। তাই ছাত্র-সমাজ এগিয়ে এসেছে—আর্তনাদ করেছে বঙ্গ-বিভাগের প্রতিরোধে। ঠিক তেমনি বাংলার নিজস্ব জলবায়ুর অফুরন্ত সম্পদে পুষ্ট বাংলার তৈরী জিনিষ ফেলিয়া বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিষ ব্যবহারের নির্দেশ এবং প্রচার কোনভাবেই বাঙলার ছেলেরা বরদাস্ত করতে পারেনি। পারেনি বলেই 'বয়কট ও স্বদেশী গ্রহণ' আন্দোলন করেছে—ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে স্বদেশী গ্রহণের প্রচারে। এখানে কোন অন্যায় বা অশোভন ভাবনা ঘটেনি।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার :

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বড় সরকারী চাকুরে—পুরীর ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিহার

উড়িষ্যার নামজাদা জাদরেল কমিশনার। স্বদেশী আন্দোলনের অনিবার্য ধারায় বৈরী ভাবনা যখন প্রবেশ করল তারই সূত্র ধরে সুরেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকায় গল্পের মাধ্যমে স্বদেশী-ভাবনার সত্যবোধকে সঞ্চারিত করেছেন। 'বয়কট ও স্বদেশী গ্রহণ' এই ব্রত-শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধমন। তাই গল্পের চরিত্র চিত্রণে ও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র রীতির অবলম্বনে। গল্পের বিষয়কে রীতির সঙ্গে মিলিয়ে গল্প লেখা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিশেষত্ব।

তাঁর **'স্বদেশী ও বিলাতী'** গল্পটিতে বিদেশী ও দেশী ভাবনাকে কেন্দ্র করে স্বদেশের গ্রাম ও তার সংস্কার তার চলাফেরা, পোষাক আষাক ইত্যাদি সহ তুলনামূলক গল্প-রস ফুটে উঠেছে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ :

'সাহিত্য' পত্রিকায় মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের দেশাত্মবোধক কবিতা প্রকাশিত হত গভীরতার স্পর্শ নিয়ে। উপর উপর ভাবনায় মত্ত না হয়ে বিষয় ও ঘটনাকে গভীর প্রত্যয়ে অনুভব কবার আকুতি। তাঁর প্রকাশিত প্রত্যেকটি কবিতার—কথাই স্বদেশানুরাগ। **'উদ্‌বোধন'—'আহ্বান'—'সাধনা'—'আত্মচৈতন্য'—'উত্থান সঙ্গীত'—'আবাহন'—'অর্ঘ্যদান'—'অধিকারী'—'জাগরণ'** এবং **'অগ্নিহোত্রী'** উল্লেখযোগ্য।

সাধনা

চাই মুক্তি? চাহ যদি দুর্লভ ধন,
পরপদধূলিশয্যা ত্যাজি' উঠ তবে।
মুক্ত কণ্ঠে ভক্তিভরে কর উচ্চারণ
অগ্নিমন্ত্র মাতৃমন্ত্র—'মেঘমন্দ্র' রবে।
বজ্রবহ্নিসম তেজে পৌরুষ গৌরবে
যাও সাধনার পথে ; হও অগ্রসর ;
রহ স্থির গিরিসম জীবন-আহরে,
ভক্ত-হৃদি-রক্ত-জবা শোণিত্-চন্দনে
পূজ জননীর রাঙা চরণ দু'খানি!
প্রসন্ন হইয়া মাতা দিবেন নন্দনে
বাঞ্ছিত অমৃত ফল তুলি' পুণ্যপাণি।
সাধকের হৃদি-রক্ত-আত্ম বলিদান
অমৃত মুক্তির স্পর্শে মৃতে পায় প্রাণ।

স্বদেশ ভাবনার জোয়ার বাঙালির চিত্তলোকে বেশ একটা পরিণতির ছাপ রেখেছিল নানাদিক থেকে। ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকেই পরিবেশ ও ঘটনার প্রভাবে মানসিক উত্তেজনায় অনেক অভাবনীয় তৎপরতায় বাঙালির হৃদয় উদ্বেলিত। কিন্তু সংস্কারগত কিছু জড়তার প্রভাব থেকে বাঙালির হৃদয় ও কর্মচেতনার প্রান্তর সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি। চলতে চলতে তাই দ্বিধাজড়িত স্তব্ধতাকে আঘাতের

প্রচণ্ডতায় সচল করার অনিবার্যতায় তখন বাঙলা কাব্যে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে নানা প্রক্রিয়ায় প্রচ্ছন্নভাবে চাবুক মেরে জাগাবার প্রয়াস ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ সেই দিক থেকে গানে-কবিতায় বার বার জাতীয় সত্তার উদ্‌বোধনে গভীরভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সেসময় কবি বাঙালির অন্তর চেতনায় স্বদেশ-প্রেমের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার আয়োজনে ভারত ঐতিহ্যের সূত্রটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। দেশ ভাষা ও কালের উর্ধে রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত দৃষ্টি 'উদার মর্মলোকে পরিচ্ছন্ন সুস্থ পরিক্রমায় বিচরণ করার শক্তির প্রেরণা জুগিয়ে গেলেন—কোন সংকীর্ণ জাতিপ্রেম, ভাষা-প্রেম তাঁকে মোহগ্রস্থ করতে পারেনি। একদিন বঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথ যেমন রাজপথে নেমে বঙ্গ-মাতার ভাগ হবার বেদনার অভিশাপ থেকে যুক্ত হবার মন্ত্র উচ্চারণ করে গেয়েছিলেন—বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা, সত্য হউক, সত্য হউক—পরবর্তী সময়ে সেই মানসিকতার উত্তরণ ঘটল সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরশক্তির জন্য তথ্য মানবাত্মার মুক্তির কামনায় স্বতঃপ্রণোদিত আকুলতায় উদ্‌গ্রীব। সেখানে বেদনা, যন্ত্রণা আপন দেশের জন্যই নয়, অন্য কোথাও যদি মানবাত্মার বেদনা-যন্ত্রণা জাগে—রবীন্দ্রনাথের চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই বেদনা বিদ্ধ হন এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সজাগ হন।

রবীন্দ্রনাথের সেসময়কার অনেক কবিতা, বিশেষ করে 'নৈবেদ্য' গভীরভাবে বাঙালির সংস্কারগত ভাঙ্গা মেরুদণ্ডকে সজোরে সোজা করে দেবার ইন্ধন জুগিয়েছেন। শুধু নীতি ও আদর্শের দোহাই দিয়ে নয়, প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করে স্বদেশ-চেতনার বেদীকে সুসজ্জিত করতে হবে—তার জন্য এতটুকু বিড়ম্বনা প্রশ্রয় দেবার নয়—

...অস্ত্রে দীক্ষা দেহো,
রণগুরু!...

সত্য, তা যত কঠিন হোক, যে কোন মূল্যে তার সাধনা জীবনে স্থান দিতে হবে। এ ধরনের সত্যবোধ আদর্শকে সামনে রেখে দেশব্রতীদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক তেজ-শক্তির প্রতি গভীরভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন। তাই অতীত ভারতের সত্য-বোধ ও ভাবনাকে জাতীয় জীবনের নিত্যদিনের অনুভবে কার্যকর প্রস্তুতির দীক্ষা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন দেশব্রতীদের কাছে। তার জন্য শুধু কথাই সম্বল যাতে না হয়, বক্তৃতার তুবড়ীতে যাতে তা পর্যবসিত না হয় তার জন্য রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে শরীর ও মনে শক্তির সাধনায় তেজ-দ্যুতিতে স্বচ্ছতার পরিমণ্ডলে বিচরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু মৃত্যু নয়, প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে সকল বিফল, অলস মানসিকতার উত্তরণের জন্য তৈরী করার পথ দেখিয়েছেন।

...যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি পরে তোমার নালিশ।

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে
তবে ঘরে নতশিরে চুপ্ করে থাক্
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্ না ঢাক্!
এক দিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল
অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।

শুধু কথার ফুলজুরী নয়—অত্যাচারের প্রতিবিধানে অস্ত্র ধারণ করার তেজ-শক্তির অর্জন করতে হবে। আঘাত এলে প্রত্যাঘাতও প্রয়োজন, এমনি কঠোর অথচ আন্তরিকভাবে প্রকৃত সত্যবোধকে আশ্রয় করে এগিয়ে যাবার কথা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেশব্রতীরা তখন অনুভব করেছিলেন। আলস্য-ভীরুতার গড্ডালিকার পংকিল অপরিচ্ছন্নতা থেকে জাতিকে মুক্ত করে সচল ও উন্নত করার প্রয়াসে 'আঘাত' করার প্রক্রিয়াকে সমর্থনও করা হয়েছে।

জাতির চরিত্রের হীনমন্যতার জড়ত্ববোধকে আঘাত হেনে প্রবলতম শ্লেষে সেসময় রবীন্দ্রনাথ জাতি-ব্রতীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

দাস্য-সুখে হাস্যমুখে বিনীত যোড় করে
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবরে
পাদুকা-তলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘরে
ঘরেতে বসে' গর্ব কর পূর্ব-পুরুষের
আর্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থর থর।

দেশাত্ম-অনুভূতির গভীরতায় স্বদেশের ভাবনায় জাতীয়-জীবনে অধ্যাত্মবোধের প্রেরণাও তখন কার্যকর হয়েছিল অত্যন্ত পরিশীলিত কর্মচর্চায়। এটা দেশ-সত্যের অনিবার্যতার স্বভাবিক প্রবাহে এসে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ সেসময় দেশ ও জাতীর উত্তরণে অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে গাওয়াও হয়েছিল। প্রত্যেকটি গানের অন্তর-ভাবনা দেশ ও দেশবাসী। বিশ্বস্ত প্রেরণায় জাতীয় চরিত্রকে সকল দুর্বলতা ও সংশয়ের রুদ্ধ-কারাগার থেকে সজোরে আঘাত করে সামনের দিকে পথে দাঁড় করিয়েছিলেন দেশের জন্য। একদিকে অতীত ঐতিহ্যের অহংকার জড়িত বিনম্রতা অপরদিকে সেই ঐতিহ্যের ধারাকে প্রবহমান করার পথের সন্ধান—রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে তার রূপ-কল্পে যুবশক্তিকে সাহসে এগিয়ে যাবার ইন্ধন জুগিয়েছেন।

আগে চল্ আগে চল্, ভাই; আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না; একি অন্ধকার এ ভারতভূমি; আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে; একবার তোরা মা বলিয়া ডাক; আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে; নব বৎসর করিলাম পণ; কেন চেয়ে আছ গো মা

মুখপানে; অয়ি, ভুবনমনোমোহিনী; এ ভারতে রাখ নিত্যপ্রভু; সার্থক জনম—সার্থক জনম আমার; সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা, আমরা পথে পথে যাব সারে সারে; ও আমার দেশের মাটি; বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি; আমি ভয় করব না; নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে; এবার তোর মরা গাঙে; যদি তোর ডাক শুনে; আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে; 'যে তোরে পাগল বলে; যদি তোর ভাবনা থাকে; যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক; মা কি তাই পরের দ্বারে; তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে; ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি গানে রবীন্দ্রনাথ অন্তর-উজাড় করা আকুতিতে দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে দেশ ও দেশমাতার নিবিড় চেতনাকে অনুভব করবার প্রয়াস করেছেন। এতটুকু জড়তা তথা স্তব্ধ আস্ফালন গানগুলিকে এতটুকু স্পর্শ করেনি। 'স্বদেশ'-এই সত্য-বোধের প্রেরণাকে জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে সঞ্চারিত করার প্রত্যক্ষ আলোড়ন-ঝাকুনি দিয়ে সচল করার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথের সেসময়ের গানগুলি একটা স্বচ্ছ অনুভূতির সঙ্গে শক্তি-সমৃদ্ধ শব্দ ও সুরের সংযোগ দেশ-জুড়ে অন্তর-আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

স্বদেশব্রতী যুব-সম্প্রদায়ের অন্তরে সেই সব গানের স্পন্দন তেজদীপ্ত প্রেরণায় মন ও ভাবনাকে আছন্ন করত অনবরত যা পরবর্তী পর্যায়ে আঘাতের প্রত্যাঘাতে মরিয়া প্রাণে উত্তেজনায় দেহ-মন অভিষিক্তি হত—দেশ-বন্দনা'র জীবন উৎসর্গ করার ব্যাকুলতায় হৃদয়-উৎসবে মেতে উঠত।

বাঙালির স্বদেশ-চেতনায় রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার বহু গান কণ্ঠে কণ্ঠে একটা উষ্ণ-উন্মাদনার বাতাবরণ আপনা থেকেই সঞ্চারিত হত।

নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর নাটক রচনায় নাটকের কিছু কিছু চরিত্রে স্বদেশ ভাবনার ব্যাকুল আর্তিকে সংলাপের গাঁথুনীতে জুড়ে দিয়ে সেসময়কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অন্তরে নাটকের সহজ আবেদনে টগ্‌বগ করত। অভিনয়ের, চরিত্রের সংলাপের দেশাত্ম-বোধের শব্দগুলি নাটক শেষ হবার পর বহুদিন সাধারণের কাছে উচ্চারিত হত—যা ধীরে ধীরে সহজ সরল, একেবারেই রাজনীতির অঙ্গন থেকে অনেক দূরের দিনমজুর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের দর্শকের অন্তরকে অধিকার করে থাকত। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সোনার বাংলা' নাটকটি সেসময়কার সামাজিক তথা দেশীয় পরিস্থিতির পর্যালোচনায় গম্ভীরভাবে দর্শক উদ্‌বোধিত হয়েছিল।

........শুনি মা তুই সোনার বাংলা
শুনি যেমন সোনার কাশী
তুই যদি মা সোনার বাংলা
আমরা কেন উপবাসী?

বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষতার ছবি নাট্যকার আসল পরিস্থিতিটি নাটকীয় আকর্ষণে জানিয়ে দিয়েছেন। অতি অল্প আয়াসে বেশীসংখ্যক দর্শকের অন্তরকে ছাড়া দিতে সহজ হয়েছিল।

দু'পাতা ইংরাজি চেটে
দেমাকে মরেছি ফেটে
সারা হলেম খেটে খেটে
গলাতে গোলামী-ফাঁসী।

সন্তানেব আকুতিতে সোনার বাংলাব মা তখন বলেন,

ঘুমিয়ে আছ অঘোব হযে
তাই তো থাক উপবাসী
ডাকি কত উঠে নাতো,
চখের জলে সদাই ভাসি!
. সোনার আমি যাদুমণি
ক্ষেত্র আমার সোনাব খনি
ভাতৃপ্রেমেব বিমল জলে
ধোও বে মায়ের মলারাশি।

বঙ্গদেশে স্বদেশী-ভাবনাব মূলসূত্রটি বঙ্গচ্ছেদের অন্তরগ্লানি থেকে উঠেছিল—তার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গচ্ছেদের অভিশাপ থেকে জাতি ও দেশকে যুক্ত করার জন্য **'বিদেশীবর্জন'**-**'বয়কট'** আন্দোলন **'স্বদেশী গ্রহণ'** পর পর একই সূত্রে **'রাখি বন্ধন'** ঘটিয়েছিল। সেই পরিবেশেব পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি গান রচনা করে নিজেই গেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের অন্তরকে দেশমুখী করার জন্য।

...কেন আর ভাবছ অত, দু'দিন থাক র'য়ে স'য়ে
এস ভাই থাক সবাই, মায়ের ছেলে মায়ের হয়ে।
স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়ো না ভাই দু'পাই দিতে
হার হ'বে না, যাবে জিতে, দেশে টাকা যাবে ব'য়ে।
ভয় কবো না চড়া দরে, সস্তা হবে দুদিন পরে,
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে। সস্তা কাপড় দেবে ব'য়ে।
কাজ কি বিদেশী ধাঁজে, ফক্কিকারী কিনে বাজে,
আঠা দিলে দেশের কাজে, কেউ তো ভাই যাবে না ক্ষয়ে।
প'ড়ে থেকে পরের পায়ে, পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে
মাথা দিতে আপন দায়ে, ভীরু যে সে পেছোয় ভয়ে।
দুখের তো নাই অবধি, দেখি কিছু হয় হে যদি,
সইবো কত নিরবধি, যা হবার যাক্ হ'য়ে ব'য়ে।

জাতীয়-জাগরণে সঙ্গীত-নাটক-কবিতা-প্রবন্ধের বিপুল প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্ম-সচেতন বোধের উদ্‌বোধন করার গভীর প্রত্যয় তখন সর্বস্তরের সাহিত্য-সেবীদের অন্তরের গভীর প্রয়াস আপনা থেকেই পথ করে নিয়েছিল। পরাধীনতার বেদনায় আপন সত্তার শক্তিকে সামনে এনে কার্যকর করতে যাঁরা এগিয়ে দিতে

এসেছিলেন তাঁদের অন্তর-শক্তির উত্তরণে জাতি সেদিন মেতে উঠেছিল সকল অনিবার্য প্রতিবন্ধতাকে অতিক্রম করে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাব পুরোধায়—তাঁকে প্রেরণার উৎস করে পরবর্তী সময়েও যাঁরা দেশাত্মবোধের ভাবনাকে সঞ্চারিত কবেছিলেন তাদের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়।

নব-জাগরণের বাতাবরনে সর্বদিক থেকে এক বিশাল আয়োজন—যা সে সময়ের সাহিত্যচর্চায় বেশী করে উল্লেখিত হয়েছিল। মূল ভাবনাটি ছিল—**বাঙালির চিত্তলোকে পরাধীনতার গ্লানিকে প্রচণ্ডতম আঘাত করে জেগে উঠার কথা বলা।**

গানে-নাটকে-হাস্যাত্মক কবিতায়, বিদ্রূপাত্মক নানা আয়োজনে বাঙলা-সাহিত্যের অঙ্গনকে দেশ ও দেশবাসীর চিত্তলোককে অভিষিক্ত করেছিল সবদিক থেকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল-অমৃতলাল বসু-রজনীকান্ত সেন-গোবিন্দচন্দ্র রায়-বিজয়চন্দ্র মজুমদার-প্রমথনাথ রায় চৌধুরী-গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশ-ভাবনার গভীরতায় বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে **দ্বিজেন্দ্রলাল** রায় হাসির গানে ও কবিতায় অন্ধ বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণ-পর্বকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে স্বজাতির ও দেশের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছেন। স্বদেশ, স্বদেশ বলে আসল-নকলের ছড়াছড়ি—তাই জাতীয় জীবনে স্বদেশভাবনার কার্যকর প্রভাবের অভাব দ্বিজেন্দ্রলালকে বেদনাবিদ্ধ করেছিল—

....নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা
চেঁচিয়ে ও সবার গলা ধ'রে গেল,
অন্য কিছুর দেখা ও যায় না শেষটা।
লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগানে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদ্‌ছে
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'
সবাই কিন্তু পায়ে ধরেই সাধছে।
কেউ বা খাসা নিজের থলে ভ'রে মিলে
দেশের নামে দিয়ে সবাই ধাপ্পা,
কেউ বা খাসা দু'পয়সা বেশ করে নিলে
বিদেশীয়ে দিয়ে দেশী ছাপ্পা!

জাতীয় জীবনের সুবিস্তৃত পরিমণ্ডলে 'বয়কট'-'স্বদেশী গ্রহণ' এই দুয়ের মতাদর্শে নানাভাবে জল্পনায় সরগরম। প্রকৃত স্বদেশ-ভাবনার জন্য জীবনকে যুক্ত করে এগিয়ে যাবার ব্যাকুলতা কোথাও কোথাও বেশ ধাক্কা খেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেই ছবি হাসির গানের মধ্য দিয়ে অন্তর-লোকের নিবিড়তম স্থানের রূপটিকে উদ্ধার করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মত অমৃতলাল বসুর হাসির গান একসময় সুস্থ মানসিকতার প্রোজ্জ্বলতায় বাঙালির চিত্তলোক আলোকিত হয়েছিল। স্বদেশ-ভাবনার নামে মেকী প্রেমের আসল ছবি ধরা পরে গেছে। অমৃতলাল বসুব 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্য দিয়ে দেশের প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিবেশ ও অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন একদিকে 'ইংরেজী' শিক্ষায় যেমন বাঙালির চিত্তলোকে নূতন নূতন চিন্তার আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল; আবার ইংরেজী শিক্ষার দানে বাঙালির চিত্তলোকে স্বদেশ আনুগত্যের অন্ধকারেব গভীরতা প্রকট হয়ে উঠেছিল ব্যাপকভাবে। এই দিকটাই অমৃতলাল বসুকে বেশী করে ভাবিযেছিল—তাই ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি বিদ্রূপের মাধ্যমে বলেছেন,

…… একশ বছর সমান টানে, মাতাল ছিলেন মদ্যপানে
বিলিতি বোতলে পোরা
গোরাব চোলাই করা সে সুধা, নামে তাব এডুকেশন।
সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাট্
পেন্ট্ কোট টাই সাট্
উঠিয়ে দিয়ে পূজা-পাঠ
ইংরিজি ঠাট, ইংরিজি লাট, ইংরিজি ফ্যাসান্।

ইংরেজী-আদব কাযদার অপরিচ্ছন্নতা জাতীয় জীবনের মূলধারাকে কলুষিত যারা করছেন অনবরত তাদের সম্পর্কে বাঙালি জাতিকে সজাগ সাবধান করার প্রয়াসে রজনীকান্ত সেনও হাস্য-বিদ্রূপের রসে জাতীয়-ভাবনার প্রেরণাকে সামনে তুলে আনার জন্য গান রচনা করেছেন।

……. যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে
আর 'স্যান্ট্গো' বলি শান্তিপুর' কে
'হ্যারি' বলে ডাকি 'হরি'রে।
…… তোরা যা কিছু একটা?
Ray, কি Siuha, কি Dass, কি Shanne
কি Duti, কি Dwwnkin; Show
সাফ্ করে মাথা Whisky চা' পানে
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে।
ছুটে যা বিলেতে Italy, Japan এ
(and) inspire your Country-men with awe!

বাঙালির আত্ম-পরিচয়-ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে স্বদেশ-ভাবনার শক্তিকে অনুরণিত করার প্রয়াসে গোবিন্দ চন্দ্র রায় বেশ কিছু কবিতা ও গান রচনা করেছেন। 'ভারতবিলাপ' ও 'যমুনালহরী' কাব্য দুটিতে অত্যন্ত আন্তরিক রসে বাঙালির চিত্তকে আপন সত্তার পরিমণ্ডলে সুস্থ-স্বচ্ছ প্রাণবায়ু দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিরোধ সমর্থতার সঙ্গে দেশ ও জাতির অতীত সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুভব করার

বাতাবরণের সে সময় ব্যাপক আয়োজন চলছিল। **বিজয়চন্দ্র মজুমদার** সহজাত কাব্য প্রতিভার ফাঁকে ফাঁকে দেশের জীবনযাত্রায় 'আরাম' তথা 'অনায়স সাফল্য-ভোট' থেকে যুক্ত হবার কথা বলেছেন। রাজনৈতিক ভাবধাবায় নিজেকে যুক্ত করার মধ্যে যে স্বার্থ অনিবার্যভাবে বর্জন করা দরকার নতুবা দেশ-সেবকের ভণ্ডামিই প্রকট হয়।

স্বাধীনতার বুলি আওরে নিজ-স্বার্থকে পরিপূর্ণ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন অনেকেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করার চরমপন্থীয় ভাবনাকেও দেশের যুব-শক্তির মনে জাগিয়ে তোলাব আযোজন ও ব্যাপকভাবে কবি-সাহিত্যিকদের লেখনিতে ধরা পড়েছে। আবার দেশের অতি অন্ত্যজ পল্লীতে যাদের জীবন, তাদের যুক্ত রেখে প্রয়োজনীয়তাকে গভীবভাবে উপলব্ধি করার কথাও বলা হয়েছে। ত্যাগ-জীবন দান করার ব্রতে সর্বস্তরেব মানুষদের আহ্বান না করলে দেশমাতৃকার পূজা সম্পন্ন হবে না। 'মাতৃপূজা' কবিতায় **কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত** স্পষ্টভাবেই বললেন,

বিশ্বময়ী মায়ের পূজা—মা যে দিবেন বব
এ পূজায় চাই মুণ্ড ডালি, আয় রে নারী নর!
নেত্র আপন দিয়া পায় দাশরথি পূজল মায়,
আমরা তো ভাই তিরিশ কোটি তারি বংশধর
রক্তজলে বিশ্বময়ীর চরণ রক্ত কর।

তখনকার সময়ের রাজনৈতিক তর্ক-বিচারে প্রতিদিনই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হত।

যুক্তি-বুদ্ধির খেলা

বৃটিশ শাসকের নিজেদের প্রতিরোধ আইনের ব্যাখ্যা দেশবাসীর কাছে তেমনভাবে আস্থা অর্জন করতে পারেনি। বঙ্গচ্ছেদের পরিকল্পনা থেকে তার পরবর্তী পর্যায়ে দেশজুড়ে যে আন্দোলন প্রবাহ তীব্র হচ্ছে তাকে দমন করার প্রয়াস থেকেই সন্ত্রাসের বীজ এখানে ওখানে তপ্ত হয়ে উঠছে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির সহজাত বাঁধনহীন প্রেম ও আবেগ—যা একটি জাতির জীবন চর্চায় প্রতিদিনের ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গঞ্জের বিচিত্র পরিবেশে।

চারিদিক থেকে নানাভাবে অন্তর-জাগরণের প্রচ্ছন্ন প্রবাহ ফল্গু ধারার মত আবেগ-জড়িত-দেশাত্মবোধের আর্তি মহিলা কবিদের মধ্যে ও অনুভূত হয়েছিল। **গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী** চেতনার স্বকীয়তায় বঙ্গচ্ছেদের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। 'মায়ের অঙ্গচ্ছেদ' যে কতবড় অভিশাপ সন্তানের পক্ষে তার উল্লেখে কবি তাই বলেছেন,

........ও ভাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে
ঘুরে বেড়াই দুয়ার দুয়ার।
........ঘর ভরা মোর সাধের ভাণ্ডার
চোরে ঐ নিল লুটিয়া।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'স্বদেশিনী', এই নামকরণে যে কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে 'দেশ-জননী'র অঙ্গচ্ছেদের বেদনাসিক্ত কান্নার সঙ্গে বিদ্রোহের, প্রতিরোধের সুপ্ত বাসনা ও প্রকাশিত হয়েছে। সারাদেশ জুড়ে 'বয়কট'-'দেশ-চ্ছেদ' তখন একমাত্র ভাবনা—সেই ভাবনায় দেশবাসীকে মথিত করার প্রয়াস চারিদিক থেকে এসেছিল। কারণ 'বঙ্গচ্ছেদে'র বেদনায় বিদীর্ণ চিত্তের ক্ষোভ-জড়িত-প্রকাশ স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনকার ঘটনায় প্রবাহিত। শুধু কান্না ও দুঃখ প্রকাশ নয়, নিয়মিত তা প্রতিরোধ করার পথও খোঁজা হচ্ছে—একমনে ও চিন্তায় বঙ্গচ্ছেদের দুর্দশা থেকে দেশকে মুক্ত করার সংকল্প ও নেওয়া হয়েছে—

.........নিত্য প্রাতে উচ্চারিত পণ
বাঁচাব দেশের শিল্প-দেশের জীবন!

এমনি গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ দৃঢ়তার কথা কবি **সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের** সেসময়কার কবিতায় আমরা পেয়েছি। বঙ্গচ্ছেদের বেদনা সত্য; কিন্তু তার জন্য চিন্তায় অলসভাবে দিন অতিবাহিত না করে বাস্তবোচিত প্রত্যক্ষতার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষজনদের তৈরী করে অগ্রসর হবার কথা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় দেখতে পাই। চাই ঐক্যবোধ, সংহতি যা জাতীয় চেতনার মূল ধারাকে শক্তিদান করবে—। 'বঙ্গচ্ছেদ' সেই সংহতি ও ঐক্যবোধের প্রেরণাকে বাঙালির চিত্তলোকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। কবি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। 'বঙ্গচ্ছেদের' জন্য আজ আর বেদনাভিভূত হবার কোন কারণ নেই 'বঙ্গচ্ছেদের' কষাঘাত নিদ্রালু বাঙালিকে এক হতে, আত্ম-শক্তির তেজে উত্তরণ হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। ঘরে বসে বসে ব্যবহারিক জীবনের স্বচ্ছান্দ্যময় পরিবেশ থেকে বাইরে, স্বদেশের কাজে যুক্ত হবার যে সুযোগ এসেছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। মিটিং মিছিল আর তর্কে নিন্দাবাক্যে আজ আর হজম করা চলবে না।

সুবেশ রাখাল বেশ সকল ভুলিয়া
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থানুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে—

দেশাত্ম-চেতনায় নানা দিক থেকে জাগরণের বাণী ও কর্মপ্রবর্তনার সূচী থাকলে ও প্রত্যেকটি দেশ-সেবকের আপন শক্তির, আত্মতেজের আহরণ করার মধ্য দিয়েই অর্থবহ প্রতিরোধ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় সেই আত্ম-শক্তি'র উদ্‌বোধনের জন্য পরবর্তী সময়ে অনেকেই বাঙালি-যুবকদের আহ্বান জানিয়েছেন—

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বললেন,

আত্মতেজে করি 'ভর
কর্মে হও অগ্রসর

'বঙ্গচ্ছেদে'র পরিণাম আর যাই হোক বঙ্গ-যুবকদের মধ্যে দেশ ও দেশমাতার প্রতি আকর্ষণ গভীরভাবে মনের মধ্যে এসেছে যা বলা যায় বঙ্গদেশের স্বর্ণযুগ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জাতীয় চেতনায় দেশকে বিশেষভাবে বঙ্গদেশকে অনুভব করেছেন জগৎদ্ধাত্রীরূপে। তাই শাসকের অনাচার অত্যাচার আর সহ্য নয়, নিস্তেজ হয়ে জড়তার গ্লানি বহন করা নয়। সচল হয়ে রক্ত চঞ্চল শক্তির বেগে দেশের শক্তিকে অনুভব করে আকুল হয়ে বললেন,

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশ,
ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস্ মা আবার তেমনি হাসি
চবণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগে রে
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে মা, রাগিয়ে দে মা নাগেরে।
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি
গৌরবিনী মূর্তি ধর শ্যামাঙ্গিনী-বঙ্গভূমি!

অন্তরে যে বেদনা 'বঙ্গচ্ছেদে'র—তার জন্য কবিরও কিছু করার আছে প্রতিবাদ করার। সেই প্রতিবাদে ক্ষোভ-সঞ্জাত আগুনের তাপ আছে সত্য কিন্তু 'আগুনই একমাত্র তা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বীকার করলেন না। একটা গভীর অতলস্পর্শী মানবপ্রীতির অন্বেষণে বিরোধের সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন কবি। হিন্দু ও মুসলমান—এদের মধ্যে কলহকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সতেন্দ্র নাথ দত্ত রাজনৈতিক বড় বড় প্রস্তাব ও তর্ক থেকে দূরে থেকে বঙ্গজননীর দু'সন্তানকে একই কোলে রাখার জন্য বললেন—

সত্য-পীর বলি সবে শিরে দিবে হাত
নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রাণপাত।

এটাই চিরন্তন সত্য। ধর্মের মূল সত্যের আলোয় কলহের, সকল বিরোধের অন্ধকার দূর হবে। অন্তরে অন্তরে মিলতে হবে তাহলেই সম্প্রদায়গত কলহের সকল শক্তি ব্যর্থ হবে। উভয়ের প্রীতিবোধেই দেশের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে—দেশ-প্রেম অটুট হবে।

গুগ্ গুল্ আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে
সত্য-পীরের প্রচার প্রথমে
মোদেরি বঙ্গভূমে!
পূর্ণিমা রাত্রি! পূর্ণ করিয়া
দাও গো হৃদয় প্রাণ!
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু মুসলমান।
পীর পুরাতন, নূর নারায়ণ
সত্য সে সনাতন
হিন্দু মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হন।

সতেন্দ্রনাথ দত্ত এনিয়ে বঙ্গবাসী নিচুতলার বলে যাদের মনে করে—'সেই শূদ্র, মেথর অবহেলিতদের' সামনে আনতে হবে—সকল সংস্কার চূর্ণ করে 'বঙ্গজননী'র শৃংখল মোচনে অংশ গ্রহণে যুক্ত করতে হবে; তবেই 'বঙ্গচ্ছেদের নায়কদের অহংকার এবং ছলনা খর্ব হবে।

সাধারণ মানুষের অন্তর-শক্তিতে দেশাত্মবোধের আকুতি জাগাতে সারা দেশ জুড়ে নানাভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গভীরভাবে কখনও প্রকাশ্যে কখনও অপ্রকাশ্যে লোকজীবনের নিত্যদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চেষ্টা চলছিল। 'স্বদেশ'—'শাসক', দেশানুভক্তি আর বিদেশী-অনুকরণ তথা গ্রহণ—বার বার বাঙালির চিত্রভূমিতে ঢেউ তুলে তুলে স্বদেশাত্মার পালে হাওয়া জাগিয়ে এগিয়ে যাবার বেগ জাগিয়ে অনেক কবি-প্রবন্ধকার গল্পকার ১৯০৪-০৫ থেকে ১৯০৭-০৮ পর্যন্ত্য অনলসভাবে নিয়মিত সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে **কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের** লেখায় দেশাত্ম-অনুশীলনের ঝাঁঝ ছিল অত্যন্ত সরাসরি এবং তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। মূল কেন্দ্রবিন্দু বাঙালীর যুবশক্তির অন্তরকে মনোহর ধাক্কায় দেশাভিমুখী করে তোলা আর শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরাগ জাগিয়ে তোলা। যুব শক্তির রক্ত প্রবাহে বিদেশী চণ্ডতাকে দণ্ড দেবার শক্তি অর্জনের জন্য নিজেদের তৈরী করার প্রবল প্রমত্ত আবেশে মাতিয়ে তোলা।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁর সৃষ্ট স্বদেশী সংগীতপ্রেমির সংকলিত বইটি কবি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। যদিও **'স্বদেশীসংগীত'** বইটি কাব্যবিশারদ তাতে 'যোগেন্দ্রনাথ শর্মা' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বিশারদের সংগীতগুলি তখন স্বদেশিয়ালীদের কাছে খুবই উত্তেজক প্রেরণায় প্রতিদিন স্বদেশভাবনায় সিক্ত হত। Nation in making এর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্বদেশী সংগীত পুস্তকটি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> Kaliprasanna introduced a new element into Swadeshi meetings which is now largely employed in our public demonstrations. They usually begin with some patriotic songs. appropriate to the occasion. Kavyavisarad had a fine musical talent. He himself could not sing but he composed songs of exquiste beauty, which were sung at the Swadeshi meetings and never Jailed to produce a proformd inpression. He had a natural gift of musical composition and though he had inperfect knowledge of Hindi, his Hindi Song (Des Ki e Kaya hatat) was one of the most inpressive of its kind...

স্বদেশ ভাবনার মাতোয়ারা প্রমত্ত প্রবল কাণ্ড ঘটেছিল পূর্ববাংলার বরিশালে বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে ঠিক অব্যবহিত পরেই। কালীপ্রসন্নবাবু সেই বরিশালের ঘটনার উল্লেখ করে অনেকগুলি উত্তেজক সঙ্গীত রচনা করে যুব-বৃদ্ধ-প্রায় সকলের অন্তর-তেজে বারুদের ছোঁয়া দিয়েছিলেন—

.... জাগো বরিশাল!

তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল
প্রাণ দিয়ে হুতাশনে
দেখা ও জগৎজনে
বিশুদ্ধ কনক-কান্তি-সৌর কর জাল॥
.... দেখিব তোমার শক্তি
দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব এব রবে কতকাল।।
বুঝিব দেশের তরে
কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙাল?
নিরখি আরক্ত নেত্র
প্রহরীর করে বেত্র
হারাবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে ইহ পরকাল?
ভুলিও না কোন ভয়ে
থাকিও যাতনা স'য়ে
ঝুলুক্ বঙ্গের শিরে খর করবালে॥

পলাশীযুদ্ধের কার্যকারিণতায় স্বাভাবিকভাবে বাঙলার মুসলমানরা ইংরেজের প্রতি বিরূপ মানসিকতার বশবর্তী হয়েছিলেন। কোনভাবেই ইংরেজের আধিপত্যকে সু-নজরে গ্রহণ করতে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুকূল বলে অনুভব করতে সর্বস্তরের মুসলমানের আপত্তি ছিল তীব্র।

এদিকে বাংলার বাতাস মুখরিত হতে লাগল রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত মানসিক চেতনার বায়ুমণ্ডলে যুক্ত। হলেন বিবেকানন্দ। চারিদিকে ভারতবোধ, ভারত-আত্মার অনুভবের অপ্রতিহত কর্মপ্রবর্তনার প্রবাহ। তাতে হিন্দু-মুসলমান একই সূত্রে গ্রথিত—ধর্ম বা আচার অনুষ্ঠানের কোন বাধা সেদিন আর তেমন করে পীড়িত করছিল না সাধারণ মানুষকে। এমনি বাতাবরণে মুসলিমদের মানসিকতাকে ব্রিটিশের প্রতি কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য শাসকদের গভীরভাবে চিন্তা হচ্ছিল। ব্রিটিশদের প্রতি মুসলিমদের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে ঘুরিয়ে হিন্দুদের উপর কিভাবে চালিত করা যায় তার পরিকল্পনায় লর্ড কার্জন ফন্দি আটলেন—বাংলাকে ভাগ করার। তাই মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, বিশেষ করে তখনকার মুসলমান রাজপুরুষ ও বাদশাদের বোঝাতে লাগলেন—বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি গরিমা ফিরে আসবে। প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলমানদের স্বনির্ভরতার দিক। স্বাভাবিকভাবে কিছু মুসলমান রাজপুরুষ, যারা অধিকাংশই ছিল নিজস্ব ধর্মানুশীলন ও আচরণে মৌলবাদী। তারা কার্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং স্ব-ধর্মের জাতিকূলকে প্রতিষ্ঠিত করার আশায় কার্জনের ফাঁদে পা

দিলেন—বঙ্গভঙ্গ কবাব শক্তি ও প্রেবণা কার্জনকে উল্লসিত কবল। ফলে মুসলিমসমাজেব সংখ্যাগরিষ্ঠবা 'বঙ্গভঙ্গ প্রতিবোধ' আন্দোলনের ধাবায় তেমন কবে যোগদান কবল না। শুধু তাই নয়। সার্বিক পর্যায়ে মুসলমানদেব সমর্থন পাবাব জন্য কার্জন পূর্ববঙ্গ-আসামে চযে বেড়ালেন এবং সর্বত্রই তিনি তাঁব প্রস্তাবিত বাংলা-ভাগেব মূলে আসাম ও পূর্ববঙ্গকে মুসলমানদেরই একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের দখল হবে। ঢাকার নবাবেব প্রাসাদে তিনি উপস্থিত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়েব একনাযকত্ব বক্ষা করা যায—তার বিবরণ দিযে বোঝালেন।

> .The centre and possibly the Capital of a new and self-sufficient administration, must give to the people of new state, by reason of their numerical strength and their superior culture He respondering voice, is the Province,

ঢাকাব নবাব সলিমুল্লা তাতে খুব একটা মাতলেন না। ঠিক তখনই কার্জন নূতন করে আরো একটা সিদ্ধান্ত জানালেন যে নবাবের আর্থিক অবস্থাব উন্নতিব জন্য কার্জন অত্যন্ত 'নামমাত্র সুদে বিপুল টাকা নবাব সলিমুল্লাকে দিতে সম্মত আছে। নবাব আর দ্বিতীয়বার ভাবলেন না—প্রসন্ন হয়ে কার্জনকে দরবারে বসিয়ে অভাবনীয তাদেরও মজলিসে আপ্যায়ণ করলেন এবং কার্জনের প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বার্থে সহমত পোষণ করলেন।

'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হল। পূর্ববঙ্গ-আসাম আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি হল।

নবাব সলিমুল্লা আপন প্রাসাদে বিট্রিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উৎসব কবেন এবং সেখানেই নবাবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল, **'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ'**। মুসলিম লিগের উদ্দেশ্যে বলা হল.

> ....among the Muslims of Indian the feeling of Loyality to the British Government and remove any misconception that may arise as to intention of the Government with regard to any of its measures.

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য মুসলমানদের গভীরভাবে বাধ্য করা হচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের দ্বারা প্রবর্তিত স্বদেশি আন্দোলন—বিদেশীদ্রব্য বর্জন—স্বদেশের শিল্প ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি প্রতিকূলতা ধর্মীয় সূত্রে গ্রথিত করে প্রচার হতে সময় লাগল না।

এই ভাবনার কথা মনে রেখেই সেদিন বিশারদ মহাশয় ব্যঙ্গ করে মুসলমান মৌলবাদীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন :

> এখন মুসলমানের ইমান কোথা,
> নাছারার বাহার
> দেখি, খোদাতালার বাহার পরে
> দেল্ রাখে না কেহ আর।

ফোতো নবাব মস্ত ধিঙ্গি
খন্ বাহাদুর গাঁয়ের সিঙ্গী
নামের লোভে কাম ছেড়ে সব
দেনা করে দেয় বাহার।
আখেরর সব ভাবনা ভুলে
জাতি ভাইকে ফেলছে তলে...
...কি লোভে সব ভয়ের গলায়
অন্ধ হয়ে ছুরি চালায়
আখেরে খান্সামাগিরি
বড়জোর ছব্রেজিস্টার
...দু'দিন আগে কি ছিলে ভাই,
দেলের মাঝে ভাবো না তাই
খানা বিনা কেটেছে দিন
বাঙালায় কার বাপ্-দাদার?
...কোথা থেকে কারা এসো
লুটে নে যায় নিজের দেশে
বাইরের চটকে লালছ
আমাদের কই হাট-বাজার?
...সায়ের বলে জেগে দেখো—
নয়ন কেন মুদে রাখ
যে মাটিতে পরদা হলে
সেই মাটি সার দুনিয়ার।

স্বদেশী আন্দোলনে অনেক অনেক মহারথীর উদ্দেশ্যে দেশের স্বাভাবিকতাকে স্মরণ করিয়ে কবি রাজকৃষ্ণ একটি গানে লিখলেন,

মন্ বসে না দেশের হিতে
বাগান ভোজে যাওরে ম'জে
গরিবগুলি পায় না খেতে।
গেজেটে নাম উঠবে বলে
টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও
ক্ষুধিত বসে খালি পাতে।
হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে।
কাজের বেলায় কাণা হ'লে
দেশটা গেল অধঃপাতে।

॥ বার ॥

শৃংখলিত মাতৃচরণে মৃত্যুহীন মরণের রক্ত-জবায় অভিষেক

কিংসফোর্ড বাংলার স্বদেশ-ব্রতীদের তথা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চাবণদেব নানাভাবে, বিশেষ করে মামলায়, হেনস্থা, অপমান এবং অত্যাচার করার নেতৃত্ব দিয়েছিল।

দামাল স্বদেশী প্রফুল্লচাকী স্থির করল, সে কিংসফোর্ডকে মারবে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ ইহাকে সমর্থন জানাল। সেইমত হেমচন্দ্র দাস ও উল্ল্যাস বোমা তৈরী কবল। কিংসফোর্ডকে মারার জন্য প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামকে জানিয়ে দেওয়া হল। আত্মবক্ষাব জন্য ওদের হাতে রিভলবারও দিয়ে দেওয়া হল 'আত্মহননের জন্য।

কিংসফোর্ড তখন কলকাতা ছেড়ে মজঃফরপুরে জর্জ হয়ে এল। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে এল। এর আগে কলকাতায় কিংসফোর্ডকে মারার জন্য প্রফুল্ল ও সুনীল সেন চেষ্টা করেছিল।

প্রফুল্লের পিতা বিহারের বগুড়ার রাজনারায়ণ চাকীর পঞ্চম ছোট সন্তান। ধর্মভীরু শান্ত পরিবার। কোমল নম্র অথচ স্বপ্নালু প্রফুল্লেব চিন্তায় ও মননে নামের তাৎপর্য তেমন ছিল না। কার্লাইল সারকুলার জারির সময় থেকেই প্রফুল্ল ক্ষিপ্ত-সার্কুলারে বর্ণিত রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও রংপুরে যে সকল ছেলেরা সারকুলার অমান্য করেছিল প্রফুল্ল তাদের মধ্যে একজন। বৃদ্ধা মা'র হাত দুটি দরে আপন গোপন সংকল্প পূরণের আশায় শেষ প্রণাম জানিয়ে গৃহত্যাগ করে প্রফুল্ল। বৃদ্ধা মা ততটা প্রফুল্লের সংকল্প জানতেন না। প্রফুল্ল ঘর ছাড়ল-বৃদ্ধা মাকে পত্রে জানাল,

> ...তুমি ভেবো না, মা, আমি একটুও কষ্টে নেই, কোন অস্বাচ্ছন্দ নেই আমার। আমি ব্রহ্মচর্য আশ্রম অবলম্বন করেছি। ধর্মপথে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই...

বৃদ্ধা মা আশ্বস্ত হলেন-অনেকটা সহজ সংস্কারে গর্বিতা হয়েছিলেন।

ক্ষুদিরাম, বয়স ১৬-১৭। সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা। ঘটনার ২-৩ বৎসর আগে থেকেই পড়ার পাঠ চুকিয়ে দিতে হয়েছে। সে সময় থেকেই স্বদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ-ফুট ফরমাস জোগান দিতে ভাল লাগত। মাতৃহারা-পাঁচ বৎসর বয়সে। ভাই নেই, কাকা-মামা কেউ নেই। তবে এক দিদি-জামাইবাবু অমৃতলাল রায় ক্ষুদিরামের স্বদেশীদের সঙ্গে চলাফেরা পছন্দ করতেন না। তাই জামাইবাবু ক্ষুদিরামকে বাড়ীতে থাকতে দিলেন না। ক্ষুদিরামের সেই থেকেই এখানে ওখানে কখনও তাঁতশালায় রাত্রি যাপন। স্বদেশীভাবনায় ইস্তাহার প্রচার করাই মুখ্য কাজ ক্ষুদিরামের। এমনি একটি সরকারী কৃষি-প্রদর্শনীতে ইস্তাহার প্রচারে পুলিশের নজরে এল ক্ষুদিরাম। রাত্রে তাঁতশালায় সারাদিনের ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে রাত্রের খাবার সময় পুলিশ এল-ধরল-তারপর রাজদ্রোহের অপরাধে তড়িঘড়ি দায়রা সোপর্দ করল ম্যাজিস্টেট। কিন্তু

অদৃশ্য কারণে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা তুলে নেওয়া হল।

১৯০৮ এর জানুয়ারী থেকে ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর ছাড়া। প্রফুল্ল চাকী (দীনেশ চন্দ্র রায়) ও বেপাত্তা বেশ কিছুদিন-কেউ জানে না-কিন্তু জানেন কেউ কেউ। জীবনের মহত্তম তিলকে শোভিত হবার জন্য একটি বিশেষ কাজে দায়িত্বে ওরা ধ্যানস্থ।

ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী এই নামের মানুষকে চিনতেন না জানতেন দীনেশচন্দ্র রায় নামে। দীনেশচন্দ্র রায়ের আর একটি নাম ছিল দুর্গাদাস সেন।

চার পাঁচদিন ওরা দু'জন কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য গভীরভাবে পরামর্শ করত। কিংসফোর্ডের বাড়ী ও তার আশেপাশে বেশ কয়দিন ওরা দু'জন ঘুরেছে-সন্ধ্যায় কিংসফোর্ড যখন বেরোতেন এখন ওরা দূর থেকে লক্ষ্য করত। ক্ষুদিরাম ও দীনেশ (প্রফুল্ল)-ওদের উভয়ের কাছেই রিভরবার থাকত। সেসময় দীনেশের কাছে বোমা থাকত ক্ষুদিরামের কাছেও রিভলবার থাকত।

সন্ধ্যায় কিংসফোর্ডের যাওয়া-আসায় রাস্তায় নজর রাখতো উভয়ে। তিন তিনবার দেখা হয়েছে কিন্তু সুবিধে মত হয়নি-শেষের রাত্রিটাতে হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। উভয়ে ময়দানের একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে-দেখা গেল ক্লাব থেকে একটা গাড়ি বেরুচ্ছে-ভাবল কিংসফোর্ডেরই গাড়ী। ক্ষুদিরামের গায়ে তখন ডোরাকাটা একটা কোট-আর দীনেশের গায়ে ছিল একটা সিলকের বড় কুর্তা। দীনেশ হঠাৎই কুর্তাটা খুলে ক্ষুদিরামের হাতে দিয়ে দেয়। উভয়েই পায়ে জুতো ছিল। দু'জোড়া জুতো গাছের নিচে রাখা হল। ঐ গাড়ীকে লক্ষ্য করে বোমা দীনেশের হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়বার জন্য ক্ষুদিরাম ছুটে সামনে গেল,—দীনেশের অবস্থান তখন ক্ষুদিরামের নজরে নেই। সে ভাবল গাড়ীতে কিংসফোর্ড-স্পষ্ট দেখা গেল না গাড়ীতে কে বা কারা-কতজন। অন্ধকার রাত্রি-বোমা ছুঁড়ে দিল। বোমা ছোড়ার পর পরই ক্ষুদিরাম ও দীনেশ একসঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম রেল লাইন দরে কিছুটা গিয়েই সমস্তিপুর রোড ধরে বরাবর চলতে লাগল।

এদিকে বোমার শব্দে চারিদিকে পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের ছুটোছুটি শুরু হল। ময়দানে ঢাকনাসহ তামাকের টিন পড়ে থাকতে দেখে, গাছের নীচে ফেলে যাওয়া জুতোগুলি দেখে, ফেলে যাওয়া চাদর-এ সব নিয়ে নিল পুলিস। তদন্ত শুরু হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়ে ফতে সিং রাত একটায় (১লা মে) ট্রেনে রওনা হল। ওয়েইনি স্টেশনে পুলিশের লোকেরা নেমে গেল পরবর্তী আর একটি ট্রেন ধরার জন্য। ওয়েইনি স্টেশনের ধারে একটি দোকানে একটি যুবক জল পান করছে-তদন্তকারী পুলিশরা তা দেখল এবং আততায়ীদের চেহারার যে বর্ণনা ওদের দেওয়া হয়েছিল সনাক্ত করার জন্য-তার সঙ্গে একজনের বেশ মিল দেখতে পেল। পুলিশ উৎসাহে ভর করে সেই জলপানকারী যুবককে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, কোথা থেকে আসা হচ্ছে! জিজ্ঞাসিত যুবক বলল, আসছি পূব থেকে, যাব বাঁকিপুরে।

পুলিশ বলল, এখানে কেন নামলে আপনাকে তো মজঃফরপুরে ট্রেন বদল করতে হত।

যুবকটি বলল, মুড়ি খাচ্ছিলাম, খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল তাই ঐ দোকানের কাছে জল দেখতে পেয়ে জল খেতে নেমেছি। বলাটি শেষ করেই যুবক দ্রুত দৌড়ে পালাতে গিয়েই কোমর থেকে আচমকা রিভলভারটি মাটিতে আছাড় গিয়ে পরে গেল। পুলিশের লোকেরা ছুটে গিয়ে যুবকটিকে ধরে ফেলল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। তার পকেট থেকে অনেকগুলো কার্তুজ; ২টি রিভলবার; চেনসহ একটা ঘড়ি; রেলওযে ম্যাপের কাটিং; মোমবাতি; দেশলাই ও একটা শিল্কের কুর্তা। পুলিশবা ক্ষুদিরামকে ধরে নিয়ে গেল স্টেশন গ্রামেব জেলা ম্যাজিস্টেটের কাছে।

এদিকে সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুর থেকে ট্রেনে যাবার সময় বাঙালির বোমা ছোঁড়ার ঘটনা জানতে পারলেন ১লা মে তাবিখ। সমস্তিপুরের ট্রেনের কামরায় নতুন পাঞ্জাবী, নতুন ধূতি, নতুন পাম্পস্ খালি মাথায় একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। পুলিশের প্রেরিত বর্ণনা অনুসারে নন্দলাল ব্যানার্জীব মনে হচ্ছে মজঃফরপুরের আতাতায়ীদের কেউ হবে। তাই কড়া নজর রেখে আলাপ জমাতে সচেষ্ট হবার আগেই নব্যযুবক নন্দলালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—গাড়ী কখন ছাড়বে! নন্দলাল বাবুর ইচ্ছাপূরণ হ'ল; তিনি উৎসাহিত হয়ে যুবকের সঙ্গে আলাপচারিতায় যুক্ত হলেন। নব্য যুবকের গন্তব্যস্থানের টিকিট মোকামাঘাট। নন্দলাল বাবুও নব্যযুবক একই কামরায়—'। অনেক কথার ফাঁকে নন্দলাল যথাস্থানে 'তার' মারফৎ যোগাযোগ করে যুবকের গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করছে। ঠিক সেইসময় নব্যযুবক কামরা পরিবর্তন করতে যাবার মুখে নন্দলাল ব্যানার্জী দ্রুত যুবকটির সামনে এসে বলল, ''আমি আপনাকে সন্দেহ করি' এই বলে যেই নবযুবকটিকে ধরতে যাচ্ছে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ গতিতে যুবক দৌড়ে পালাতেই সামনের দিকে একটি রেল পুলিশ কনস্টেবলকে দেখে যুবক গুলি করল। পরপর গুলির সঙ্গে প্ল্যাটফরমে অন্যান্য পুলিশ জড় হয়ে যুবকটিকে ধরে ফেলল এবং ক্লান্ত যুবকের উপর তথা পুলিশের নির্মম লাঠির আঘাত পরতে লাগল। অবশেষে যুবক হাত দুটি বুকে চেপে ধরে উন্মুখ রিভলবারের পর পর দুটি গুলি নিজের মাথায় ছোঁড়ে—অতি দ্রুত পর পর। মৃত্যু হাত বাড়িয়ে যুবকটিকে কোলে তুলে নিল—। মৃত্যুর আগে সেই যুবক, নন্দলালকে বলল, হায়! হায়! তুমি বাঙ্গালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দিলে?

আত্মহননের দেহটি সনাক্ত করা হল—মৃত যুবক, প্রফুল্ল চাকী। পবিত্র দেহ থেকে পুলিশ মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে স্পিরিটের বড় পাত্রে ডুবিয়ে কলকাতায় লালবাজারে পাঠিয়ে দিল। বগুড়ার একটি গ্রামে প্রফুল্লের কাটামাথার সংবাদ এসে গেল—উপবাসক্লিষ্ট দিদি ঘরেব দরজা বন্ধ করে দিয়ে মহাভারতের অভিমুন্য বধের উপাখ্যান পড়ছিলেন। সজোরে কান্নাকে অন্তরের তীব্র আকুতি দিয়ে স্তব্ধ করে বারবার পড়ার মধ্যে থেকে উচ্চারণ করে বললেন 'বন্দেমাতরম্‌'-বন্দেমাতরম্‌, বন্দে-মাতরম'। সময়টা ১৯০৮ সন।

দিকে দিকে বাঙলার শহরে-গ্রামে বার্তা রটে গেল—ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী এদের যারা ধরেছে তাদের ইংরেজ পুরস্কার দেবে—সেইমত ১০ই মে তারিখে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠানও হ'ল—ঘোড়ায় চেপে এসেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইউনিয়ন জ্যাক পত্‌পত করে উড়ছিল—য়ুরোপীয় দেশী পুলিশের বিপুল সমারোহ হল। নন্দলাল ব্যানার্জী ১০০০৲ টাকা সহ আরো সহযোগীরা পুরষ্কৃত হলেন।

এপ্রিল, ১৯০৮। সাত মাসে পরে ১০ই-নভেম্বর-কলকাতার মুচিপাড়া থানার সার্পেনটাইল লেন।

শিব মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে ওঁরা দু'জন—রণেন গাংগুলি ও শ্রীশ পাল বাদাম খাচ্ছে। ওঁদের হাতে দুটি রিভলবার আর সায়নাইড মাখানো দুটি ছোরা। সোমবার, ৭-৭।। টা নাগাদ সেই নন্দলাল ব্যানার্জী সি-আই-ডি সাব-ইন্সপেক্টার সুকুমাব ব্যানার্জীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটি চিঠি ডাকবাক্সে ফেলতে এল। পিছু পিছু দুটি ছায়ামূর্তি—তিনটি গুলি পরপর বিদ্ধ করল নন্দলালকে, লুটিয়ে পড়তেই রণেন গাংগুলি মৃত্যু সুনিশ্চিত করতে লুটিয়ে পড়া নন্দলালের মাথায় রিভলবার উঁচিযে মারল। প্রথম গুলি করেছিল শ্রীশ পাল। 'আত্মউন্নতি সমিতি' এবং "মুক্তি সঙ্ঘের সদস্য ওরা।'

রণেন জামাকাপড় ছেড়ে পাশের দর্জির দোকানে সার্ট তৈরী করতে দিয়ে সটান চলে যান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে দেবার জন্য।

* * * *

এদিকে ক্ষুদিরামের মামলা চলছে—ধরা পরার পর তিনজনের কাছে তিনটি বিকৃত তথ্য দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। কোন উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে এল না। নিজেই স্বদর্গে বললেন, হ্যাঁ, আমি বোমা ছুড়েছি, আমি অপরাধী। এই স্বীকারউক্তি না করলে কোনভাবেই ক্ষুদিরামের শাস্তি হত না।

ঘটনাটি ঘটেছে 'তখন ঘোর অন্ধকার রাত্রি—কাছাকাছি একজন আরেকজনকে দেখা যায় না। গাছের ছায়ায় অন্ধকার আরো গভীর—ঘটনার সময় কোন পুলিশ বা পাহারাদার কেউ সেখানে ছিল না—গাড়ীর চালকের দৃষ্টি সামনে, সহিস পেছনে এমনি পরিস্থিতিতে অন্ধকারজড়িত ছায়ামূর্তি ২টি বোমা ফেলেই দৌড়! দৌড়ল কারা-কেউ দেখল না—কেউ জানতেও পারল না। অথচ ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি অন্ধকার ভেদ করে সত্যকে প্রকাশ করতে এতটুকু ভীত হন নি তিনি; 'হ্যাঁ, আমি বোমা 'ছুড়েছি-আমি দোষী।'

পরবর্তী সময়ে দায়রা আদালতে ক্ষুদিরামের হয়ে লড়েছিলেন মজঃফরপুরের উকিল কালীদাস বসু।

* * * *

নানাভাবে ক্ষুদিরামের অপরাধকে যাতে কোনভাবেই বিচার্য হয় তা চেষ্টা চলছিল। কেউ দেখেনি ক্ষুদিরাম বোমা ছুঁড়েছেন—কিন্তু ক্ষুদিরামের 'সত্য' প্রকাশ—'হ্যাঁ, আমি বোমা ছুঁড়েছি—আমি অপরাধী—তাতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪নং ধারা গভীরভাবে

আরোপিত করলেন জজ তাঁর রায়ে।

....সুতরাং একমাত্র পারিপার্শ্ব ঘটনাক্রম থেকে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করতে আমার কোন দ্বিধা নেই....

....ক্ষুদিরাম যদি নিজে বোমা নাও ছোঁড়েন, যিনি ছুড়েছিলেন, তাঁর সঙ্গী ছিলেন ক্ষুদিরাম নিজে. ..তাই তাব দোষ ও বিচারের যোগ্য।

অবশেষে ৩৪নং ধারা মতে জজ ১৩ই জুন ১৯০৮, ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হল হাইকোর্টে বিচারপতি ব্রেট ও বিচারপতি রিভসের সামনে। কিন্তু সেই আপীলে ক্ষুদিরামের অপরাধ অস্বীকার করা বা জড়িত থাকার কোনটাই উল্লেখ ছিল না। বলা হয়েছিল, প্রফুল্ল চাকীকে রেহাই দেবার জন্য ও তাঁর পরামর্শমত ক্ষুদিরাম বাধ্য হয়ে বিবৃতি দিয়েছেন আর ক্ষুদিরাম পিস্তল ব্যবহার করতে এবং বোমা ছুঁড়তে জানতেন না। অবশেষে আপীলের বিচারপতি দু'জনই আপীলের উল্লিখিত কারণগুলি মান্য করেন নি, অগ্রাহ্য করে দায়রা জজের রায়ই বহাল রাখে; ১৩ই জুলাই ১৯০৮ বলা হল, 'মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদিরামের কণ্ঠে ফাঁসী দেওয়া হোক; ফাঁসির দিন স্থির হয়েছিল ৬ই অগষ্ট—কিন্তু, জেল সুপারের সৌজন্যে ও উকিলের সহযোগিতার 'দণ্ড মুকুবের আবেদন পেশ করায় তারিখ, ৬ই অগষ্ট, পিছিয়ে দেওয়া হল।

মেদিনীপুর থেকে একজন বৃদ্ধা ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—কিন্তু অনুমতি পান নি।

অবশেষে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিন স্থির হল ১১ অগস্ট।

> ।। মজঃফরপুর, ১১ই অগষ্ট : সকাল ছ'টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল। দৃঢ়পদে প্রফুল্লচিত্তে তিনি ফাঁসীমঞ্চে উঠে যান; মাথার ওপর টুপিটা যখন টেনে দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর ঠোঁট জোড়া জুড়ে ছিল স্মিতহাসির দীপ্তি। বাবু কালিদাস বসুর প্রার্থনামত গণ্ডকের তীরে নিঃশব্দ অন্ত্যেষ্টি হল; শব বাহকের সংখ্যা বিশেষ ছিল না; কোন হৈ-চৈ হয়নি; রাস্তার দু'পাশেই পুলিশের সারি-জনতাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল।"

।। তের ।।

।। আগুন ছড়িয়ে গেল ।।

জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী : পরিকল্পনা হল, বাঙলার লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের- সময়টা ১৯০৮-এর ৮ নভেম্বর। কলেজস্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে ওভারটুন হল (ওয়াই. এম. সি)। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন—সন্ধ্যায়। সে সভায় সভাপতির করবেন লাট ফ্রেজার। অনেকেই এসেছেন বার্টনির বক্তব্য শোনবার জন্য। বিশেষ করে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়। বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে এণ্ড্রু ফ্রেজার এলেন এবং অত্যন্ত খোস মেজাজে

দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যেতেই একটি বাঙালি যুবক অতি নিকট থেকে জামার নিচে সযত্নে রাখা রিভলবার ফ্রেজারের বুক নিশনা করে ট্রিগার টিপল—কয়েকবার কিন্তু রিভলবার থেকে গুলি বেরোলো না—যুবকটি ধরা পড়ল—ধবস্তাধ্বস্তি হল—হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল। যুবকটিকে আটক করা হল।

বাঙালি যুবক শ্যামপুকুর এলাকার ৫নং চৌধুরী নিজের জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শক্তিমান। বিচারে বর্ধমানের মহারাজা সাক্ষী দেন এবং ধৃত যুবকটিকে সনাক্ত করেন। দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হল।

জিতেন্দ্রনাথকে জেরা করে অনেকজনের নাম পুলিশ জানতে পারল—কিন্তু প্রমাণের অভাবে তেমন কিছু সাজা না হলেও সেই রেগুলেশন আইনে নির্বাসন হল অকারণে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী; কৃষ্ণকুমার মিত্র; শচীন্দ্র কুমার বসু, পুলিনবিহারী দাস; ভূপেশচন্দ্র নাগ,; অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খবরে খবরে রোষলিপ্সা নানাভাবে জ্বলে উঠতে লাগল—প্রতিশোধের-প্রত্যাঘাতের আকাঙ্খা টগ্‌বগ্‌ করছে দেশব্রতী যুব-সম্প্রদায়েব অন্তরে।

বৃটিশ সরকারের হয়ে যারা মদত দিয়ে বাঙলার যুব-শক্তিকে তছ্‌নছ করছে তাঁদের সে যেই হোক, নিধন করার পরিকল্পনা হল। বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে নগরে-শহরে এমনি মানসিক কর্মভাবনায় সমিতি গড়ে উঠতেই ঘরের ছেলেদের জেলে পুরে দিয়ে পুরষ্কার পাবার লোভ যখন তীব্র হয়ে উঠল অনেক ইনফমার-উকিলের তখনই আরো ক্ষিপ্ত প্রতিশোধস্পৃহায়।

চারুচন্দ্র বসু : এমনি এক সরকারী উকিল—আশুতোষ বিশ্বাস। তাঁকে নিধন করার ভার পড়ল যুবক চারুচন্দ্রের উপর। চারুচন্দ্র বসু—বহুদিন ধরেই গায়ের কাপড়ে রিভলবার লুকিয়ে রেখে পথে পথে ঘুরে সন্ধান করতে লাগলো—সেই বেইমান উকিল আশুতোষের। আলিপুর পুলিশ কোর্টে কয়েকবার আশুতোষকে দেখেছে চারুচন্দ্র। কিন্তু মনমত অবস্থা পাচ্ছে না। হতাশ না হয়ে বেশ কয়েকদিন চারুচন্দ্র নজরে রাখছে আশুতোষকে অবশেষে একদিন পাশাপাশি, আগু-পিছু চলতে চলতে রিভলবারের অর্ব্যথ নিশানায় লুটিয়ে পড়লো আশুতোষের নিথর রক্তাক্ত দেহ।

পুলিশ চারুচন্দ্রকে ধরে ফেললো। ধরা পরার আগেও পুলিশকে লক্ষ্য করে রিভলবার টিপেছিল।

কলকাতায় চারুচন্দ্র বসু ১৩০ নং রসা রোডে থাকতেন। ধরা পরার পর সে স্পষ্টভাষায় বলেছিল—আমি দেশব্রতী-দেশের জন্য আমার মনপ্রাণ দিয়েছি, আমার উপর ভার পরেছে আশু হত্যার। আশুতোষ বিশ্বাস দেশের শত্রু। দেশের শত্রুকে নিধন করাই আমার ব্রত।

চারুচন্দ্র বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিয়োগ করলেন না। তাঁর চোখে ক্ষুদিরাম কণ্ঠে ক্ষুদিরামের বাণী; তাই মাথা উঁচু করে এজলাসে দীপ্তকণ্ঠে বললেন,

আশুর মৃত্যু আমার কাছে গৌরব কাজ! এটা আমি জানি, তার জন্য আমার ফাঁসী হবে—এটা জেনেও—ভয় পাই না।

ফাঁসির হুকুম হওয়ামাত্র চারুচন্দ্রের চোখদুটো উজ্জ্বল, আরো তেজদীপ্ত হয়ে উঠল। ফাঁসির হুকুম শুনেই বলল, কালই তো! আমার তর সইছে না। দ্রুত ফাঁসি দিন!

চারুচন্দ্রের আন্তরিক কথায় হাকিম স্তব্ধ হলেন—কিন্তু তাঁর জারি করা হুকুম নড়বার নয়। ফাঁসির হুকুম বহাল এবং ১৯শে মার্চ চারুচন্দ্রের ফাঁসি হয়ে গেল।

বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত : ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরপরই কলকাতার মানিকতলার বাগানবাড়ির ঘেরাও-ধবপাকড়ে বহু যুবকের বিরুদ্ধে মামলা। সেই মামলার সরকারী তদারকীতে ছিলেন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ড অব পুলিশ সামসুল আলম। খুব তেজী এবং রাজভক্ত বেইমান। কোর্টের কাজ সেরে সেদিন (২৪ জানুয়ারী ১৯১০) বিকেল পাঁচটায় বাড়ী ফিরছিলেন সামসুল আলম। সামনে এডভোকেট জেনারোল জি. এইচ. বি. কেজবিক আর পেছনে তাঁর দেহরক্ষী। সামসুল জেনারেলের পেছনে পেছনে চলেছেন—দেশরক্ষী ও সামসুলের মধ্যবর্তী স্থানে একটি যুবক দ্রুত রিভলবার হাতে সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন,'.....Are you Mr. Alam? উত্তর এল 'Yes'? সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্বরে যুবক বললেন, There take your reward! এই বলে মুহূর্তের মধ্যে যুবকটি রিভলবার তুলে আলমের গা ছুঁয়ে রিভলবারের ঘোড়া টিপে দিলেন।

'রিভলবারের শব্দে এবং আলমের চিৎকারে পুলিশ এসে যেতেই যুবকটি তার হাতের রিভলবারটি পুলিশের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, গুলি কর। গুলি কর।

পুলিশ হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। যুবক ধরা দিলেন। বয়স ১৮-১৯। চীপ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট যুবককে দায়রায় সোপর্দ করলেন। যুবক বীরেন্দ্রনাথ উকিলের প্রয়োজন নেই বলে জানালেন। জুরি-সাজ সহমতে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের মৃত্যুদণ্ড রায় হল। রায় শুনে উদ্‌ভাসিত বীরেন্দ্র দ্রুতপায়ে হাসতে হাসতে কয়েদীগাড়ীতে উঠলেন—চিৎকার করে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বিনিময় করলেন সারাটা রাস্তার। ২১ ফ্রেব্রয়ারী ফাঁসি হয়ে গেল বীরেন্দ্রনাথের।

সামসুল আলমের হত্যায় প্রশাসন স্তম্ভিত-হতবিহ্বল। এই হত্যার পশ্চাৎপটে কারা জড়িত তার সন্ধানের জন্য চলল গভীর অনুসন্ধান।

।। চৌদ্দ।।

।। ললাটে মুক্ত তরবারির রক্ত ঝরার প্রতিজ্ঞা।।

অনুশীলন চাই, সংগঠন চাই-সংহতি চাই

কলকাতায় মদন মিত্র লেনে সতীশচন্দ্র বসুর ব্যায়ামগারে দোল পূর্ণিমার দিন সোমবার (১৩০৮ ১০ চৈত্র; ১৯০২-২৪ মার্চ) অনুশীলন সমিতি নামে একটি সংগঠন তৈরী হয়। উদ্দেশ্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ-ও ভাবকে জাতীয় চরিত্রে সুস্থ ও ত্যাগী যুবকদের দেশব্রতে উৎসাহিত করা। শরীর চর্চা এবং দেশসেবায় আত্মোৎসর্গের আদর্শ সে সময় যুব-শক্তির কাছে খুবই গভীর চিন্তার জোয়ারে উদ্বেলিত কলকাতা।

তিন বৎসর পর-বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনের কিছু পরেই ১৯০৫-৩রা নভেম্বর; অনুশীলন সমিতির একটি শাখা হয় ঢাকায়। ঢাকায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মধারা কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করার জন্য কলকাতা থেকে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল গেলেন। গভীরভাবে যুব-শক্তির কি আচরণ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বক্তব্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। পুলিনাবিহারী দাশের নেতৃত্বে ৮০ জন যুবক দেশসেবা মন্ত্রের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়ভাবে সম্মতি জাগান।

৮০জন যুবক হাঁটু গেড়ে বসলেন পি. মিত্রের সামনে। পি. মিত্র একটি উন্মুক্ত তরবারির সম্মুখভাগে প্রত্যেকটি যুবকের কপালে স্পর্শ করিয়ে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা কাজ সম্পন্ন করলেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্তানরা কায়মনবাক্যে এক সঙ্গে মায়ের ধ্যান করতে করতে বললেন, আজ থেকে দেশের সেবায় নিজেকে যুক্ত করলাম—প্রয়োজনে আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত থাকব।

সেই ৮০জনের অধিনায়ক হলেন অসাধারণ দক্ষ নেতা পুলিনবিহাবী দাশ।

'বন্দেমাতরম' একমাত্র বীজ মন্ত্র—মা কেমন ছিলেন, মা কেমন আছেন—আর মা কি হবেন সেই চিন্তায় কর্ম ও ভাবময় দীক্ষাপ্রাপ্ত ৮০জন যুবকের একমাত্র ধ্যান একমাত্র আলোচনা। 'মা'কে জাগাতে হবে—স্বাধীনতার জন্য নিজেকে মাতৃচরণে উৎসর্গ করতে হবে। দেশ জননীই একমাত্র পরম আত্মীয়-একমাত্র আপন এই বোধের উদ্বোধনে সকলেই তৎপর।

'অনুশীলন সমিতির' দীক্ষা প্রতিজ্ঞা ছিল ৪ রকমের। আদ্যপ্রতিজ্ঞা-অন্তপ্রতিজ্ঞা-বিশেষ প্রথম প্রতিজ্ঞা-বিশেষ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। 'মা' কালীর মূর্তির সামনে সকলের প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করা হত।

আদ্যপ্রতিজ্ঞা :

সকলে সমস্বরে বলতেন—আমি কখনো এই সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হব না—আমি সর্বদাই সমিতির নিয়ম অনুসরণ করে চলব-কোন প্রতিবাদ না করে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করব—আমি নেতার কাছে কোন কিছু গোপন করব না এবং তাঁকে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না।

অন্তপ্রতিজ্ঞা :

আমি কারও কাছে সমিতির কোন গোপন বিষয় প্রকাশ করব না এবং অপ্রয়োজনে তা নিয়ে আলোচনা করব না। কর্তাকে না জানিয়ে আমি কোথাও আপনইচ্ছায় যাব না। কোন সময়ে আমি যদি কোথাও আটকা পড়ি তৎক্ষণাৎ পরিচালককে তা জানাব। আমাদের সমিতিতে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝতে বা জানতে পারি কালবিলম্ব না করে পরিচালককে বিস্তারিত জানাব। এবং এর প্রতিকারে পরিচালকের নির্দেশ তৎক্ষণাৎ পালন করব। যে কোন অবস্থায় পরিচালকের নির্দেশ মত আমি তথায় তাঁর কাছে হাজির হব। শপথবদ্ধ আমি এখানে যা শিখব তা আমারই মত শপথবদ্ধ ছাড়া আর কাউকেই তা শেখাতে পারব না।

বিশেষ প্রথম প্রতিজ্ঞা :

ওঁ বন্দেমাতরম। ঈশ্বর-জননী-পিতা-গুরু-নেতা ও সর্বশক্তিমানের নামে আমি শপথ করছি যে, সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন না পূর্ণ হচ্ছে ততদিন আমি এই সমিতির সংসর্গ ছেড়ে কোথাও যাব না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, গৃহপরিবেশের আমি কোনভাবেই জড়িয়ে আবদ্ধ হব না। আমি পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজ 'নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করব। এই প্রতিজ্ঞা আমি কোনভাবেই লঙ্ঘন করব না। লঙ্ঘন করলে আমার উপর যেন অভিশাপ নেমে আসে।

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা :

ওঁ বন্দেমাতরম। ঈশ্বর-অগ্নি-মাতা-গুরু ও নেতাকে সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, অনুশীলন সমিতির উন্নয়নের জন্য আমি এই শাখার সকল কাজ, আমার নিজ জীবন সম্পদ হানির ঝুঁকি নিয়েও সম্পন্ন করব। যে কোন মূল্যে পরিচালকের আদেশ আমি পালন করতে বাধ্য থাকিব। আমি কারুর সাথে গুপ্ত কাজ ও পরিকল্পনা নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করব না—অতি নিকটে আত্মীয় পরিজনদের কাছে বলব না। কারণে অকারণে কোন কিছু জানার জন্য ব্যগ্র হব না। এই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করবই—না পারলে সকল অভিশাপ আমার উপর ধর্ষিত হউক।

'প্রতিজ্ঞাগুলি' অত্যন্ত গম্ভীর পরিচ্ছন্ন সুস্থ মানসিক বাতাবরণে মা কালীর সামনে নতজানু হয়ে মাথায় গীতা ও খোলা তলোয়ার স্থাপন করে উচ্চারণ করতে হত। শ্মশান, গভীর অন্ধকার রাত্রিতে কালীপ্রতিমার চরণে রিভলবার রেখে প্রতিমার চরণ স্পর্শ করিয়ে ভীমরবে প্রতিজ্ঞাগুলি পাঠ করা হত। ঢাকার অনুশীলন সমিতির কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন পুলিনদাস, ভূপেশচন্দ্র রায়। ঢাকার ৫০ নং ওয়াড়িতে এই অনুশীলন সমিতির উত্তোরত্তর বৃদ্ধি এবং দেশ-ব্রতী যুবকের প্রতিজ্ঞাপালন। প্রায় ১০০ জন যুবকের নিত্য শরীরচর্চা-ধর্মচর্চা ও স্বদেশভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জমজমাট।

অনুশীলন সমিতির কর্মধারায় গোপনীয়তা এবং তাৎক্ষণিক একসান করার গভীরতা খুবই স্বাভাবিকভাবে কর্ম-সন্তানদের শিক্ষায় রপ্ত হয়েছিল।

সমিতির গোপালগঞ্জ শাখার সক্রিয় তুখোর সন্তান ঢাকা জেলা শাসককে নিধন করতে ব্যর্থ হয় তাতে সমিতির সদস্য-কর্মীদের উপর পুলিশী নজরকারী তীব্রতর হয়ে উঠে। নানা ছলা-কৌশলে সদ্য-সন্তানদের মধ্য থেকে প্রলোভনের বাতাবরণ সৃষ্টির নানা আয়োজন ব্যাপকভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে দেখা যেতে লাগল। এমনি সমিতির প্রতিজ্ঞা-স্থির সন্তান মনসা চক্রবর্তী শাসকের অনুচরদের প্রলোভনে সমিতির গোপন বহু ঘটনা ও ব্যবস্থাকে জানিয়ে দিয়েছিল—ফলে তাঁকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা হল না সমিতির সন্তানদের কোন একজনের। সময়টা ১৯০৮ নভেম্বর।

সমিতির ভেতরকার খবর পুলিশের কাছে ধীরে ধীরে নথিভুক্ত হতে লাগল। সে সময় সমিতির হাতে ও অর্থের অভাব তাই প্রত্যাঘাতের জন্য যে পরিমাণ অর্থ

দরকার তার ও সংস্থান নেই। কিন্তু হতাশা এতটুকু যাতে কর্মী-সন্তানদের মধ্যে না আসে তার পরিকল্পনা করা হল। অর্থ চাই, অস্ত্র চাই—দেশের জন্য, দেশজননীর শৃংখলমোচনের জন্য—অস্ত্র চাইই, তার জন্য অর্থের প্রয়োজন।

ঠিক হল দেশের কাছে সমর্পিত মন ও জীবনে কোন কাজ আটকাবে না।

ঢাকার ইংলিশবাজারে ও নড়িয়া বাজারে শাসক অনুগ্রাহীদের কাছ থেকে ডাকাতি করা হল অর্থ তার জন্য অত্যন্ত সর্ন্তপনে কর্মী সন্তানদের চলাফেরা এবং সংযম গভীর শক্তি জুগিয়েছিল।

শাসকদের অনুগ্রাহী এক গৃহস্থ বাড়ী থেকে (বর্‌হায়—২জুন ১৯০৮) ২৬,০০০ টাকা ডাকাতি করা হল। টাকা নিয়ে নৌকোয় যাবার পথে পুলিশ ও গ্রামের বহু লোকের পিছুকে হটাবার সময় ওরা গুলি চালায়—প্রতিরোধীরা পুলিশের সহযোগিতায় ও প্রত্যক্ষতায় গুলি চালায়—নৌকা ফুটো হয়ে যায় জল ঢুকতে থাকে, জল সেঁচে ফেলার ভাব নিল কর্মীসন্তান গোপাল, গোপাল সেন। সে সময় পুলিশের গুলি গোপালের মাথা ফুটো করে দেয়। গোপাল 'বন্দেমাতরম্' তিন তিনবার বলতে বলতে লুটিয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের লঞ্চ ধেয়ে এলো দ্রুত—কর্মী সন্তানরা নৌকোয় থেকেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গুলি শেষ হয়ে গেল—উপায় নেই, কিন্তু এতটুকু হতাশা নয়—এল প্রবল ঝড়, ছেয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে....চারিদিক অন্ধকার-সেই সুযোগে নৌকো থেকে গোপালের দেহটা মনোহর নদীতে বিসর্জন দেওয়া হল।

স্বদেশী-আন্দোলনের পট পবিবর্তনের বাঙলাদেশের নেতৃস্থানীয় দেশ-প্রেমীদের আন্দোলনের পদ্ধতিগত আলোচনায় কিছু সংশয়—অনেকটা পথ পরিবর্তনের হিমেল হাওয়া ঘুরছিল। গান্ধীজির আর্বিভাব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সদ্য অনুভবের বিশ্বস্ত মানসিকতার ব্যাপক আহ্বান—।'

অনুশীলন সমিতির পুরোধায় নেতৃত্ব পুলিনদাসের গ্রেপ্তারের পর সমিতির পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে অনেকেই এসেছেন। তাঁদের প্রায় সবার কাছেই গান্ধীজীর মতাদর্শের ভাবনার প্রচ্ছদ বেশ কার্যকর হয়ে উঠেছিল—কিন্তু প্রত্যক্ষতার কোন সমাধান তখনও তাঁদের একেবারে আয়ত্বে আসেনি।

এরই মধ্যে পুলিনদাসের নেতৃত্বের প্রভাব বিহার-যুক্তপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশে ছড়িয়ে যেতে লাগল বেশ গোপনীয়তার ইন্ধনে। বারানসীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালদের সঙ্গে তখন অনুশীলন সমিতির যোগাযোগ গাঢ় হচ্ছে। চন্দননগরে ও তার তপ্ত আঁচ বেশ উপ্ত করে তুলেছে যুব-সম্প্রদায়কে। দেখতে দেখতে খুবই দ্রুত গতিতে দিল্লী-পাঞ্জাবে ও বিপ্লবের শিখা জ্বলে উঠতে অনুকূল পরিবেশ আয়ত্বে এসে গেল। ঢাকা-কলকাতা-পাঞ্জাব-লাহোর বাঙলার বিপ্লবীদের, বিশেষ করে অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রের সংযমী নিষ্ঠার জীবনচর্চার অনুসরণ হতে লাগল।

এদিকে অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞা-অভিষিক্তরা চুপ করে বসে নেই। পুলিশ-কর্তাদের বাড়ীতে বোমা ফেলা, পথে পথে সমিতির ছেলেরা নিজেদের কাজ করতে

থেমে নেই। পুলিশ অফিসার বসন্ত ভট্টাচার্যকে নিধন করল **অনুকূল চক্রবর্তী** ও **আদিত্য দত্ত**।

গুপ্তচর রামদাস সাদা পোষাকের পুলিশের সহযোগিতায় অনুশীলন সমিতির ছেলেদের খুঁজে বের করতে করতে হঠাৎ রামদাস একা হয়ে যায়। আর সেই সময় **অমৃত সরকার নগেন দত্ত, বীরেন চ্যাটার্জী** রামদাসকে হত্যা করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। স্বদেশ-প্রীতির ও স্বদেশের জন্য কাজ করার একটা মাদকতা সে সময়ের ছোট বড় সকলের মধ্যেই গভীর প্রেরণায় উৎসব হয়ে অনুভত হত। বরিশালের অনুশীলন শাখা সমিতির সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান-সদস্য **যতীন ঘোষ** তখন ছাত্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই দেশের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছিল। প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে শরীরচর্চা ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ, গভীরতা, তারপর তাদের নির্দেশ পালন, 'রাষ্ট্রীয় শক্তির মতে ওরা সবাই অপরাধী হয়ে শাসকদের নজরে নজরে থাকতে হত।

এমনি ময়মনসিংহের **যোগেন ঘোষ** শ্রীহট্টের মৌলবীবাজারের **হাকিম** মিস্টার গর্ডনকে নিধন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছিল। কখনো হাতে বোমা নিয়েই এখানে ওখানে যোগেনের হাতেই ফাটল এবং যোগেনের দেহটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পথে পড়ে রইল। আই.সি.এস. মিঃ গর্ডন শিলচরে থাকাকালীন জানতে পেরেছিলেন যে 'জগৎসী আশ্রমে বিপ্লবীদের আনাগোনা-শলাপরামর্শের নিভৃত স্থান। খুব তৎপর হয়েই তাই মিঃ গর্ডন গভীরভাবে সেই সব বিপ্লবী ছেলেদের খোঁজ করছিলেন এবং নানাভাবে সময়-অসময় ফৌজ পাঠিযে পুলিশ দিয়ে আশ্রমের ভেতর ঢুকে তল্লাসী করা হত। এতে বিপ্লবী ছেলেদের ক্ষোভ বেড়ে যেতে লাগল। একদিন সেই গর্ডন কোন একজন ছেলেকে আশ্রমে আটক করে রাখা হয়। এমন অছিলায় পুলিশ নিয়ে আশ্রমটি তল্লাসী নামে তছনছ করা হল। এমনকি আশ্রমিক ছেলে মেয়েদের লাঠি এবং চুল ধরে কিল চড় সহও অত্যাচার পুলিশ করেছিল। রক্তও ঝরেছিল। তাতে আশ্রম কর্তা সাধু স্বামী যোগানন্দ বাধা দিলে গুলিবিদ্ধ হন। এবং বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে মৃত্যুকে বরণ করেন।

তাই বিপ্লবীদের মনে জেদ জন্মেছিল মিঃ গর্ডনকে হত্যা করার। বিপ্লবী যোগেনের উপর সেই ভার পড়েছিল। কিন্তু যোগেন হাতে বোমা ছুড়তে গিয়ে নিজেই রক্তাক্ত, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে প্রাণ দিল। কিন্তু বাংলার সেই ক্ষুদে দামাল ছেলেরা তাতে থেমে যায়নি। ঠিক হল প্রত্যাঘাত করা হবে—সেই গর্ডনে—অবশেষে লাহরে গর্ডনকে মারতে গিয়ে তার চাপরাশির মৃত্যু হয়—তাতে ফাঁসি হয় বসন্ত বিশ্বাসের।

১৯১৩ সন। চারদিকে শুধু বোমা আর বোমা। এত বোমা কোথ থেকে এরা পেল। এখানে ওখানে বৃটিশের অনুগতদের বাড়িতে রাস্তায় বোমা ফেলা। কলেজ স্কোয়ারের পুলিশের প্রধান কনস্টেবল হরিপদ দেব গুলিবিদ্ধ হন। কে বা কারা করল, কেউ বুঝতে পারল না—ভীড়ের মধ্যে ওরা মিলিয়ে গেল। ময়মনসিংহে পুলিশের ইন্সপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরীর বাড়িতে আচমকা বোমা পড়ল—বঙ্কিমবাবু নিধন

হলেন। কারা এ কাজ করল পুলিশ হতভম্ব! এভাবে রানীগঞ্জ-ভদ্রেশ্বর-মেদিনীপুর-পুলিশের থানায় বোমা!

পুলিশ ছাড়বাব পাত্র নয়—তল্লাশীর পর তল্লাশী তীব্র থেকে তীব্রতব। কলকাতার রাজাবাজারের একটি বাড়িতে হঠাৎই পুলিশেব তল্লাশী। বাড়ীতে তখন অমৃতলাল-দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-চন্দ্রশেখর দে ও সারদাচরণ গুহ। ওঁরা সবাই ঘুমিয়েছিল। পুলিশের তাড়নায ওরা জেগে গেল। 'স্তম্ভিত নয়নে যেদিকে তাকায় সর্বত্র পুলিশ। ওদের ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ ঘবেব মেঝেতে এখানে ওখানে বাইবে কতকগুলি ভাঙ্গা বোমা তৈরির পরিত্যক্ত টিনেব বাক্স। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হল। বিচাব হল—ওদের জেল হল। কিন্তু স্বাধীনতার গোপন দলিলেব অনেক কিছুই পুলিশের হস্তগত হল।

এদিকে বিপ্লবীদেব হাতে অর্থের টানাটানি। তাই অস্ত্রেরও অপ্রতুলতা। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করার পরিকল্পনা নানা প্রতিকূলতাব মধ্যেও নিরাশ না হয়ে অর্থ সংগ্রহে তা যেভাবেই হোক—সবাই উদ্যোগ নিলেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে। ডাকাতি করে যদিও বা অর্ঘ পাওয়া গেল কিন্তু অস্ত্র কোথা থেকে পাওযা যাবে? বিদেশ থেকে ছাড়া অন্য কোন পথ সেদিন ছিল না। কারণ মানিকতলা চন্দননগর হাতের বাইরে—পুলিশের গভীর নজব এড়িয়ে কিছু কবা সম্ভব নয়। তবুও নিরাশ না হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঝে-মধ্যে কোন ফিরিঙ্গী-ইতালিয়ান বা চীনাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হত। তাছাড়া কলকাতার চেতলা অঞ্চলের বাসিন্দা অস্ত্র বিক্রেতা নূরমান, চন্দননগরের অস্ত্র বণিক কিশোরীমোহন সাপুই প্রায়শই বিদেশী অস্ত্র, বিশেষ করে রিভলবার, বিপ্লবীদের কাছে বিক্রয় করতেন চড়া মূল্যে।

এদিকে জগদ্দলের আলেকজান্ডার জুট মিলের এক শ্রমিককে মিলের ইঞ্জিনীয়ার বুটপড়া পায়ের লাথিতে মেরেছিল। বিপ্লবীদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা হল। সেই ইঞ্জিনীয়ার ও মিলের কর্তা ব্রিয়েসকে হত্যা করার ভার অর্পণ করা হল রংপুরের হরিদাস দত্ত ও কুমিল্লার খগেন দাসের উপর। ভারপ্রাপ্ত হয়ে ওরা দু'ন মিলে কাজ নেন এবং ইঞ্জিনীয়ার যে নৌকায় চন্দননগর থেকে যাতায়াত করেন তার মাঝি হয়ে কাজ করেন। কিন্তু গোয়েন্দরারা তা ধরে ফেলেন। কাজটা করা গেল না। কিন্তু বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহের কিছু পথের সুযোগ এসে যায় সে সময়। তার উচিত ব্যবস্থা করার জন্য নানা উপায়ে ছদ্ম পরিবেশে—কখনো গরুর গাড়ি চালিয়ে মহিষের গাড়ি চালিয়ে অস্ত্র বোঝাই করে অস্ত্র সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলন।

॥ পনের ॥

বঙ্গ-বিভাজনের অনির্বাতায় বাঙালির চেতনায় গভীরভাবে একটা স্তব্ধতার পরিবেশ সামগ্রিকভাবে গ্রাস করেছিল সমস্ত দিক থেকে। এই সর্বগ্রাসী নিশ্চল-নির্জীব

প্রবাহকে প্রতিহত করার জন্য দেশের কিছু সচেতন বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ-সেবী মানুষ তাতে বিব্রত হলেন—অন্ধকারের হাতছানি মানসিকতাকে পঙ্গু-জড়বৎ করে তুলতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে, তা অনুভব করে ব্যাকুল হলেন জাতিকে সচল করে দেশাভিমুখী স্বদেশভাবনায় যুক্ত করতে। ফসল হল—সংগীত-কবিতা-নাটক-যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানসিকতার অবসন্নতাকে দূর করার বেগ। জাতীয় জীবনে এইভাবেই বাংলার জাগরণের ভিত্তিভূমি তৈরী হল। প্রকাশিত হতে লাগল চারদিক থেকে স্বদেশাত্মক-চেতনার কবিতা-সংগীত-নাটক।

নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর্ পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই!
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ওই ডাকিচেন সাজ্‌রে সাজ্
স্বদেশী-সংগ্রামে চাই আত্মদান
'বন্দেমাতরম' গাওরে ভাই।।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।
বর্শা শানায়ে নিয়ে
অশ্বের খুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের গা দিয়ে।

তীব্র কশাঘাত জনিত আর্তনাদে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন,

....এস গো দুঃসাহসি
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী।

'বন্দেমাতরম্' সংগীতের রেশ টেনে জাতিকে অবসাদ দূর করে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে কবি বললেন,

ঐ যে জগৎ জাগে-স্বদেশ অনুরাগে,
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন, নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে?
ভাঙ্গবে নাকি এ কালে-নিদ্রা, রইবে এ ভাব যুগে যুগে?
পেয়ে পরের প্রসাদ, যায় কি বিষাদ
এ অবসাদ কোন্ বিয়োগে?

বারবার নানাভাবে জাতিকে চাঙ্গা করে রাখার সমস্ত রকম মানসিক চেতনার প্রেরণা

নানা গানে কবিদের প্রযাস নিরন্তব কাজ করে চলেছে—সেই একটি মাত্র ভাবনায়—স্বদেশেব জন্য নিজেকে তৈরী কব, স্বদেশাত্মার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য আত্ম-শক্তিতে বলদীপ্ত তেজে এগিয়ে চল।

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা!
ওরে মানের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আব হবে না

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

আবার কামিনীকুমাব ভট্টাচার্য গাইলেন,

ঐ শোনো. বাজে বিধাতার ভেরী,
বাঁধ কটীতটে শাণিত ছুরী
দানবদলনী সাজ গো জননী
বাঙালিনী বেশ ছাড় গো!

মনকে প্রস্তুত করতে করতে যুদ্ধাস্ত্র হাতে নেবার কথা অত্যন্ত নিবিড় নিপুনতার মধ্য দিয়ে জাতির কাছে তুলে ধরা হল।

প্রেরণায় নাটক:

গানের পাশাপাশি আবার এল নাটকের মধ্য দিযে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ-অনুরাগ ব্যাকুলভাবে জাগিযে তোলার আযোজন নাটক-যাত্রা গণমাধ্যমের গভীর অবলম্বন। তাই জাতীয় জাগরণে নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই কাজে অনেক আগে থেকেই পরাধীন জাতির বেদনা আর সেই বেদনা থেকে উত্তরণের জন্য পথ দেখিয়ে দেবার প্রয়াস জেগেছিল। জাতিসত্তার গভীরতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার বিরাট পরিবেশ তৈরীতে নাটক একসময় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। স্বদেশ-ভাবনা, ব্যক্তি সচেতন পরিচ্ছন্ন উত্তরণের কথা সে সময় নাটক বাঙালির জীবন-প্রবাহে সার্থক মাধ্যম হয়েছিল। ইতিহাসের তথা পৌরাণিক জীবনগাঁথাকে কেন্দ্র করে একসময় যেমনভাবে জাতীয় জাগরণের মালমসলা কবিতায় প্রবেশ লাভ করে প্রেরণা জুগিয়েছিল তেমনি নাটকের ক্ষেত্রে ও পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ উপাদানে ও কাহিনীর মাধ্যমে নাটক রচনা করা হয়েছিল। বিশেষভাবে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' জনিত মানসিকতায় এবং 'স্বদেশীগ্রহণ' 'বিদেশীবর্জন' ভাবনায় দেশের মানুষের নিত্যকার জীবন পর্যায়ে যাঁরা নাটকের কাহিনীর অন্তরালে রসদ বন্টন করেছিলেন তাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ' সকল ভয়শূন্যতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অন্তরকে প্রাণবন্ত ও দেশব্রতে নূতন ভাবনায় সঞ্জীবিত করেছিলেন। নূতন কোন কথা দিয়ে নয়—অতীতের ইতিহাসের ঘটনার মোড়কে ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে জাতি-ঐক্যকে সামনে তুলে এনে সংহত শক্তিতে স্বদেশ ভাবনার নৈতিক আদর্শের রসে উদ্‌বোধিত করেছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু নাটক রচনা করেছিলেন।—ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের বিস্তারে জাতীয় চরিতে স্বদেশানুভূতির বিচিত্র কথোপকথনে ও ঘটনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিরন্তর। 'বঙ্গচ্ছেদ'এর বেদনা এবং অনিবার্যভাবে স্বদেশী-গ্রহণের আন্তরিকতাকে গিরিশচন্দ্র অত্যান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিস্তার করেছেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাকে মনে রেখে তিনি চরিত্রের যে রূপ দান করেছেন তা অনবদ্য। মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্খা আপন সত্ত্বার পরিচয় লাভের অধিকার। আর সেই অধিকার যদি কেউ কেড়ে নেয় তা হলে তার প্রতিরোধ করতেই হবে। **'সৎনাম'** নাটকে গিরিশচন্দ্র দেশাত্ম-অনুসঙ্গে মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র দেশপ্রেমের স্বচ্ছ ঐতিহাসিক চরিত্রের অনুসরণে **'সিরাজদ্দৌলা'— মীরকাশিম'** এবং **'ছত্রপতি শিবাজী'** এই তিনটি নাটক রচনায় স্বদেশ-ভাবনার আন্দোলনের বেগকে তীব্রতর করেছেন।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় **'মিনার্ভা থিয়েটার'**। স্বদেশ, স্বদেশ ভাবনাই নাটকটির মূল কথা।

> ......যার হৃদয়ে ধারণা, যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তার সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চোখের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে যার ভ্রম দূর না হয়, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থলিপ্ত হয়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার! মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত! এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায়, যে শত দোষে দোষী হলেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তাহলে আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল।

গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বদেশ-চেতনার অনুভবে রঞ্জিত করে সিরাজের মুখ দিয়ে স্বদেশ-ব্যাকুলতার ভাবনাকে ফুটিয়েছেন। স্বদেশ-অনুরাগ কোন ছলনার প্রশ্রয় দেয় না। সত্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে স্বদেশ-ব্যাকুলতা 'মীরকাশিম' নাটকে গিরিশচন্দ্র পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। দেশের ভাবনায় কোন দুর্বলতাকে কোনভাবেই স্বীকার করা যায় না। তাই দৃঢ় সত্য-প্রত্যয়ের গভীর অনুরাগে 'বঙ্গ-চ্ছেদের' বেদনাসিক্ত আহরণে বলিষ্ঠতার শক্তিতে অনুরণিত। নাটকের গতিতে 'তারা মীরকাশিমকে বলেছিলেন,

> .....মীরকাশিম, তুমি স্বদেশবৎসল! বঙ্গমাতা অতি কঠিনা জননী! তার শোণিত পিপাসা প্রবল, সামান্য শোণিতে তাঁর তৃপ্তি নাই! স্বদেশভক্ত, স্বদেশ বৎসল, স্বদেশীপ্রিয়, স্বার্থশূণ্য হৃদয়ের শোণিত পানে পিপাশা! সে পিপাসা তৃপ্ত না হলে 'বঙ্গভূমি' প্রসন্না হবেন না। যুদ্ধে অগ্রসর হও, বঙ্গের শোণিত দান করো, তোমার ন্যায় স্বদেশবৎসল সকলে একত্রে মিলে শোণিত দান কর!

একজায়গায় মীরকাশিম বলেছেন,

> .....না আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি,

> বাংলার উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্ষু মোগলগৌরব পুনর্জীবিত করবো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোনিতশোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো। এই নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ করে চিন্তা-হ্রদে ঝম্প প্রদান করেছি।....

গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বদেশ-আকুতিব একটা গভীর সত্যের পরিমণ্ডলে জাতির চরিত্রের প্রেবণাকে প্ররোচিত করার জন্য নাটকের মাধ্যমে বঙ্গ-বিভাজন বেদনার তীব্রতাকে রূপ দিলেন। জাগরণের নানা স্তরে ও ঘটনায় স্বদেশনুভূতির বিস্তার ও প্রসার কল্পে তখন বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকদের ভাবনা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

''ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে ও শিবাজীর চারিত্রিক দৃঢ়তার সর্বমূলে মাতৃভূমি স্বদেশভাবনার শক্তি যেভাবে কার্যকর হয়েছিল ঠিক সেই ভাবনায় গিরিশচন্দ্র বাঙলার মানুষদের মধ্যে স্বদেশ-ব্যাকুলতাকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের সূত্র ধরেই 'শিবাজী উৎসব' পালিত হল। বালগঙ্গাধর তিলকের আহ্বানে মহারাষ্ট্রে ও বাংলায় 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি উৎসব' পালন করা হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দুটি উৎসবের মূলভাবনাকে প্রসারিত করার কাজ বাংলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। একসময় কিছু মুসলমান তা মান্যত দিয়ে 'গোহত্যা'কে সামনে আনতে চাইল না। কিন্তু আবার কিছু মুসলমানের সক্রিয় চেষ্টায় তা বন্ধও হয়ে যায়—বিরোধ হিন্দু মুসলমানের নয়—বিরোধ ইংরেজের বিরুদ্ধে।

গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজীর' মূল বাসনা—

> .....শিবাজীতে আমি এই আদর্শ দেখবার চেষ্টা করেছি যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্মরক্ষার জন্য অত্যাচারিত। দুর্বল, পীড়িতকে রক্ষা করার জন্য ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

আসল ভাবনার প্রসার ও প্রচারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল বাঙালির সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের যে, ধর্ম বড় নয়, অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য ইংবেজের অত্যাচারকে প্রতিরোধ করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ময়দানে নামতে হবে।

॥ ষোল ॥

'বঙ্গভাষা'কে কেন্দ্র করে বাঙলাসাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার স্বপ্নের এমন ও বঙ্গ-সাহিত্যকে গভীরভাবে সর্বক্ষেত্রে যুক্ত করে জাতি ও দেশ গঠনে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সে সময়কার কিছু প্রবন্ধ/গল্প/পাঠ করলেই বাঙালি তথা ভারতবাসীর মানুষের জীবন-ভাবনায় যে অন্ধকার ও হতাশা নানাদিক থেকে আসছে—তার প্রতিরোধে অমরশক্তি এবং 'আত্মশক্তির' জাগরণে সহায়তা করছে অনবরত। তার সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা নিচে দেওয়া হল।

রাখীসঙ্গীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান —

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান —

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান —

বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখী সংগীত, ১৯০৫ (১৩১২) সালে রচিত।

বঙ্গবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতা দিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই—এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌গ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণ ব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কলাকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেক দিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না-আছে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ, চাণক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয় আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি-বিলের দ্বারা তোমরা এ দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও, এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে এমন যদি সন্দেহমাত্র জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি—অপর পক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে, ওরিয়েন্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ।

য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমবা ক্ষণকালেব জন্য রাগ করি. আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুবোপুবি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোলো আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া বাখিবাব যে শক্তি তাহা আমাদেব নাই—আমরা ভুলিতে চাই আমরা বিশ্বাস করিতে পাবিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল তখন তাঁহাকে তাঁহাব এক ইংরাজ সুহৃদ বলিযাছিলেন : Spare him not, crush him like a worm! কিন্তু বাঙালি সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ কবিতে কুণ্ঠিত হইযাছিলেন, এবং তাহাব ফল এখনো ভোগ কবিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমবা জানি না—আমাদের চিবন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয—এক জায়গায় আমাদেব মন বলিয়া ওঠে, 'আহা, আব কেন. আর কাজ নাই, আব থাক্।' পবিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদেব গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই। সম্বন্ধবিস্তাব করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবাব চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসেব ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের 'স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ, কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না ; কারণ শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্ত-মাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখো—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে—যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি তাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে 'তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব', তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না। গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে।

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, 'তোমাদের মতলব

আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।' এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, 'তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।' বলিহারি এই 'অতএব'!

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্ম ও যথানিয়মে পালিত হয় না, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয় তাহা গ্রহণ না করি কেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে—সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি-উপলক্ষেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি-বা কপট ভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তায় ঘাটে, আপিসে আদালতে, রেলে, ট্র্যামে, কাগজে পত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মন জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালি জাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন। গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না—আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রটা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম। বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম। আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই ; এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনি আন্তরিক ঐক্য উদ্‌বেল হইয়া উঠিবে—তখনি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিবকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন ; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা ; ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে—যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে—তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, যে পারে বটে, কিন্তু কী করিবে। কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই ; আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন। মনে করো-না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল 'তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে মারিব' তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, 'আমি ঝরনার নীচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কী করিয়া।' তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়।

ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন 'তোমরা কোনো কর্মের নও'। আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, 'আমাদের অধিকার গেল'। অধিকার গেল'। অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারানী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব, কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী। সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে। ময়দানে মহারানীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউন-হল হইতে উদ্‌বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে গভর্মেন্ট একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না ইহা নিঃসন্দেহ ; অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন তখনি আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কী আছে তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কী সাধ্য তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না—বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ-

প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুখ-লাভক্ষতির আলোচনায় প্রয়োজনীয় অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিন্‌সাল কন্‌ফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনা-দিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না। এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গভর্মেন্টকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন্‌, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব—সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

১৩১১

বন্দে মাতরম্*

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমরা বাঙালী, মাতাকে বন্দনা করিব, ইহা আর বড় কথা কী! চিরকাল ত এই শিখিয়া আসিতেছি যে মাতাকে বন্দনা করিতে হয়, ভাল বাসিতে হয়, ভক্তি করিতে হয়। জননী জন্মভূমি যে বন্দনীয়া, স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, এ কথাও ত লোকের মুখে লাগিয়া আছে। তবে যে আজ এই বঙ্গদেশ—যেখানে বাঙালী সেখানেই বঙ্গদেশ—ব্যাপিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনির তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহার বিশেষত্ব কি?

ভাবিয়া দেখিবার বড় অবসর হয় না। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল এই গীতটি রচিত হয়। যিনি রচনা করেন তিনি এই গান স্বদেশভক্তির মন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি সন্ন্যাসীর মুখে দিয়া যান। যে পুস্তকে গানটি আছে তাহা একখানি উপন্যাস। আমরা যেমন অপর দশখানা উপন্যাস পাঠ করি আনন্দমঠও সেইরূপ পাঠ করিতাম। অন্য উপন্যাসে যেমন গান পড়ি সেই রকম এ গানটিও পড়িতাম। এই গীতে ও অপর গীতে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিত না। আজ কেন এই গান বন্যার মত আসিয়া দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে? কেন আজ সপ্ত কোটি বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছে, বন্দে মাতরম্? যে দিন বাঙালী বাঙালীর হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিল সে দিন কি মনে হয় নাই যে হৃদয়ের সহিত হৃদয় বাঁধিবার মন্ত্র বন্দে মাতরম্?

মহা সাধনা যেখানে, সেখানেই মহামন্ত্রের প্রয়োজন। সকল ব্রতের মন্ত্র আছে; সকল কার্যের আহ্বানধ্বনি আছে। আজ যেন মনে হইতেছে আমরা দিন ধরিয়া কাজের চেষ্টায় ফিরিতেছিলাম, আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাই নাই! ব্রতের সকল আয়োজন করিয়াছিলাম, মন্ত্রের অভাব উদযাপন করিতে পারি নাই!

এই যে সুজলা শস্যশ্যামলা দেশ, ইহাই যে আমাদের মাতৃস্বরূপ এ কথা আমরা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না। স্বদেশ মাতৃতুল্য এ কথা জানি, বুঝি, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে যাহা পারে চেষ্টাও করে, কিন্তু অনুভব আর এক সামগ্রী, অনুভব করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। দেশহিতৈষিতা ত আমাদের দেশে অনেক দিন আসিয়াছে, অনেকে ত দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশ যে সাক্ষাৎ মাতৃস্বরূপ তাহা কি আমরা অনুভব করিতে পারিতাম? উপন্যাসের গান, উপন্যাসের কথা উপন্যাসেই ছিল, কাল্পনিক কথা আমরা অলস কল্পনার চক্ষেই দেখিতাম। জননী জন্মভূমির অঙ্গ খণ্ড করিবার ব্যবস্থা হইল। কত সভা, কত বক্তৃতা হইল, কত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। তখন কে আমাদের কানে মন্ত্র দিল, কহিল, "বল, বন্দে মাতরম্!"

যেমনি এই মন্ত্র উচ্চারিত হইল অমনি দেশে এক নূতন প্রবাহ আসিল, লোকের মনে অভিনব আশার সঞ্চার হইল, দুর্বলতা, হীনতা, কাতরতা দূর হইয়া গেল,

* প্রয়াগ বাঙ্গালী সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

বাঙালীর মনে আত্মনির্ভর প্রবল হইল। যদি এই গান রচিত না হইত, তাহা হইলে আজ আমরা সমবেত হইয়া কাহাকে বন্দনা করিতাম, কোন্ মন্ত্রে বাঙালীর হৃদয়ে বল হইত? আর কোন কথায়, কাহারও বক্তৃতায় ত দেশ এমন জাগিয়া উঠে নাই।

যখন কোন ঘোরতর বিপদে আমরা পতিত হই তখন বক্তৃতা করিয়া যে বিপদ বুঝান যায় না, বক্তৃতা তখন আসেই না। বড় যাতনার সময় আমরা মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করিয়া, যন্ত্রণার সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়া চিৎকার করি না। যে বিপদ দেশের উপর আসিয়াছে সেরূপ বিপদ ইতিপূর্বে কখন আমাদের ঘটে নাই। সুতরাং অনেক কথায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন দেখিলাম জন্মভূমির অঙ্গ ছিন্ন হইতেছে তখন বুঝিতে পারিলাম এই দেশ যথার্থই আমাদের জননী, আগে যাহা শুধু কথায় জানিতাম এখন তাহার অনুভূতি হইল। কে এই জননীর দেহ ত্রিশূলাগ্রবিদ্ধ সতীদেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিবে? আমাদের মাতা, কে তাঁহাকে দ্বিধাবিভক্ত করে? এস ভাই বাঙালি, হাতে হাতে ধর, মণিবন্ধে রাখী বাঁধ, অখণ্ড মণ্ডলে জননীকে ঘিরিয়া দাঁড়াও, বল, বন্দে মাতরম্।

যখন একটা কাজ অনেক লোক মিলিয়া করে, একটা ভারি বোঝা অনেক লোক মিলিয়া টানে সে সময় একজন সুর করিয়া একটা কথা বলে, অপর সকলে সেই ধুয়া ধরিয়া বল প্রয়োগ করে। এইরকম করিয়া কার্য সম্পন্ন হয়। যে কর্মে আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি তাহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য নাই, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার অপেক্ষা মহত্তর ব্রত নাই। এই কাজের ধুয়া, এই ব্রতের মন্ত্র, বন্দে মাতরম্। ব্রত যেমন মহৎ মন্ত্র তেমনি মহান্, কার্য যেমন গুরু ধুয়াও সেইরূপ বলপ্রদায়িনী।

এই গীত, এই মন্ত্রের তত্ত্ব কি? তত্ত্ব শব্দটী বাংলা ভাষায় সম্প্রতি কিছু ভীতিজনক হইয়া উঠিয়াছে। এমন সামগ্রী নাই, এমন প্রথা নাই যাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। গান কবির কীর্ত্তি, তাঁহার কল্পনায় আসিল তিনি রচনা করিলেন। তাহার আবার তত্ত্ব কি? কিন্তু অকারণে কিছু হয় না, উদ্দেশ্যহীন জগতে কিছুই নাই। প্রথমেই এই গীত সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কথা উল্লেখ করিবার আছে। যখন আনন্দমঠ প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় সেই সময় বঙ্গের কোন প্রথিতনামা কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রসঙ্গ ক্রমে এই গীতের উল্লেখ হয়। কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এই গীত সংস্কৃত ও বাংলা মিশাইয়া রচনা করিলেন কেন? হয় কেবল সংস্কৃতে কিম্বা শুদ্ধ বাংলায় রচনা করিলেই ত ভাল হইত। একটি গীতে দুইটি ভাষা সন্নিবেশ করিবার কারণ কি?" বঙ্কিমচন্দ্র নীরব রহিলেন। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করাতে তিনি হাসিয়া, সংক্ষেপে কহিলেন, "আমার খুশী!" এ কথায় উপর আর প্রশ্ন কিম্বা তর্ক চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মরচিত গীতের ব্যাখ্যা করিতে অথবা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

সেসময় মিশ্র ভাষা অনেকের চক্ষে বিরূপ বোধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আজ পঁচিশ বৎসর পরে এই দ্বিভাষাগ্রথিত বিচিত্র সঙ্গতের সার্থকতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিতেছি। যে দেশকে আজ আমরা মাতা বলিয়া বন্দনা করিতেছি অতি প্রাচীনকালে সেই দেশকে আর্য ঋষি মাতা বলিয়া বন্দনা করিতেন। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী সংস্কৃত কথা, বাংলা নয়, এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তিও সেই প্রাচীনদিগের শিক্ষা, বাঙালীর নবাবিষ্কার নয়। এই দেশ যেমন আমাদের জননী সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাও বাংলা ভাষার জননী। অতএব স্বদেশানুরাগ প্রচারের সময় এই উভয়বিধ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রাচীন আর্যদিগের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষারও সেই সম্বন্ধ। তাহার পর, কিরূপ সংস্কৃত ভাষায় গান বচনা করা উচিত? যদি ভট্টির অথবা ভারবির ভাষা বাঙালীর মস্তকে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে অনেক বাঙালীর মাথা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, মাথার মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু বাঙালী জয়দেব আর এক রকম সংস্কৃত ভাষা রচনা করিয়া গিয়োছেন, যে ভাষার তরল, তরঙ্গায়িত, মাধুর্যময়, ললিত ছন্দে জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে ভাষা বুঝিবার জন্য ন্যায় ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন হয় না। সেই ভাষাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তদপেক্ষাও সহজ সরল ভাষায় কবি লিখিলেন,

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং, মাতরম্!

এই সংস্কৃত কোন্ বাঙালী, সংস্কৃত কলেজের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও, বুঝিতে না পারে? যেমন সংস্কৃত তেমনি বাংলা,

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ইহার অপেক্ষা সরল বাংলা আর কি হইতে পারে?

একদিকে এই স্বচ্ছ, নির্মল, ছন্দোময়ী, অমৃতময়ী, জাহ্নবীযমুনার সঙ্গমতুল্য দ্বিবেণী ভাষা ; অপরদিকে ভাবের প্রগাঢ়তা, গভীরতা ও প্রসার! জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনার গীত অনেক ভাষায়, অনেক দেশে আছে, কিন্তু এইরূপ যে আর একটি গীত আর কোথাও আছে তাহা ত স্মরণ হয় না! কোন সঙ্গীতে দর্পের প্রবলতা, কোন সঙ্গীতে শত্রুকে সমরাঙ্গনে আহ্বান ঘোষণা! কোন সঙ্গীতে অপর জাতির প্রতি ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষপাত, কোন সঙ্গীতে উৎপীড়নের প্রতি ধিক্কার! নির্ভীকতা, স্বাধীনচিত্ততা সকল সঙ্গীতেই আছে, কিন্তু স্বাদেশানুরাগের এরূপ ব্যাপকতা অন্য গীতে নাই।

ইহার কারণ এই যে অপর সকল দেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রায় কোন-না-কোন রূপ উত্তেজনায় রচিত। হয় দেশে শত্রুভয় হইয়াছে, সেই অবস্থায় কোন কবি দেশের লোককে উত্তেজিত করিবার মানসে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথবা কোন জয়শীল জাতির উৎসাহ বানাইবার জন্য কোন সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, কিম্বা অত্যাচার

প্রপীড়িত কোন জাতিকে সাহস দিবাব জন্য কোন জাতীয সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইযাছে। বঙ্কিমচন্দ্রেব গীত বচিত হইবাব কালে এই সকল কাবণেব কোনটি বর্ত্তমান ছিল না। যদি বলা যায দেশ পবাধীন সে অবস্থাও প্রাচীন, তাহাতে নবীন উদ্বেগ বা উত্তেজনাব কোন কাবণ ছিল না। তখন দেশে সর্বত্র শান্তি, বাজনৈতিক অথবা অপব কোনরূপ আন্দোলনেব বিশেষ প্রভাব ছিল না। নিস্তবঙ্গ সমুদ্রেব ন্যায দেশ স্থিব ছিল, বাহ্য কোন ঘটনায কবিব চিত্ত বিচলিত অথবা উত্তেজিত হয নাই।

এই দেশে প্রচলিত অপব জাতীয় গীতসমূহেব সহিত তুলনা কবিলেও বঙ্কিমচন্দ্রেব গীতে একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। প্রায অপব সকল গীতেই ভাবতেব পূর্বগৌববেব এবং বর্ত্তমান দুর্দশাব কিছু না কিছু উল্লেখ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রেব গীতে দুইটিব একটিও নাই। অতীত গৌববেব স্মৃতিবও উল্লেখ নাই, বর্ত্তমান দুর্দশাবও উল্লেখ নাই। অতীতেব দোহাই দিযা অথবা গৌবব কবিযা কি ফল? লাভেব মধ্যে অতীতেব গৌবব কল্পনায আমবা ভবিষ্যতেব উন্নতিকল্পে শিথিলপ্রযত্ন হইযা পড়ি, স্বাভাবিক আলস্য আবও বাড়িযা যায। বর্ত্তমানেব অনুতাপেই বা কি ফল? পুরুষকাব অনুতাপকে মনে স্থান দেয না। যাহা আছে তাহাকেই উন্নত কবিব, পুরুষেব ইহাই উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা। যে দেশকে মাতা বলিযা বন্দনা কবি সে দেশেব নিন্দা কবিলে মাতৃনিন্দা কবা হয। মাতৃভক্ত কবিব সে প্রবৃত্তি হয নাই।

এই গীতেব ব্যাপকতাই ইহাব সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। প্রথমে দৃষ্টি বহির্মুখী। জননী সুজল সুফল দিযা সন্তানেব ক্ষুৎপিপাসা নিবাবণ কবিতেছেন, অঞ্চলে মযলবায়ু সঞ্চলন কবিযা শ্রান্তিহবণ করিতেছেন, শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্নেব সংস্থান কবিতেছেন। তৎপবে জননীব রূপ বর্ণনা ঃ—

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম
সুহাসিণীং সুমধুবভাষিণীম্।

তখনও দৃষ্টি বহির্মুখী। নযনানন্দমযী, শ্রবণাভিবামা জননী। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল নযনেব আনন্দ উৎপাদন কবিতেছে, সুন্দব শুচি হাস্য, সুমধুব ভাষা শ্রবণকে তৃপ্তিদান কবিতেছে। দান কবিযাই তিনি সুখী—

সুখদাং ববদাং মাতবম্।

এই যে ধনধান্যবহুসৌষ্ঠবশালিনী, সুখদায়িণী, ববপ্রদায়িনী জননী, সপ্তকোটি যাঁহাব সন্তান, কে তাঁহাকে অবলা বলে?

নমামি তাবিণীং বিপুদলবাবিণীং,

তাঁহাকে নমস্কাব কবি।

ক্রমে দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইল। সুখদাং ববদাং বলিলে ত সব বলা হয় না। তিনি দান কবেন, আমবা গ্রহণ কবি, এ জননীব সহিত ত কেবল সে সম্বন্ধ নয। মথিত উচ্ছ্বসিত মর্মস্থল হইতে তখন আবেগপূর্ণ ধ্বনি উঠিল ঃ—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

সব তোমার। তুমিই সব। তোমার বিদ্যা আমাদিগকে দিয়াছ, তোমার ধর্ম আমাদিগকে দিয়াছ, তোমার হৃদয়, তোমার মর্ম আমাদিগকে দিয়াছ। তুমিই এই দেশস্থ পঞ্চ প্রাণবায়ু! অন্তরে বাহিরে তুমি আমাদিগকে আবরণ করিয়া রহিয়াছ, অন্তরে বাহিরে তোমারই বিকাশ! তোমা হইতেই সাকার দেবদেবীর কল্পনা!

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

তোমার জলে ফলে অন্নে পুষ্ট এই দেহ, এই বাহুতে শক্তি তোমার নয় ত কাহার? তুমি যেমন হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক কর এমন আর কে করিতে পারে? তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই ত মন্দিরে প্রতিমা গঠিত হইয়াছে।

এই ভাব, এই কল্পনা একেবারে নূতন। আর কোন কবি দুর্গা, কমলা ও বাণীর মূর্ত্তিতে স্বদেশের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। এই কবি নিঃসন্দেহে বলিলেন,

ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণী!

দশপ্রহরণধারিণী, আবার দশদিক্‌পালিনী, দশ বাহু বিস্তার করিয়া দশ দিক হইতে সন্তানকে ডাকিতেছেন, অসুরকে দলন করিয়া সন্তানকে অভয় দান করিতেছেন!

এই ব্যাপকতার তুলনা নাই। বহির্মুখী, অন্তর্মুখী সর্ব্বতোমুখী ভক্তি, উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় হৃদয়ের বেলাতট মগ্ন করিয়াছে। এই ভাষা, এই ভাব শুধু কবির নয়, প্রকৃত ভক্তের। হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থান হইতে সোপানাবলী নামিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, ভক্তির জোয়ারে সেই সোপানশ্রেণী আবার একে একে ডুবিয়া গিয়াছে। পরিশেষে আনন্দ পরিপ্লুত চিত্তে ভক্তিনম্রহৃদয়ে বহুগুণশালিনী বহুঋদ্ধিশালিনী জননীর বন্দনা ঃ—

নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্।
বন্দেমাতরম্!
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।

বলিযাছি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সবস্বতী প্রভৃতি দেবীব প্রতিমায স্বদেশের কল্পনা নূতন,

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহাবিণী
বাণী বিদ্যাদাযিনী
নমামি ত্বাম্।

কিন্তু যিনি এই কল্পনা করিযাছিলেন তাঁহার পক্ষে নূতন নহে। এই গীত বিবচিত হইবাব কযেক বৎসব পূর্বে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী অলৌকিক অহিফেনের প্রসাদাৎ দিব্য চক্ষে শারদীয়া প্রতিমার সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সপ্তমী পূজার দিন প্রতিমা দেখিতে গিয়া কমলাকান্ত যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেব লোকমনোমোহিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই আবেগময়ী উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"দেখিলাম—অকস্মাৎ কালেব স্রোত দিগন্ত ব্যাপিযা প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবাব উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিযা ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিযা ডাকিতেছি। আমি এই কালসমদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদযবৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিতা তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কালস্রোতে পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রাহিরণী শত্রুমর্দ্দিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা!"

কমলাকান্তের এই পূর্বদৃষ্ট প্রতিমা আবার এই গীতে দেখা দিয়াছেন। পূর্বে যে মূর্ত্তি শারদীয়া প্রতিমায় এখন সেই মূর্ত্তি সকল প্রতিমায়। যাহা আংশিক ছিল তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, যাহা একমুখী ছিল তাহা বহুমুখী হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় মূর্ত্তিময়ী বঙ্গপ্রতিমার দর্শন, তৎপরে অনুধ্যান। এই ধ্যানের ফল সে দেবীমূর্ত্তির সর্বত্র

ব্যাপকতা। ক্রমে ধ্যানের তন্ময়তায় অন্তরে বাহিরে সেই একই মূর্ত্তি মূর্ত্ত অমূর্ত্তের ভেদ রহিল না, জননী কখন সাকারা, কখন নিরাকারা, যখন স্বর্ণগঠিতা দশভূজা মূর্ত্তি, কখন সন্তানের হৃৎপদ্মবিহারিণী।

ভাই বাঙালী, মুখে যখন বল, বন্দে মাতবম্, মনে তখন কি সঙ্কল্প হয়, হৃদয়ে তখন কি ভাব উদয় হয়? পঁচিশ বৎসরের এই গান, এতকাল ত বাঙ্গালীর মুখে পথে ঘাটে শুনিতে পাওয়া যায় নাই? সম্পদের সময় মাকে মনে পড়ে নাই, আজ মাতার ঘোর বিপদের দিনে, সন্তনের ঘোর বিপদের দিনে মাতাকে মনে পড়িয়াছে। মনে যখন পড়িয়াছে তখন বুকে বল বাঁধ, দৃঢসঙ্কল্প হইয়া কমলাকান্তের কথায় বল ঃ—

"এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিণি!—এসো মা গৃহে এস—সপ্তকোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, চতুর্দ্দশকোটি করযোগ করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। সপ্তকোটি মুখে ডাকিব মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিতি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে। শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে। ডাকিব—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি। অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! **উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।"

সর্বকালদর্শী, সর্বব্যাপী, সর্বেশ্বরকে স্মরণ করিয়া এ প্রতিজ্ঞা কর, এই ব্রত গ্রহণ কর, ইহার সাধনে সর্বান্তঃকরণে যত্নবান হও।

যে মহাপ্রভাবশালী মহাপুরুষ এই গীতমন্ত্র দেবভাষায় ও বঙ্গভাষায় মন্দারমল্লিকামাল্যবৎ গ্রথিত করেন, যিনি আমাদের মন্ত্রগুরু, তিনি একাদশ বৎসর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই গীত ক্ষণিক কল্পনার রচনা নয়, লিখিতে যে টুকু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাই ইহার রচনার কালের পরিমাণ নয়। কবির নিজের রচনা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই গীতের অন্তর্নিহিত ভাবলহরী তাঁহার মনে উপচিত হইতেছিল। সমগ্র জাতির বেদনা, জননী জন্মভূমির মর্মপীড়া তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, সেই বেদনা সেই পীড়া নিবারণের মন্ত্রস্বরূপ এই সঙ্গীত ধীরে ধীরে তাঁহার কল্পনায় শতদল পদ্মের ন্যায় উন্মেষিত হইয়াছিল। তিনি কি মনে করিয়াছিলেন যে এই মহান্ সঙ্গীত একখণ্ড উপন্যাস গ্রন্থে চিরকাল নিহিত থাকিবে? তিনি প্রাচীন ঋষির ন্যায় ত্রিকালদর্শী ছিলেন না, তথাপি এ কথা বিশ্বাস হয় না। যে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনাস্রোত কল্পনার অথবা প্রতিভার চক্ষে কিছুমাত্র দেখিতে পান নাই। এই অপূর্ব সঙ্গীতের ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, গাম্ভীর্য্যে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই গীত রচিত হইবার পূর্বে বঙ্গদেশে আরও অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল,

সাধিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র একা বুঝিয়াছিলেন যে এ সুব পবিবর্ত্তন কবিবার দিন আসিবে। নূতন উৎসাহে, নূতন বলে, অনুতাপ পবিতাপ ত্যাগ কবিযা বাঙালীকে আব এক গান করিতে হইবে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দিব্য কর্ণে তিনি শুনিযাছিলেন, সপ্তকোটি বাঙালী এককালে বলিতেছে, বন্দেমাতরম্! পঁচিশ বৎসব পবে আজ আমরা সহজ শ্রবণে শুনিতেছি, সপ্তকোটি বাঙালী বলিতেছে, বন্দেমাতবম্।*

আনন্দমঠ গ্রন্থে উৎসর্গপত্রে কবি স্বর্গগত কোন প্রিয় বন্ধুব উদ্দেশে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধাব কবিয়া লিখিযাছিলেন, "স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ বাখিবাব নিমিত্ত এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল।" স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আজ আমবাও অনুভব করিতেছি। স্বর্গস্থিত কবিব বাণী আজ আমাদের মানসশ্রবণে কুহবিত হইতেছে। আজ যে মেঘগর্জনের ন্যায়, সমুদ্রকল্লোলের ন্যায়, বিশ্বস্তবের বথচক্রেব ঘর্ঘব ধ্বনিব ন্যায়, বাঙালীর কোটি কণ্ঠ হইতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠিতেছে, এই শব্দ কি স্বর্গে কবিব কর্ণে অমৃতের ন্যায় স্পর্শ কবিতেছে না? ক্ষুব্ধ, মথিত সমুদ্রবৎ বাঙালীব হৃদয় তবঙ্গে তরঙ্গে ডাকিতেছে, বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! প্রবল ঝঞ্ঝাতাড়িত বাঙালির হৃদযে বাযু গর্জিযা বলিতেছে, বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতবম্! আবাব আশা বলিতেছে, বন্দে মাতবম্! হৃদযের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলিতেছে, বন্দে মাতরম্! নদীর কলকণ্ঠে, দক্ষিণ বাতাসেব মর্মবে কহিতেছে, বন্দে মাতবম্! মাতা সর্বত্র, সর্বত্র তাঁহার বন্দনা! কবিব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বাঙালী তাঁহাব মন্ত্রশিষ্য হইল।

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে!

ভাই, মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ, এখন সাধন কর। সাধন কর,

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

সাধন কর,

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

সাধন কর, "আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সুজলা, সুফলা, / মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা," সুখদা বরদা জননী জন্মভূমি।

মুখে বল, বন্দে মাতরম্।
কণ্ঠে গান কর,

বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্!
শুভ্রজোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাম্!
নমামি কমলাম
অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরং বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।

(প্রবাসী, পৌষ ১৩১২)

"বয়কট" এবং "স্বদেশীয়তা"

প্রমথনাথ চৌধুরী

গত ৭ আগস্ট টাউন হলে আমাদের সমাজের নেতারা সভা কক্ষের প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে, যতদিন না গভর্নমেন্ট বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করেন ততদিন বাঙালি বৃটিশ মাল বয়কট (boycott) করবে। তারপরে, অনেক সভাসমিতিতে বক্তাদের মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশ আস্ত থাকুক কিম্বা কাটা পড়ুক আমরা কেবলমাত্র স্বদেশীবস্তু ব্যবহার কর্‌বার পণ ছাড়ব না। একদলের মতে বয়কট-ব্যাপারটা শুধু একটা রাজনীতির চাল, উদ্দেশ্য, প্রজাব অধিকার বজায় রাখা। অপর দলের মতে—'স্বদেশীযতা' শুধু একটা অর্থনীতির চাল, উদ্দেশ্য—প্রজার দারিদ্র মোচন। নেতা এবং বক্তার দল বাদ দিলে বাদবাকী আমাদেব সকলেব নিকট বয়কট এবং স্বদেশীয়তা দুয়ে মিলে একটা ব্যাপাব হয়ে উঠেছে। বয়কটই বল আর স্বদেশীযতাই বল,—সাধারণের কাছে নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ প্রভেদ নেই। আসল জিনিসটা কি চাই, কি করতে হবে এবং কেন করতে হবে সে বিষয় সকলেরই একটা মোটামুটি ধাবণা জন্মে গেছে। কিন্তু প্রচারকের দল পরস্পরের সঙ্গে মিল কি আছে সে বিষয়ে বড় নজর দেন না, কোথায় গরমিল আছে তাই নিয়েই চিৎকার করতে ভালবাসেন। এমন লোকও পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যাঁর মনোভাব এই যে, তাঁর মনের আঁস্তাকুড় হতে উদ্ধৃত কানাকড়িটি যদি না চালাতে পারেন তা হ'লেই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ। অবস্থা যখন এইরকম, তখন বয়কট এবং স্বদেশীয়তা এ দুই একই জিনিস কিম্বা বাস্তবিকই দুয়ের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে, আর যদি পার্থক্য থাকে ত পার্থক্য কোথায় সেটা আমাদের বুঝে দেখা কর্তব্য।

প্রথমতঃ আমি 'স্বদেশীয়তা' সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে চাই। স্বদেশীয় বস্তু প্রচাবের কথাটা ভারতবর্ষে অনেক দিন হল উত্থাপিত হয়েছে। নিত্যব্যবহায্য সকল জিনিস বিদেশ থেকে আনাতে হলে আমাদের ধনক্ষয় হয় এইরূপ একটা ধারণা অনেকেরই অনেক দিন থেকে আছে। কৃষি এবং বাণিজ্যের মতো শিল্পও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা বিশিষ্ট উপায় এ কথাটা বুঝতে বেশি বুদ্ধির আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের শিল্পলোপ যে বর্তমান দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ এমত স্পষ্ট। সুতরাং শুধু প্রাণের দায়ে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য একথাও কেউ অস্বীকার করবেন না। এ সব জেনেশুনেও দু'চারজন ছাড়া বড় কেউ, কি করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করেননি। আমরা শিক্ষিতের দল, মনে করতুম যে কল-কারখানার বিরুদ্ধে শুধু হাতের কাজের লড়াই চলে না। সুতরাং নানা কারণে যখন কল-কারখানা আমরা এদেশে চালাতে অপারগ তখন মিছিমিছি economical laws-এর সঙ্গে বিবাদ করে বাঁচবার প্রয়াস ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর যারা অশিক্ষিত, কি কারণে কি ফল হয় যাদের জানাও নেই এবং বোঝবারও ক্ষমতা নেই, তারা নিজেদের অদৃষ্ট দুরবস্থার কারণ বলে স্বীকার করে নেয়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ সকলেরই ভিতর তারা ভগবানের হাত

দেখে। তাদের নিজের চেষ্টায় যে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে; তাদের দুর্দশার কারণ যে মানুষের চেষ্টায় দূর হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না এবং আমরা শিক্ষিত লোকেরাও অনুগ্রহ করে সে ধারণা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিই নি। আমাদেরও তাতে বিশেষ দোষ ছিল না। শুধু বক্তৃতায় কারো পেট ভরে না। এবং আমাদের কোটি-কোটি ইতরসাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকা ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নাই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজিতে যাকে বলে supply তার উপর নির্ভর করে। নিজের দেশের গড়া জিনিস চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার আমরা সব পুঁথি-পড়া লোক demand এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply এর সৃষ্টি করতে পারিনে। মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তুজগতকে আমরা কায়দা করতে পারিনে। পিপাসা বাড়ালেই যে জলের পরিমাণ অমনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। এই সব কারণে এতদিন আমাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিশেষ কোন সাহায্য হয়নি। শিল্পজাত দ্রব্য কাজে লাগে বলে আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর হলে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের হাত, পা আছে, পেট আছে কিন্তু চোখ নেই, সেই জন্য কলেগড়া জিনিষ আমাদের কাজে লাগে, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু হাতে গড়া জিনিষে অনেক সময় উভয়গুণই বর্তমান থাকে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাজের লোক নয়, এমন দু'চারজন,—দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর করতে শিখছিলুম। Economy ছেড়ে aesthetics ধরে যতটুকু হয় স্বদেশী শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা কচ্ছিলুম। অরুচি রোগটা সৌখিন লোকদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না এবং দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের 'স্বদেশীয়তা' এই অবস্থায় ছিল।

এখন বয়কটে আসা যাক্। বয়কটের অর্থ হচ্ছে, তোমার জিনিষ ছোঁব না। তুমি সস্তাতেই দাও আর ভাল জিনিষই দাও আমি তোমার জিনিষ কিনব না। ফ্রি রকম জিনিষ যদি বেশি দামে কিনতে হয় তবুও তোমার ছাড়া আর সকলের জিনিষ কিনব। ভাল, তুমি ছাড়া যদি আর কারও কাছে জিনিষ না পাওয়া যায় তাহলে কিছু কিনবই না। আমার লোকসান হয় তাও স্বীকার, আমাকে নানারকম স্বার্থত্যাগ করতে হয় সেও স্বীকার। এ রকম মনোভাব বহুলোকের মধ্যে মনে একটা বিশেষ কোন আঘাত না লাগলে জন্মায় না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে শুধু জীবনযাত্রাটা এতই কঠিন ব্যাপার যে, তারা নিজের বর্তমান স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বক্তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করো বলাটা যত সহজ শ্রোতার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কোন্ দূর ভবিষ্যতে তাঁতি, ছুতোর, কুমোর, কামারের অবস্থা একটু ভালো করবার জন্য বর্তমানে নিজে দুরবস্থায় পড়তে খুব কম লোকই রাজি। বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে অথচ আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র

আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙালিমাত্রেই ব্রিটিশ নাম বয়কট করব এ কঠিন পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দুদিনের জন্যও নিজেরও স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করছে। কেবল Economics-এর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাব এ দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তারা পাটিসানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তাঁরা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা বয়কট আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারে উপায়স্বরূপ মনে করি। ইংরাজজাতের পকেটে টান পড়লে, চাই-কি বাঙালির প্রতিও তাঁদের নজর পড়তে পারে, এই বিশ্বাসে এই আশায় বয়কটেব জন্ম। আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন করি সে সব ইংরাজেব কাছে আমাদের শেখা। বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশী চিজ— সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগদান করেছে। আমাদের দেশে ধর্মঘট করা দোকান-পাট বন্ধ করা প্রভৃতি, রাজার অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করবার সনাতন প্রথা। এই ধর্মঘট, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের হাতে একমাত্র অস্ত্র। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। ধর্মঘটও চিরকাল রাখা যায় না, বয়কটও চিবকাল রাখা যায় না। দেশের শিল্পের উন্নতির প্রধান উপায় দেশি জিনিস প্রস্তুত করা। পরের কিন্‌ব না বলায় কোনই লাভ নেই। যদি-না নিজের মাল বাজারে ফেলতে পারি। সুতরাং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, স্বদেশী বস্তু প্রচার করা নয়, প্রস্তুত করবার উপর নির্ভর করছে। শিল্পের উন্নতি ধীরে-সুস্থে হয়। স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর। বয়কটের প্রাণ ক্ষতিস্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেক স্বজাতিবৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চা করার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায় যে উদ্দেশ্যে একাজ করা তার যতদিন পুরোপুরি নিষ্পত্তি না হয়ে যায়। ততদিন যতই অসুবিধা হোক সকলেরই কর্তব্য প্রাণপণে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা। যদি আমরা বয়কটের কৃতকার্য হই, যদি ইংলন্ডের লোকের পকেটে সত্য-সত্যই টান পড়ে, তবেই বোঝা যাবে যে আমাদের দুর্বলের উপায় সফল হল কি না? আমাদের উপায় আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ না করতে পারলে, সে উপায় বাস্তবিকই ঠিক কি মিছে, তা'বলবার আমাদের অধিকার জন্মাবে না। শেষকথা এই যে বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর গৌণফল অতি শুভ। এই ঝোঁকে আমাদের "স্বদেশীয়তা" প্রাণলাভ করেছে। এই ঝোঁক আমরা কিছুদিন রাখতে পারলেই আমাদের স্বদেশী শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে কার্য আরম্ভ করা গেছে অর্থনৈতিক হিসাবে তার আসল ফল লাভ করবো। উপরে যা বললুম তার সারমর্ম এই;—যাঁরা বলেন, বয়কট, রাজনীতির কথা তাদের কথাও ঠিক, যাঁরা বলেন, 'স্বদেশীয়তা' অর্থনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক। আর আমরা অপামরসাধারণ যারা মনে করি ও দুই-ই একদেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের প্রাণ; আমাদের মতই সকলেরই চাইতে বেশি ঠিক।

ব্রতধারণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি, বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার এই উদ্‌যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু-না-কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে দুর্যোগ বলিব কি? এই-যে দিগ্‌দিগন্ত ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই-যে বিদ্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল—এই দুর্যোগকেই যাহারা সুযোগ কবিয়া তুলিয়াছে তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনি স্কন্ধে হাল লইয়া কৃষককে কোমর বাঁধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে-এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিযা তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড়ো দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে : ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে

রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আব কোনোই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভেব আশা কেবল যে বিড়ম্বনা তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়তো সহ্য হইয়া যাইবে—অপমানে যাহা শিখিয়াছি তাহা হয়তো আবার ভুলিয়া গিযা আবার গুরুতর অপমানের জন্য প্রস্তুত হইব। যে দুর্বল নিশ্চেষ্ট তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য—দুঃখ তাহাকে দুঃখই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই দুঃসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একত্র হইযাছি।

কোথায় আমবা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্ দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমাদেব ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মতো আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদেব কোনোমতেই চলিবে না—তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক—পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকাব দুর্দিনে আমাদের পুরুষেরা কী কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

আশার ছলে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!

যে নির্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয়তো এখনো মনে কবিতেছে, যদি এখানকার রাজদ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে। সমুদ্রের এ পারেই কী আর ও পারেই কী, অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে—তাঁহাদের বহুদিনের বিশ্বাসক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে—এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটীর আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে যে পুরুষেরা কীভাবে সাড়া দিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্যা নহি? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে? দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না?

ভগিনীগণ, আপনারা হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কী করিতে পারি—দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কী না করিতেছি তাই দেখুন। আমরা পরনের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতি দোকানের, আমরা শয়নে স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া, তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া, বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না। আমরা ভালো হউক, মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না। সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে। আমি এ কথা স্বীকাব করিব না যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্টি হইবে। কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাস-ক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয় তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী বেনারসি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন কোথায় তাকে সৌন্দর্যবোধের দাবি?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ কবিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ—ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মতো চাঁদার খাতায় সহি দেওয়া সহজ, কিন্তু বড়ো কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে তখন ধর্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত তাহাতেই আনন্দ—সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, দুঃসাধ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে ; তখন সুবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে ; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্র শক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই ; স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্যদ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গপ্রদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিসকে বক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালোবাসিতে জানি। ভালোবাসা চাকচিক্যে ভুলিয়া নূতনের কুহকে চারিদিকে ধাবমান হয় না। আমাদেব যাহা আপন, সে সুশ্রী হউক, আর কুশ্রী হউক, নারীর কাছে অনাদব পায না—সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ত দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে। যে বাড়িব ভিতবে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা—তাহারা কালোই হউক আর ধালোই হউক—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসাহিত্যেও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশী বেশ ধার করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হবে ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন, যে পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রীকন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতনত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্যার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের খোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব, আজ আমরা যদি আর-সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশঙ্কা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশী জিনিস ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেস্টর. ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

সে কথা জানি। ম্যাঞ্চেস্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভারপুলে এঞ্জিনের আগুন না নিভুক। আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে চেষ্টা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা

সহজে না হউক, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে—নতুবা দুই দিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই-সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিনে আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না ; যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব ততদিন পর্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে—সে যেন অহংকার অনুভব না করে। অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি। আমরা নিজেকে ঈশ্বরে এই অভিপ্রায়ের অনুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সেই কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

যাহা-কিছু পরবশ, তাহা দুঃখ ; যাহা-কিছু আত্মবশ, তাহাই সুখ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্য কামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় মঙ্গল হইবে—তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ভাদ্র ১৩১২

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত]

উৎসর্গ

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীদিগের করকমলে অর্পণ কবিলাম।

—লেখক

ভূমিকা

গত পৌষেব বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুনর্মুদ্রিত হইল।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেব দিন অপবাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামেব অর্ধসহস্রাধিক পুবনাবী আমাব মাতৃদেবীব আহ্বানে আমাদেব বাড়িব বিষ্ণুমন্দিব উঠানে সমবেত হইযাছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমাব কন্যা শ্রীমতী গিবিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয। বন্ধুবর্গের অনুবোধে ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ কবিলাম।

সম্প্রতি এডুকেশন গেজেট বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাব সংস্কৃত অনুবাদ বাহির হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীবামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী

চৈত্র ১৬১২

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তাব উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হল। লোকে পরমসুখে বাস করতে লাগল।

এমন সময় মর্তে কালির উদয় হল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায় আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে, আমি বাঙলা ছেড়ে চললাম। রাজা কেঁদে বললেন—না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে

বসলেন। দববারে বসে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনলেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙলাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচাব ফিরে এল। বাঙলাব লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনেধানে দেশ পূর্ণ হল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর বাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার রাজা হলেন। হিন্দুর জাতিধর্ম নষ্ট হতে লাগল। হিন্দুর ঠাকুরঘব ভেঙে, মোছলমান মসজিদ তুলতে লাগলেন। অর্ধেক হিন্দুর মোছলমান হল হিন্দু-মোছলমান এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস করে মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠানবাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেনশা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমার হিন্দুও যেমন, মোছলমানও তেমনি, হিন্দু মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল, আমি বাঙলা ছেড়ে চললেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না, আমি হিন্দু-মোছলমান সমান দেখব; তাদের ভাই-ভাই, একঠাই করব; তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাকব। দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন। দিল্লীর বাদশা বাঙলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিন্দু-মোছলমান সমান দেখবেন, তখন হিন্দু মোছলমান ভাই-ভাই হবে; ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বসলেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য করে রাজমন্ত্রী করলেন। হিন্দু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হলেন। তিনি যমন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাঙলার রাজা হলেন। তিনি হিন্দু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিন্দু-মোছলমান ভাই-ভাই হল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হলেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলমগীর। তিনি হিন্দু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হয়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাঙলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর করে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হল। লক্ষ্মী তখন আলমগীরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাঙলার দেওয়ান করে দিলেন। বাদশার দশা দেখে

বাদশাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তারাই হল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হয়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চলল। সাগরের জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত। তারা চোরডাকাত দমন করল মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলনা এনে পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাঙলার লোকের বুদ্ধিলোপ হল। বুড়ামানুষে শিশু সাজল; ইংরেজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাঙলার প্রজা কাঞ্চনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগল। দেশের জিনিসে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর করতে লাগল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজতে লাগল। রাজা হাততালি দিতে লাগলেন; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বলতে লাগল। লক্ষ্মী বললেন—আর না, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, বাঙলার লোকের এই দশা, আমার আর বাঙলায় থাকা চললো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাত কোটি বাঙালি কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চললেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হলেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগীর বাদশার তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগীররের নাতি ঠাওরা'ত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করছে; থাক্‌, এদের দু-দল করে দিচ্ছি; একদিকে যাক মোছলমান, একদিকে থাক্‌ হিন্দু। এরা ভাই ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই বলে তিনি বাঙালিকে দু-দল করে দিলেন—এক দিকে গেল হিন্দু এক দিকে গেল মোছলমান। পূর্ব-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাকল হিন্দু।

লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চলল না। আমার হিন্দু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিন্দু মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হল, তখন আমার বাঙলায় থাকা চলল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়, সে দিন বড় দুর্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালি আছাড় খেয়ে ভুমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না, তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই

করতে চাইলেন; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা, তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুতুল খেলা করব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালিকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মা-কালিতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্যোগ। ঝম্‌ঝম্-বৃষ্টি, হুহু করে হওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালি মা কালির কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল। বললে মা, আমাদের রক্ষা কর, বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর আবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিস থাকতে পরের জিনিস নেব না। মায়ের মন্দির হতে মা বলে উঠলেন—জয় হউক, জয় হউক; ঘরের লক্ষ্মী ঘবে থাকবেন; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা বাঙালীর লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায অচলা হলেন। বাঙলাব হাট-ঘাট জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হল।

বাঙলার মেয়ে ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বলল না। হিন্দু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হলদে সুতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর-বচ্ছর ঐ দিনে বাঙালির মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালির ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বলবে না। হাতে হাতে হলদে সুতো রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম করে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলার থাকবেন সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।।
ভেদ নাই ভেদ নাই।। ভাই ভাই, একঠাঁই।
ভাই ভাই একঠাই ভেদ নাই ভেদ নাই।।

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন।

বাঙলার মাটি বাঙলাব জল বাঙলীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙলার বায়ু বাঙলাব ফল বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, সত্য হউক সত্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্। সত্য হউক, হে ভগবান্।
বাঙলার ঘর, বাঙলার মাঠ, বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙলার বন, বাঙলার হাট, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক, এক হউক, এক হউক,
পূণ হউক, হে ভগবান। এক হউক, হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম্

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি, অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিঁদুর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে হইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পরে ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।

বিজয়া-সম্মিলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশে কতকাল হইতে কত বিজয়া দশমীর পরে ঘরে ঘরে প্রীতিসম্মিলনের সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেছে, কিন্তু অদ্য এখানে এই-যে মিলনসভা আহূত হইয়াছে, আশা করি, আমাদের দেশের ইতিহাসে এই সভা চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আশা করি, আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়া-সম্মিলন যে-একটি নূতন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, সেই জীবনধারা কোনো দুর্দিনে কোনো সুদূরকালেও যেন শীর্ণ না হয় ; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মিলন-উৎস বিধাতার সংকেতমাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমাদের পাপে কোনো অভিশাপ কোনো দিন তাহাকে যেন শুষ্ক না করে।

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম ; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম ; এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে-উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয় ; সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণমণ্ডিত এই-যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালি জননীর কোলে জন্মগহণ করিয়া যে-কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে। সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুলধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পুণ্য হইয়াছে, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংগত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়। আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধব সম্মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।

যাহা আমাদের চিরপরিচিত তাহাকে আমরা যথার্থভাবে চিনি না, এমন ঘটনা আমাদের নিজে জীবনে এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে একান্তই জানি বলিয়া মনে করি—হঠাৎ একদিন ঈশ্বর আমাদের চোখের পর্দা

সরাইয়া দেন—অমনি দেখি যে তাহাকে এতদিন বুঝি নাই, দেখি যে আজ তাহার সমস্ত তাৎপর্য একেবারে নূতন করিয়া উদ্দীপ্ত হইল। সেইরূপ ঈশ্বরে কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম—এতদিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই, যাহাকে সিংহাসনের উপরে বসাইবার তাহাকে আমাদের ঘরেব দাওয়ার উপরে বসাইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি, যে মিলন আমাদিগকে বব দান করিবে, জয় দান করিবে, অভয় দান করিবে, সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্যরস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে—তাহা কেবল তৃপ্তি নহে, তাহা শক্তি দান করে।

বন্ধুগণ, আজ আমাদের চোখের পর্দা যে কেমন সরিয়া গেছে সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্তা বাংলায় কাহাকেও নূতন কবিয়া শুনাইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি : জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায়, কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদেব যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেইজন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালির বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল—আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেইজন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে, আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না—আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে—সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল। বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন-ধারণ করিয়া আছি, আমরা ধন্য হইলাম।

বন্ধুগণ, এতদিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র, একটা ভাবমাত্র ছিল—আশা করি, আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যাহাকে আমরা সত্যরূপে না লাভ করি তাহার সহিত আমরা যথার্থ ব্যবহার স্থাপন করিতে পারি না, তাহার জন্য ত্যাগ করিতে পারি না, তাহার জন্য দুঃখ

স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে যতই কথা শুনি, যতই কথা কই, সমস্তই কেবল কুহেলিকা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই-যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে—যাহা আমাদের পিতা-পিতামহগণকে বহুযুগ হইতে লালন করিযা আসিয়াছে, যাহা আমাদের অনাগত সন্তানদিগকে বক্ষে ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্তি অমৃতবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে, আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই সর্বতোভাবে ভালোবাসিতে পাবি—কেবলমাত্র ভাবরসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিযা না দিই। আমরা যেন ভালোবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিযা তুলি, তাহার নবনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালোবাসি, তাহাকেই আমবা সকল দিক দিযা এমনি করিয়া সাজাই, সকল দিক হইতে এমনি করিয়া সেবা করি, এবং সেই আমাদের সেবাব সামগ্রী প্রাণেব ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই না।

আমি যে একটা আমি নহি, আমাব যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময় চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি, এই একান্ত সত্য যতদিন আমরা না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইযাছি—ততদিন কেবলই আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেরানি সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার বিসর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কী? তাহার কারণ, তাহারা নিজেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিত, ততদিন তাহারা ভুল জানিত। ইহাই মায়া। এই মায়াই তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে, অপমানিত করিয়াছে। মানুষ যে মৃত্যুকে ভয় করে সেও এই ভ্রমবশতই করে। সে মনে করে, আমি বুঝি স্বতন্ত্র, সুতরাং মৃত্যুতেই আমার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সহিত মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিলেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়, কারণ তখন আমি জানি সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই জাপানের শত সহস্র বীর দেশের জন্য অনায়াসে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। আমরা যে নিজের প্রাণটাকে টাকার থলিটাকে একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া বসিয়া থাকি, নিজেকে একা বলিয়া জানাই ইহার একমাত্র কারণ। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই 'আমি' বলিয়া জানিতে পারি তবে আমার ভয়কে, আমার লোভকে, দেশের মধ্যে মুক্তিদান করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারি, অসাধ্য সাধন করিতে পারি। তখন যে নিতান্ত ক্ষুদ্র সেও বৃহৎ হয়,

যে নিতান্ত দুর্বল সেও সবল হইয়া উঠে। আজ কতকাল পবে আমরা বাংলাদেশে এই সত্যের আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য যাহার কাছে যাহা প্রত্যাশা কবি নাই তাহাও লাভ কবিলাম। সেইজন্য আমবা আপনাতে আপনি বিস্মিত হইয়াছি। সেইজন্য আজ আমাদের বাঙালির চিত্তসম্মিলনের ক্ষেত্র হইতে যাঁহারা পৃথক হইয়া আছেন তাঁহাদের ব্যবহার আমাদিগকে এমন কঠোর আঘাত করিতেছে—যাঁহারা ভয় পাইতেছেন, দ্বিধা করিতেছেন, সকল দিক বাঁচাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের অবজ্ঞা এমন দুনির্বার বেগে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহা বিলাসে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারা বিলাস-উপকরণের জন্য লজ্জিত হইতেছেন, যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিযা জানিতাম তাঁহারা কঠিন ব্রত গ্রহণ কবিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, যাঁহারা বিদেশী আড়ম্বরের অগ্নিশিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই সাংঘাতিক প্রলয়দীপ্তি আর প্রলুব্ধ করিতেছে না। ইহার কাবণ কী? ইহার কারণ, আমরা সত্য বস্তুর আভাস পাইয়াছি, সেই সত্যেব আবির্ভাব মাত্রেই আমরা বৃহৎ হইয়াছি, বলিষ্ঠ হইয়াছি।

এখন ঈশ্বরের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা করি, এই সত্য যেন ক্রমশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, এই সত্যকে যেন আবার একদিন আমাদের শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলিত হইতে না দিই, অদ্যকার সংঘাতজনিত উত্তেজনা যখন একদিন শান্ত হইয়া আসিবে তখনো যেন জীবনের প্রতিদিন এই সত্যকে আমরা অপ্রমত্তচিত্তে সকল কর্মে ধারণ ও পোষণ করিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে, আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না; কোনো আইন পাস হউক বা না-হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না-করুক, আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমাদের পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তানসন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃ সেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। যে পথ কঠিন, যে পথ কন্টকসংকুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না—দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়ো না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালোমন্দ লাভক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্‌যোগে সমস্ত দেশের

চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয় তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে বিজ্ঞভাবে বিবেচকভাবে বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরু নিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্র জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর-এর প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান॥

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান॥

কার্তিক ১৩১২

স্বদেশি-তত্ত্ব

[চাবুকরাম চৌবে]

'স্বদেশ স্বদেশ করিস্ বটে, স্বদেশ যে রে তোদের নয়।'

স্বদেশী কে? যিনি স্বগ্রামের, স্বজেলার, স্বপ্রদেশের ও স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ চেষ্টা করেন তিনিই স্বদেশী। কলিকাতার স্বার্থের জন্য যিনি আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পাবেন, বাংলার মঙ্গলের জন্য যিনি কলিকাতার স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং ভারতের কল্যাণ সাধনে যিনি বাংলার স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারেন, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত, দেশহিতৈষী, মাতৃভূমির সুসন্তান।

স্বদেশীর অনুরাগে শঠতা নাই, প্রেমে আবিলতা নাই, সেবায় স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই। স্বদেশীর জীবন তাহার বিলাস-সিদ্ধির জন্য নহে, জন্মভূমির কর্মসাধনের নিমিত্ত। স্বদেশীর উদ্দেশ্য স্বদেশ, সাধন স্বদেশ, আরম্ভ স্বদেশ, পবিণতি স্বদেশ। স্বদেশ তাঁহার অস্থিমজ্জা, স্বদেশ তাঁহাব প্রাণ, স্বদেশ তাঁহার ধ্যান ধারণা, স্বদেশ তাঁহার যোগসাধন।

স্বদেশকে যে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবে, তাহার স্বতঃই ইচ্ছা হইবে, স্বদেশ-সেবা করিতে। যাহাতে স্বদেশের সর্ববিধ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে স্বদেশের কোনরূপ অকল্যাণ না হয, যাহাতে স্বদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-কৃষি শিল্প-ধর্ম-নীতি-বাণিজ্য-সম্পদ-সম্পন্ন ও যশো গৌরবে গৌরবান্বিত হয়, ইহাই স্বদেশ সেবকের কামনা, লক্ষ্য ও চেষ্টার বিষয়। কল্যাণ বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহা পরিণামে শুভফলপ্রসূ। রুগ্ন সন্তানের কল্যাণের জন্য জননীর যেমন যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও কাতরতা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য দেহহিতৈষীর তেমনই চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক। চিত্তবৃত্তি সংযত করিয়া ধীরভাবে বিচক্ষণতার সহিত সকল অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে, জন্মভূমির ভাবী মঙ্গল কি এবং তাহা কিরূপে সম্ভব।

ইংরাজ রাজ্য আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পর আমরা ইংরাজী পড়িয়া, ইংরাজের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের ধরন করণ দেখিয়া, তাহাদের অনুকরণে স্বদেশ প্রেম বা পেট্রীয়টিজম্ শিখিয়াছি। ইংরাজের ভাব ও ভাষা, শাসন প্রণালী ও আইন, নীতি ও সংসর্গ আমাদিগকে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচরণ শিক্ষা দিয়াছে। ফলে আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই, স্বরাজ দাবি করি, রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করি, রাজপুরুষদিগের কার্য সমালোচনা করি। বিদেশী মাল বয়কট করি, ও স্বদেশী গ্রহণের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা করি। ইংরাজ গুরু হইয়া যাহা শিখাইয়াছেন, আমরা শিষ্য হইয়া তাহা শিখিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ ও রাজনৈতিক অধিকারভোগ ইংরাজ চরিত্রে রক্তগত। স্বদেশ প্রেম ইংরাজের অস্থিমজ্জা ও মেদমাংস ভেদ করিয়া শোণিতে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ধার করা স্বদেশ-হিতৈষণার সাময়িক উত্তেজনা আমাদের স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া মর্ম্ম

স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব আমাদের আছে ভাব, কল্পনা ও ভাষা। তাহাদের আছে বেদনা, অনুভূতি ও ক্রিয়া। আমাদের আছে অভিনয়, তাহাদের আছে জীবনমরণ সমস্যা ; আমাদের আছে স্বার্থসাধন, তাহাদের আছে স্বার্থত্যাগ; আমাদের আছে কপট প্রেম, তাহাদের আছে সহজ সরল প্রাণের টান; আমাদের আছে হুজুগ ও চিৎকার; তাহাদের আছে ধীরতা ও সুবিবেচনা; আমাদের আছে স্বদেশ সেবাব নামে দেশের ও দশের সর্বনাশ করিয়া স্বোদর পূরণ, তাহাদের আছে দেশের ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ ও সর্বস্বত্যাগ। এই হেতু তাহারা প্রতি কার্যে কৃতকার্য, আমরা প্রতি পদে লাঞ্ছিত ও বিফল-মনোরথ।

আমাদের স্বদেশ প্রেম আদ্যন্ত পোষাকী ধরনের, কৃত্রিমতা দুষ্ট। সুতরাং আমাদের স্বদেশীর বোধনের পূর্বেই বিসর্জন হইয়াছে। স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত স্বদেশ প্রেমে মত্ত আমাদের আদি স্বদেশী কবি, বীণাতানে ঝঙ্কার দিয়াছিলো, 'বাজরে বীণা বাজ এই রবে।' এবং ইংরাজের অনুকরণে স্বাধীনতার উত্তেজনায় বীরদর্পে উদ্দীপনা-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন :

'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।'

কিন্তু তিনি জানিতেন, ইংরেজরাজ শান্তিরাজ্য সংস্থাপন করিয়া এদেশকে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব তিনি মামলা মাথায় দিয়া ইংরাজ ধর্মাধিকরণে যুক্ত করে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

আর এক স্বদেশী কবি আমাদের মির্জাফরকে ধিক্কার দিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে টিটকারী দিয়া ওজস্বিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন—

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র-কিরণ।"

কিন্তু স্বয়ং আজীবন ঘৃণিত দাসত্বে বিবেক বিক্রয় করিয়া অন্তিমে আত্মজীবনীর শবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের সম্মুখে গুপ্ত ব্যাধি উদঘাটন করিয়া অমর হইয়াছেন।

আমাদের আর একজন স্বদেশী কবি দাসত্বোপার্জ্জিত ঘৃতান্ন ভোজন করিতে করিতে কল্পনার ঘুমঘোরে সেতারে সুর বাঁধিয়া গাহিয়াছেন—"হেলায় লঙ্কা করিল জয়"। আমাদের স্বদেশী সাহিত্য সম্রাট সকলের গায় 'বন্দেমাতরম্' মনের লঙ্কার ঝাল ছিটাইয়া দিয়া স্বয়ং শ্যাম-অঙ্গে রায় বাহাদুরের চন্দন বিলেপন করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। আমাদের শেষ স্বদেশী কবি সম্রাট, ভক্তিভরে স্বদেশস্তোত্র গাহিয়াছিলেন—

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী! এবং
'প্রথমসামরব তব তপোবনে।'

এই অনুকরণ যুগের বাঙালি কবি এখন বলিয়া ধন্য হইয়াছেন—"The East is wedded to the west on the alter of humanity.'

আমাদের বাক্যে ও কার্যে কত অন্তর।

আমরা ইংরাজী পড়িয়া সাহেব সাজিয়া করি সখের স্বদেশী মেলা।। ইংরাজেরা ও

জীবিত দেশের লোকেরা তাহাদের ভাবে অবস্থার প্রেরণায় জীবন-সংগ্রামে জীবিকার উপায়ের নিমিত্ত উদ্ভাবন করিয়াছিল, 'শিল্প প্রদর্শনী মেলা', স্বদেশীর সামরিক উত্তেজনায় আমাদের বাগ্মী নেতাদিগের বক্তৃতায় চঞ্চল হইয়া আমরা স্বদেশী ব্রত গ্রহণ কবিয়াছিলেম। তাহার ফলে চারিদিকে দেখিতে পাই, কেবল সুবাসিত তৈল এসেন্স, সাবান ও জীবন-বীমা কোম্পানী'। বোম্বাই অঞ্চলে লোকেবা বঙ্গভঙ্গের বহুপূর্বে স্বদেশী করিয়া মোটা কাপড়ের কল করিয়া চীন ও জাপান হইতে অর্থ আনিতে শিখিয়াছিল। এখন আমাদের বাংলায়ও তাহারা বসনের জাল ফেলিয়া ধন ছাঁকিয়া লইতেছে, জীবন-সমস্যার প্রধান রহস্য লৌহ কারখানার যৌথ কারবারে কৃতকার্যতা দেখাইয়া ধনবান ও যশস্বী হইয়াছে। আমরা গড়িতেছি, কেবল পুতুলের ছাঁচ। স্বদেশের নামে অর্থ তুলিয়া আমরা রাতারাতি বড়মানুষ হইয়াছি। স্বদেশী যৌথ বাণিজ্যের হুজুগ তুলিয়া কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, স্টোর সাপ্লাই, ভাণ্ডার ও প্রভিডেন্ট ফান্ড আরও কত বহু বঙ্গের ছাতার ন্যায় বোগাস কোম্পানীর নামে বিধবার মুখের গ্রাস, দরিদ্রের কষ্টোপার্জ্জিত কড়ি কাড়িয়া লইয়া আমরা ত্রিতল অট্টালিকার বৈদ্যুতিক পাখার হওয়ায় সুখে নিদ্রা যাইতেছি। এবং মনে মনে ভাবিতেছি, আমবা কি চতুব।

আমাদের সকল স্বদেশী-চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ কি? আমরা রোগ না বুঝিয়া যে যাহা বলিতেছে, তাহাতেই নাচিয়া উঠিতেছি, আর ভাবিতেছি, মুক্তি বুঝি এই পথে। কেহ নামের ও যশের জন্য, কেহ স্বার্থসাধনের জন্য, কেহ শুধু 'একটা কিছু' করিবার জন্য, কেহ বা কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও বুদ্ধির দোষে ভুল বুঝিয়া স্বদেশ-সেবার নামে যে হুজুগ তুলিয়া দিতেছে, আমরা তাহাতেই মাতিয়া তাহাদের যুক্তি ও উপদেশ নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতেছি। তাহারা চতুর, আপনা বাঁচাইতে জানে আমাদিগকে গাছে তুলিযা দিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িতেছে এবং শেষকালে দুর্গা বলিয়া ঝুলিযা পড়িতে পরামর্শ দিতেছে। আমরা মুর্খ! আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অতিকায় দৈত্যের সহিত বামনের বন্ধুত্ব হইলে যে পরিণাম, আমাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিতেছে।

যাহারা নিজে অন্ধ, তাহারা নেতৃত্ব করিয়া অপরকে চালাইতে গেলে যে ফল হয়, যাহাদের উদ্দেশ্য সাধু নয়, তাহারা চালক হইলে যে পরিণাম হয়, যাহারা দায়িত্ববোধহীন, তাহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, যাহাদের সততা নাই, তাহাদের উপর সাধারণে নির্ভর করিলে দেশের যে দুর্গতি হইতে পারে, যাহারা স্বার্থের কীট, তাহারা স্বার্থত্যাগের ভাণ করিয়া স্বদেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে গেলে যাহা হওয়া উচিত, যাহারা বচন-সর্বস্ব কর্মে অপটু, তাহারা কার্যভার গ্রহণ করিয়া মোড়ল হইলে যে ফল আশা করা যাইতে পারে, এবং যাহারা কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের দাস, অপর দেশের ইতিহাস ও রাজনীতি পড়িয়া আমাদের ভিন্ন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহার প্রয়োজন না বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে তৎপর, তাহাদের পতাকার নিম্নে মেষপালের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলে অদৃষ্টে যাহা হওয়া উচিত তাহা সকলই

হইয়াছে। বুদ্ধিমানের নিকট আমাদের জয়ের আশা কোনদিনই ছিল না এবং এখনও নাই। আমাদের স্বদেশী উদ্যম ব্যর্থ হইবার কারণ কেবল 'necessary mental and technical equipment' এর অভাব নহে। আমাদের এ নিষ্ফলতা কৃতকার্যতার সোপান নহে। (failure is success in the embryonic stage—in a state of chrysalis)। আমাদের এ অকৃতকার্যতা জাতীয় আশা ভরসার সমাধি।

আমাদের যাঁহারা নেতা হইয়াছেন, আমরা নেতা না বলিলেও যাঁহারা আপনাদিগকে জননেতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের কেহ নিঃস্বার্থভাবে নিষ্ঠার সহিত স্বদেশী করেন কিনা, জানি না। কিন্তু স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে, তাহা হয় তাঁহারা ভাবেন নাই, অথবা ভাবিয়া ও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনার বশে কল্পনাবলে যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তাহারই করিতে যাইয়া তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয়কুলই হারাইয়াছেন। তাঁহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া যে ডাল ধরিয়াছেন, সে ডালই ভাঙ্গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, বিলাতী মাল বয়কট কর, আমাদের নান্যঃ পন্থা। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা কর। বিলাতী মাল ছুঁইও না, খাইও না, তাহার নামও করিও না, 'কালরূপ আর হেরব না''। কিন্তু তখন বিলাতী মালে আমাদের বাজার পরিপূর্ণ। আমাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি অনুযায়ী দ্রব্য আমাদের দেশে অল্পই জন্মিত। অতএব বয়কট করিয়া আমরা বহুদিনের অভ্যাস, প্রয়োজন ও রীতিনীতি হঠাৎ পরিবর্তন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। প্রকৃতি ও অবস্থার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলাম। নেতাদিগের যুক্তি, বয়কট করিলেই স্বদেশে আবশ্যকতানুযায়ী জিনিস প্রস্তুত হইবে। গাড়ীর সম্মুখে ঘোড়া না জুতিয়া তাঁহারা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুতিলেন। যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হইল না। আমাদের প্রতিজ্ঞা জল বুদবুদের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইল। এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধী যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা নহে, যাহারা প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল তাহারা। নেতৃগণ স্বয়ংই জনসাধারণের বহুপূর্ব্বে সখাত সলিলে ডুবিয়াছিলেন। আমাদের শিল্পী ও কারিগরগণ আসরে নামিয়া তাহাদের বন্ধু বণিকগণের সহযোগে স্বদেশী হুজুগে সদুপায়ে হউক অসদুপায়ে হউক, যত রাবিশ মাল চালাইয়া অর্থাগমের উপায় করিতে লাগিল। কাকের মাংস কাকে ভক্ষণ করিল। যে সকল দরিদ্রের একটী পয়সা জীবন মরণ, তাহাদের বুকের রক্ত শুকাইল বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া উল্টা প্রতিজ্ঞা করিল, 'নেড়া আর বেলতলায় যাইবে না।''

কেহ কেহ ধুয়া তুলিলেন—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেশে এই ধুয়া চলিতেছিল—টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ কর, বিলাতে আমেরিকায়, জাপানে অসংখ্য যুবক ছাত্রসেনা প্রেরণ কর। তাহারা লোহার কাজ শিখিয়া আসিবে, কলের কাজ শিখিয়া আসিবে, নানা কারখানার ফন্দীতে ও কাজে ওস্তাদ হইয়া আসিবে, তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে। দলে দলে আমাদের সোণার চাঁদেরা কেহ পড়িয়া কেহ বা না পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া লঘুক্লেশে গুরুলাভ বলিয়া বিজয় পতাকা উড়াইয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু এখন তাহাদিগের আহার যোগাইবে কে? আমাদের যৌথ কারবার ও স্বদেশী কারখানা

সকল সততা অভাবে আত্মকলহে, প্রভুত্বের প্রলোভনে ও হঠকারিতায় মাটী হইয়া গেল অতি লোভে তাতি নষ্ট। আমাদের টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা ষাঁড়ের গোবর লইয়া উদারান্নের জন্য এখন সাহেবী কোম্পানির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে বেড়াইতেছে।

কেহ বলিলেন, তোমাদের বসন-ভূষণ তোমরা প্রস্তুত কর, লজ্জা নিবারণের জন্য পরের দ্বারস্থ হইও না। আমরা তাহাই বুঝিয়া একবেলা উপবাস করিয়া কষ্টে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আমাদের স্থূলোদর হিতৈষীদিগের হস্তে সঁপিয়া দিলাম। বুঝিলাম না, পরিণাম কি? আমাদের দেশে বিদেশীয়েরা চটের কল করিয়া রাজা হইয়া গেল, আর আমরা কাপড়ের কল করিয়া সর্বস্ব খোয়াইলাম! আমরা বোম্বাই হইতে তূলা আনিয়া বাঙ্গালায় কাপড়ের কল করিয়া লাভবান হইব, বক্তৃতার দেশে এ আশা দুরাশা। থাকিত যদি আমাদেব সেই সততা, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেই দায়িত্ববোধ, আমরাও মানুষ হইতাম। আমরাও মুখ উঁচু করিয়া আজ বলতে পারিতাম, 'আমরা স্বদেশী'। আমরা পরের ধন হাতে পাইলে লোষ্ট্রবৎ মনে করি—তখন আমাদের নিকট 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই জন্যই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না। যে কারণে অপরকে সমালোচনা করি, সেই কারণ উপস্থিত হইলে নিজেও আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের যৌথ কারবার টিকিতে পারে না। আমাদের অতিবুদ্ধি সম্মিলিত ব্যবসায়ের প্রধান পরিপন্থী।

আমরা স্বদেশী করিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইবে, আমাদের ধনাগমের পথ খুলিয়া যাইবে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে লাভবান হইল পাঞ্জাব, বোম্বাই, ইয়ুল কোম্পানী, মার্টিন কোম্পানীর, এলগিন-মিল, লালইমলী প্রভৃতি এবং কিছু পরিমাণে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। আমরা বঙ্গবাসী স্বদেশী নেশায় বিভোর হইয়া বোতাম, পেন, নিব, পুতুল, ছবি, মোজা, গেঞ্জি, মোমবাতি, এসেন্স, সাবান ও সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনতার ও শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছি। যে কাজে আয়াস নাই, মূলধনের আবশ্যকতা নাই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া শিক্ষার প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, আমরা তাহাতে খুব তৎপর। এমন আরাম-প্রিয়, শ্রমবিমুখ, সততাশূন্য, চরিত্রহীন, সন্ধিগ্ধচিত্ত, কুটিলমতি, পরশ্রীকাতর, হিংসুক জাতি স্বর্গে গেলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। মেকলের গালি শুনিয়া আমার চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, ইংরাজের প্রতি রোষ জন্মে। কিন্তু আমরা যদি মানুষ হইতে পারি, শত মেকলে শতমুখে আমাদের প্রশংসা করিবে। আমাদের স্বদেশী কবিও কি আমাদের চরিত্র দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে বলেন নাই—

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি?

স্বদেশী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, আমাদের সকল উদ্যম নষ্ট হইবার কারণ আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা। সভাসমিতি বল, শিল্প বাণিজ্য বল, জ্ঞানচর্চা বল, সকলের মূলে জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক বল, জাতি ব্যক্তির সমষ্টি, অতএব সমষ্টি গঠন করতে

হইলে সর্বাগ্রে ব্যষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে যদি মানুষ হই, লোকে আমাদিগকে মানুষ বলিবে, আমাদিগের স্বজাতি মানুষের জাতি বলিয়া জগতের জনসমাজে গণ্য হইবে। আমাদের যদি সৎসাহস থাকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-দৃঢ়তা থাকে, বাক্য ও কার্যের সামঞ্জস্য থাকে, ধৈর্য্য, বিচার ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি থাকে, আমরাও মানুষ, আমরাও জাতি, আমরাও দশজনের একজন হইব। আমাদের নামেও বাহবা পড়িবে, আমাদের জয় জয়কার ও দশের মুখে ফুটিয়া উঠিবে।

প্রকৃত স্বদেশী তাঁহারা, যাঁহারা ধান, যব, তিল, কলাই, আলু, মূলা, কচুর চাষ অপেক্ষা মানুষ-চাষে অধিক মনোনিবেশ করেন। আমাদের এ আন্দোলনে প্রকৃত স্বদেশী ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, লর্ড হার্ডিং ও কারমাইকেল, মাননীয় গোখেলে ও সার আশুতোষ, যাঁহারা লোকশিক্ষার বিধান করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার হইলে, দেশে মানুষ প্রস্তুত হইলে, গ্রীসের ন্যায় পাথরের দেশে, ইংল্যান্ডের ন্যায় কয়লার রাজ্যে, আমেরিকার ন্যায় মহারণ্যেও সোনা ফলিতে পারে। দেশে মানুষ থাকিলে তাহারা যাহাতে হাত দিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবে, জঙ্গলে মঙ্গল হইবে, ছাই মুষ্টি ধরিলে তাহা সোনা মুষ্টি হইবে। আমাদের নরনারী যে দিন এক এক জন এক একটী বীর বা বীরপত্নী হইবেন, সেদিন আমাদের গৃহে গৃহে আবার রাজপুতনার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। একজন গারিবল্ডী, একজন ওয়াশিংটন, একজন নেপোলিয়ন, একজন অশোক, একজন সেকেন্দার, একজন বুদ্ধ, একজন মহম্মদ, একজন সেক্সপিয়র, একজন কালিদাস, একজন হোমার, একজন বাল্মীকি, একজন গেটে, একজন দাঁতে, একজন ভল্‌তেয়ার, একজন নিউটন, একজন এডিসন যে জাতি প্রস্তুত করিতে পারে, সে জাতি ধন্য, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। তবে আমাদের দেশের বালবৃদ্ধযুবা পুরুষরমণী একমন একপ্রাণ হইয়া সেই স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করিবেন, যাহাতে গৃহে গৃহে মানুষ প্রস্তুত হইবে? ভেজালের জঞ্জালে আমাদের দেশের সর্বনাশ হইল। চটকে ভুলিয়া, মোহে মজিয়া সময় নষ্ট করিবার আর অবসর নাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, জনসাধারণ সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে আপন আপন গৃহে শিশু-বালক-যুবকদিগের সুশিক্ষার বিধান করিয়া মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিলে যথার্থ স্বদেশসেবা করা হইবে, স্বদেশের কল্যাণ হইবে। ইহারই নাম আসল স্বদেশী। যতদিন সকল হুজুগ ও বৃথা আন্দোলন ত্যাগ করিয়া এইরূপ প্রকৃত স্বদেশী অনুষ্ঠিত না হইবে, ততদিন

বাবুই তোর মিছে আশা,
ঘর থুইয়ে বনে বাসা।

শ্রী চাবুকরাম চৌবে

(নব্যভারত, আশ্বিন ১৩১৯)

অভয়বাণী

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নির্ভর হও, আমরা তোমাদিগেব উৎসাহে বাধা দিব না, তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমাদিগের যিনি জননী, তিনি তোমাদিগেরও জননী; মাতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমরা যে সঙ্কল্প ধারণ করিয়াছ তাহা আমরাও ধারণ করিলাম ; তাঁহার সেবার জন্য তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমবাও গ্রহণ করিলাম।

বঙ্গরমণী কবে কোন্ কঠোর ব্রতপালনে পবাঙ্মুখ হইয়াছে মার দুঃখ নিবারণ অভিপ্রায়ে, পিতাভ্রাতাপতিপুত্রের মঙ্গলকামনায় ইহকাল, পরকালের হিতার্থে চিবদিন তাহারা কঠোর ত্যাগস্বীকারে শরীর পতন করিয়া আসিতেছে। আর আজ জন্মভূমির পূজায় কষ্ট স্বীকারের ভয়ে তোমাদিগের সহিত যোগদানে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে?

তোমরা নির্ভয় হও, আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, আজ আমাদের মহোৎসব। আজ পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী, পতিপত্নী সকলে মিলিয়া আমরা মহাব্রত ধারণ করিতেছি; এত পুণ্য এত আনন্দ আমাদের স্বপ্নেব অগোচর, কল্পনার অতীত। এই পুণ্য আনন্দলাভের জন্য কোনও কঠোরতা স্বীকার করিতেই বঙ্গরমণী কষ্ট বোধ করিবে না।

কিন্তু এ ব্রত অভূতপূর্ব ব্রত। ইহাতে উপবাস নাই, শরীর পতন নাই, কোন কষ্টই নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই ব্রত। তবে তোমরা কি মনে করিতেছ এ ব্রত পালনে আমরা অসমর্থ হইব? বিলাতি চুড়ি ফেলিয়া দিয়া আমরা যদি দেশের শাঁখারুলি পরি, বিলাতি সাবান বিলাতি সুগন্ধীদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা দেশী সাবান চিরপ্রচলিত আতর গোলাপ ব্যবহার করি, যদি ফিতায় চুল না বাঁধিয়া আগের মতো চুলের দড়ি ও জরী দিয়া চুল বাঁধি, যদি জ্যাকেটে বিলাতি লেশ না দিয়া দেশী চিকণ লাগাইয়া পরি, সূক্ষ্ম বিলাতি মজলিন পায়নাপল প্রভৃতির বদলে, দেশের চেলি বারাণসীতেই সুসজ্জিত হই আর বিলাতি সুলভ শাড়ির বদলে, সামান্য বেশিদরের শাড়িই ব্যবহার করি, তা কি ত্যাগস্বীকার? না কোন কষ্টনামবাচ্য? আর গরীবলোকের পক্ষে সুলভ বিলাতি বস্ত্রের বদলে সামান্য চড়াদরের বস্ত্র কেনাও কষ্টকর। কিন্তু আজ ধনী মধ্যবিত্তের এক উদ্দেশ্য এক ব্রত। একের অর্থ অন্যের পরিশ্রম মিলিত করিয়া তাঁহারা দেশের কল কারখানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে ধনী গরীব নির্ব্বিভেদে সকলেই দেশীবস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। এসবয় আমরা ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরণীগণ, যদি বিলাতি তেল, বিলাতি সুগন্ধী, বিলাতি জ্যাকেট, এবং অন্যান্য নানাবিধ সৌখিন বিলাতি দ্রব ব্যবহার পরিত্যাগ করি, তবে কত অপব্যয় নিবারণ করিতে পারি এবং এইরূপে সমস্ত অর্থ দেশের উন্নতিতে প্রদত্ত হইলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যসাধনে আমরা কতদূর সহায়তা করিতে পারি? দেশের কার্য করিবার, স্বামীর

ও পিতাপুত্রের সহায়তা করিবার এই সুযোগ, এই অবসর কোন বঙ্গরমণী না হাস্যমুখে গ্রহণ করিবেন।

আশ্বিন মাসে মা আসিতেছেন, এসময়ে নূতন বস্ত্র পরিধান আমাদের চিরন্তন প্রথা, কিন্তু তোমরা যদি দেশীবস্ত্র যোগাইতে না পার তাহা হইলে এ সময়েও আমরা নূতন বস্ত্র পরিব না। আমাদের বংশানুক্রমে রক্ষিত পুরাতন চেলি বারাণসী পরিয়া, এমনকি পারতপক্ষে আমরা পুরাতন ধৌত-বস্ত্র পরিয়াই দেবীকে প্রণাম করিব, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিব, তথাপি এসময়েও আমরা বিলাতি বস্ত্র পরিব না। আমরা বুঝিয়াছি ইহাতেই দেবী ভগবতী অধিক সমাদৃতা হইবেন; তাঁহার পূজার যথার্থ ফল হইবে। অতএব হে বঙ্গসন্তানগণ, যদি তোমাদিগের মাতৃস্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত বঙ্গ রমণীর পক্ষ হইতে এই অভয়বাণী প্রচার করিতেছি যে তোমাদিগের সঙ্কল্পই আমাদিগের সঙ্কল্প, তোমাদিগের ব্রত আমাদিগেরও ব্রত। তোমরা নির্ভয় হও, তোমাদের প্রতিজ্ঞা অটল রহুক, তোমাদের ব্রত অবাধে উদ্‌যাপিত হউক।

দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আর কি কারো ভয় রেখেছি?

আমরা যে সেই ভগবানের অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি—তিনি কি আমাদিগকে মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পাবেন। আমরা যে স্বাবলম্বনেব পথ ধরিয়াছি—তিনি কি আমাদিগের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন? আজ বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে—তিনি তাই তাঁহার বিচিত্র উপায়ে আমাদিগেব চৈতন্য সম্পাদনেব চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যে ভাল ধরিতেছি সেই ভালই তিনি ভাঙিয়া দিতেছেন, আর পরোক্ষভাবে এই উপদেশ করিতেছেন যে পব প্রত্যাশাদিগকে আমি এইরূপ কশাঘাত দ্বারাই সৎপথে আনিয়া থাকি। "অভাগা যদ্যপি চায, সাগর শুকায়ে যায়।" বাঙালি তুমি যত দিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস ত দূবেব কথা—সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্যন্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই, আপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের মহানুভবতা যাহার সম্বল কেহই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ সেই উদারতার অনন্ত প্রস্রবণ মূর্তিমান সাম্যমৈত্রী মর্লী আমাদিগকে অর্ধচন্দ্র দিলেন। ইহাতে যে আমরা কি পর্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, তবে কি বঙ্গভঙ্গে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই? তবে কি বানরিপাড়ার* পিটুনী পুলিশের অত্যাচারে তবে কি সেখানকার পুরনারীর আর্তনাদে আমাদের হৃদয় ভাঙিয়া যায় নাই? তবে কি বরিশালে গুর্খার গুঁতায় আমরা সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করি নাই? তা নয় আমরা এত দিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব।

এত দিন ভগবান স্বহস্তে আমাদিগের চোখের ঠুলি খুলিয়া দিলেন। এত দিনে আমরা ভাঙা বাঙলা জোড়া দিবার প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিব এই ভাবিয়া তো আমাদের আর আনন্দ ধরিতেছে না। পূর্ববঙ্গ! কে বলে তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ? আমরা তো তোমাকে আরও বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। বরিশালের বানরীপাড়ার সংবাদ কে রাখিত। আর আজ কলিকাতার আবাল বৃদ্ধবনিতার মুখে সেই বানরীপাড়ার কথা। দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণ উৎসবে ঐ বানরীপাড়ার নিগৃহীত লোকদিগের জন্য টাকা উঠিতেছে। আজ বরিশালের অশ্বিনীকে, মাদারীপুরের কালীপ্রসন্নকে, বন্নার স্বদেশী বীরদিগকে, জলপাইগুড়ির আদ্যনাথকে, ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত বঙ্গদেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙা বাংলা আর কেমন করিয়া জোড়া লাগাইতে হয়। যাহাদিগের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না, তাহাদিগকে

আমরা প্রাণের বন্ধু হৃদয়ের দেবতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাদিগের বেদনায় দুঃখ জানাইতেছি—যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছি। এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোন উপায়ে সম্ভব হইতে পারিত। ফুলার যতই ঘা মারিবেন, ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। মিন্টো মর্লী যতই পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। ফিরিঙ্গি যতই নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করিবেন—ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদিগের প্রতি যতই নির্যাতন হইবে—ততই ভাঙাবাংলা জোড়া লাগিবে। মৃত্যুতে জীবন। আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই অস্বাভাবিক ফিরিঙ্গি প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কারের মৃত্যু না হইলে, আমরা জীবনলাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের দৃষ্টি, আমাদিগের কাজ কর্ম সব বহির্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আপনাতে আপনি নাই। সাধক বলিয়াছেন,—

আপনাতে আপনি থাকো
যেও না মন কোনখানে
যা চাবে তাই খুঁজে পাবে,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

বাহিরের মায়া একেবারে না কাটিলে আমরা অন্তর্মুখীন হইতে পারিব না। বাহ্য বস্তুতে আসক্তির—সামান্য মাত্র কারণ থাকিলে আমাদের আত্মদৃষ্টির উন্মেষ হইবে না। তাই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাঁহার জমিদারী এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে অমনি জয়কালীর বাড়ি একশ করিয়া বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি—আজ আমাদের ভুয়া রাজনৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে, আজ আমাদের মরলী-প্রীতি ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ বাহিরে আমরা সব শূন্য দেখিতেছি, আজ ইংলন্ডের কুয়াশাবৃত-অম্বরে ভারতবাসীর আশাসূর্য একেবারে ডুবিয়া গেল, আজ ইংলন্ডের মহাসভার উদারনীতিক মন্ত্রী সমাজের উদারতম সদস্য মরলী আমাদিগের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন—তাই আজ যদি আমাদের চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি, আজ যদি আমরা আমাদের সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি, আজ যদি আমরা মানুষ হইবার পথ খুঁজি, তাই বলি,—দে জয়-কালীর বাড়ি একশ পাঁঠা।

বঙ্গ-বিভাগ

১৩৯২ আশ্বিন (প্রবাসী সাময়িকীতে প্রকাশিত)

লর্ড কার্জনের মত খারাপ শাসনকর্ত্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমরা ঠিক তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী, অনিষ্টকারী বাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতালাভ ঘটিয়াছে? আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এ কথা বলিতেছি না। ইংলণ্ডের·অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Growth of the Enlısh Constitutıon নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন দেখুন ঃ

"Strange it may at first sight seem that the founder of the later liberties of England was not an Enlishman. Simon of Montfort, a native of France, did for the land of his adoption what even he might not have been able to do for the land of his birth. And why? The land of his birth was shall I say flourishing or suffering—under the baleful virtues of the most righteous of kings, Saint Lewis reigned in France, Saint Lewis the just and holy, the man who never swerved from the path of right, the man who sware to his neighbour and disappointed him not, though it were to his own hindrance. Under his righteous rule there could be no ground for revolt or disaffection. By surrounding the Crown with the reflected glory of his own virtues, he did more than any other man to strengthen its power. He thus did more than any other man to pave the way for that foul despotism of his successors whose evil deeds would have daily vexed his righteous soul. In England, on the other hand, we had the momentary curse, the lasting, blessing, of a succession of evil kings. We had Kings who had no spark of English feeling in their breasts, but from whose follies and necessities our fathers were able to wring their freedom, all the more lastingly because it was bit by bit that it was wrung. A Latin poet once sang that freedom never flourishes more brightly than it does under a righteous King. And so it does while that righteous King. himself tarries among men. But, to win freedom as an heritage for ever, there are times when we have more need of the vices of Kings than of their virtues. The tyranny of our Angevin masters woke up English freedom from its momentary grave."

(pp. 69-71)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অত্যাচারী রাজারা শাপরূপী বর। কারণ, অপরের, ভাল রাজার, প্রদত্ত অধিকার নিজস্ব জিনিস নয়, তেমন স্থায়ীও নয় ; যাহা নিজে যুঝিয়া, জিনিয়া, লওয়া হয়, তাহাই নিজস্ব সম্পত্তি। তবে এ কথা মানিতেই হইবে যে মানুষের জন্মগত অধিকার জিনিয়া লইতে হইলে পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস

চাই, স্বার্থত্যাগ চাই, সকল সুখ, সুবিধা, সম্পদের চেয়ে মনুষ্যত্বকে, আত্মমর্যাদাকে বড় মনে করা চাই। আমাদের সে তেজ, সে পৌরুষ, সে সাহস, সে স্বার্থত্যাগ আছে কি? আমরা মনুষ্যত্বকে সর্বোপরি স্থান দিতে পারিব কি? যদি পারি, তাহা হইলে লর্ড কার্জনের মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙ্গালীকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিতে গিয়া বাঙ্গালীর একতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যদি আমরা জাতীয় জীবনের মালমসলা সম্বন্ধে একান্ত নিঃস্ব না হই, যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ঈর্ষাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিতে পারি, তাহা হইলে জাতীয়তার মন্দির গড়িয়া তুলিয়া তন্মধ্যে যথার্থই বঙ্গমাতার পূজা করিতে পারিব।

বঙ্গ-বিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন করিয়া এ পর্যন্ত যে সকল সরকারী কাগজপত্র বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কোন যুক্তিই প্রবল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। একই কারণে গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজ করিতে চাহেন। যেমন, এক ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগকে ও বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙ্গলা বলে ও একই শাসনকর্ত্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতেছেন। অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়ামমতার (old associations) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিঙ্গকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গালোকে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন! তর্ক যুক্তিতে গভর্ণমেণ্টের হা'র হইয়াছে ; তবু গভর্ণমেণ্ট নিজের গোঁ ছাড়িতেছেন না। এটা কি একটা অকারণ জিদ মাত্র। না তা নয়। এরূপ একগুঁয়েমির গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই, হয়ত কোন গোপনীয় কাগজে আছে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল ; কিন্তু আসল কারণ উচ্চ শিক্ষা যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা। তজ্জন্যই লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন, "I have always thought that Dr. Gooroo Das Banerji held a brief for his unworthy client, the Bengali student, whom it is our desire politely to suppress." যাক সে কথা। আমরা বলিয়াছি, বঙ্গ-বিভাগের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কারণগুলি প্রকৃত কারণ নহে ; গূঢ় কারণ আছে। কারণ রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ লোকেরা জানেন যে রাজপুরুষেরা দরকার মত খুব মিথ্যা কথা বলেন। আমরা ভয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে প্রায়ই তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলি না ; কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিলে যে কোন অধর্ম হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। সরকারী কাগজপত্রে অনেক সময় মিথ্যা কথাই থাকে ; অবশ্য তৎসমুদয় হইতে সত্য বাহির করা যায়

বটে ; কিন্তু রাজপুরুষেরা মিথ্যাবাদী, এইরূপ সন্দেহ করিয়া অগ্রসর হইলে তবে সত্যের দেখা পাওয়া যাইতে পারে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Methods of Historical Study নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :

"But when we come to manifestos, proclamations, diplomatic documents which have not yet reached the stage of treaties, the case is wholly different. Here we are in the very chosen region of lies; they are lies told by people who know the truth; truth may even, by various processes, he got out of the lies; but it will not be got out of them by the process of believing them. He is of childlike simplicity indeed who believes every royal proclamation or the preamble of every act of Parliament, as telling us, not only what certain august persons did, but the motives which led them to do it..."

(pp 258-59)

ফ্রীম্যান প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে সরকারী কাগজপত্রকে মিথ্যা কথা পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে তবে তাহা হইতে সত্য কথা বাহির করা যায়। বাস্তবিক, যখন দার্জিলিঙ্গের পক্ষে ও মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগের পক্ষে যে যুক্তি দুটি খাটিল, পূর্ববঙ্গের বেলা তাহা না খাটিতে দেখিয়াই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক ভাষাভাষী, প্রাচীনকালাগত সম্বন্ধে, মায়ামমতায় আবদ্ধ একটি জাতিকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরকালের জন্য শক্তিহীন করাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

এই জন্য আমাদের ধারণা, বাঙ্গালীরা (অর্থাৎ কার্যতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা) রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙ্গালীদের দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই শক্তি নাশ করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবনা লোপ করা, বঙ্গ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য। পূর্ববঙ্গে হিন্দুবাঙ্গালী, মুসলমান-বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহারে বাঙ্গালী, বিহারী প্রভৃতি অপেক্ষা কম। সুতরাং উভয় প্রদেশেই হিন্দু-বাঙ্গালীর দাবী, দাওয়া, মত, গভর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিবার বেশ একটা কারণ পাইবেন। আমাদের উহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে দেশটা কেবল হিন্দু-বাঙ্গালীর মত অনুসারে শাসিত হউক ; বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুণ্ণ করিয়া এ কথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক ; ইংরাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংরাজ মুখে মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙ্গালী-হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল ; এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে, বেহারী ও মুসলমান-বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম ; এই জন্য তাহারা স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দুবাঙ্গালী নেতারা যতটুকু বুঝেন, চান ও দাবী করেন, তাহা যদি সামান্য নয়, তাহা হইলেও উহা মুসলমানবাঙ্গালী ও বেহারীরা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশী। বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতারা অপর

সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির মঙ্গল উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও দাবী করিতে থাকুন ; স্বার্থান্বেষী ইংরাজ রাজপুরুষদের দ্বারা তাঁহাদের সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা করিতে শিখুন ; ইহাই আমাদের অভিলাষ। সমস্ত বাঙালীর একত্র থাকা হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইবে। এইরূপ কিছু দিন চলিতে থাকিলে যখন বাঙ্গালী-মুসলমানগণ শিক্ষাগুণে হিন্দু-বাঙ্গালীরই মত জাতীয় অধিকার চাহিয়া রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইবেন, তখন ইংরাজের ভেদনীতি হয় ত ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। তখন আর স্থানবিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর প্রাধান্য অপ্রাধান্যের কথা লইয়া কোন জাতীয় অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

বাঙ্গালা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের মত হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্ষা বিদ্বেষ নাই। এই জন্য তাহাদের সম্বন্ধে এই ভেদনীতি অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু এই অশুভ নীতি এখানেই থামিবে না। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গেও ঝগড়া বাধাইবাব চেষ্টা হইবে। পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিম বঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গে চাকরী পাইবে না, এরূপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে, এবং তাহা হইলে একই জাতির দুই শাখায় রাজপুরুষদের চিত্ততোষক বেশ ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্মিবে।

বহুসংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে, সকলের টাকা একত্র ব্যয় করিয়া, মঙ্গলের পথে যেরূপ অগ্রসর হইতে পারে, অল্পসংখ্যক লোকে তাহা পারে না, সুতরাং দ্বিখণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি যে অতঃপর কম হইবে, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

তাহার পর, আর এক কথা। স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্রজাদিগকে নিজেদের অধিকার ও সুবিধাগুলি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টার জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকের উৎসাহ ও পরিশ্রম, অনেক লোকের মতের ঐক্যের প্রভাব, আবশ্যক হয়। বাঙ্গালী জাতি দুই প্রদেশে দুই শাসনকর্ত্তার অধীনে, দুই বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা কৃত বিভিন্ন আইনের অধীনে, বাস করিলে, এই জাতির দুই শাখার অভাব, অভিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। সুতরাং চেষ্টাও ভিন্নমুখী হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ, যে পরিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতের প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল করিতে পারিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে।

আমরা চাই এক হইতে, গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিভিন্ন আইনে, শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির অধীনে আনিয়া দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন।

সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তুলে। যে সাহিত্য যত বেশী লোকে পড়ে, যাহার রস ও বল যত বেশী মানুষের হৃদয় হইতে আহৃত ও সঞ্চিত, তাহার প্রভাব ও শক্তি তত বেশী। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গভর্ণমেণ্ট আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য হইতে বিরত

আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিতে পারিবেন। মিশনারীরা ও স্বার্থান্ধ স্কুলপাঠ্য পুস্তকরচয়িতারা, এবং হয়ত কোন কোন মুসলমান লেখক গভর্ণমেণ্টের এই কার্যের সহায় হইবেন। বাঙ্গালী সমাজের যদি মাথা থাকে, এবং সেই শীর্ষস্থানীয় লোকদের বুদ্ধি ও হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে স্কুলপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে যাহাই হউক, উচ্চসাহিত্যের বড় বেশী ক্ষতি বোধ হয় হইবে না। কিন্তু মোটের উপর বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি যে হইবে, উহার শক্তি যে কিছু কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রগুলিরও অবস্থা বিবেচ্য। এগুলি গভর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল। ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহকসংখ্যার উপর নির্ভর করে। গ্রাহকেরা স্বভাবতঃ নিজের প্রদেশের, নিজের জেলার, নিজের সহর ও গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা পড়িতে অধিক ভাল বাসেন। আমরা দেখিতেছি, কলিকাতার একটা হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির যত জায়গা অধিকার করে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষা ও অন্যবিধ গুরুতর সমস্যা তাহার সিকি স্থানও পায় না। এই হেতু বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতায় শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ববঙ্গের কথা তত আলোচনা করিতে না পারায় অনেক গ্রাহক হারাইয়া আয়ের ন্যূনতা বশতঃ তেমন সুপরিচালিত হইবে না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায় শক্তিশালী কাগজের আবির্ভাব হইতে অনেক বৎসর লাগিবে। এই প্রকারে গভর্ণমেণ্টের পথের এক প্রধান কণ্টক সংবাদপত্র কিছুদিনের জন্য ভোঁতা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গভর্ণমেণ্টের সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করেন? তাই এখন আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের হৃদয়, আমাদের ঘর ঠিক্ আছে কি না। আমাদের এক হওয়া সোজা নয়। গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের (cast) উচ্চতা নীচতার একটা ধূয়া তোলায় বুদ্ধিমান্ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতিও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আশা করি, এখন সে ঝগড়াটা থামিয়াছে। তাই, এখন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কথা বিবেচ্য। ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর। হিন্দু মুসলমানকে একই ভগবান্ একই দেশের জলবায়ু ও খাদ্যে পুষ্ট করিতেছেন, তাহাদের পৃথক হইয়া কোন লাভ নাই। ইংরাজের লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু-লেখকেরা মুসলমানদের উপর অনেক অবিচার করিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা করুন হিন্দু পুরাকালে মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু মুসলমানের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এখন কোমর বাঁধিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের যাঁহার যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান করুন। মুসলমানের যে উৎসাহ, বীরত্ব ও একাগ্রতা এক দিন তাঁহাকে এশিয়া হইতে ইউরোপের শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান বাঙ্গালীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হণ্টর

সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙালী এক প্রবল সমুদ্রচর জাতি হইতে পারে। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদের অমুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীদের হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা উদঘাটিত করুন, মুসলমান পুরুষ ও নারীদিগের মহৎকার্যের বৃত্তান্ত লিখুন। শুধু তাহাদের সাম্প্রদায়িক কাগজে লিখিলে হইবে না। দুরূহ ফরাসী আরবী কথা বাদ দিয়া অন্য কাগজেও লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। শিক্ষিত লোকেরাই সমাজের নেতত্বের উপযুক্ত ; এই জন্য শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিতেছি। তা'ছাড়া, কারণ যাহাই হউক, শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছোটলোক আছে, যাহারা পূর্ববঙ্গের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া হীন মনে করে। ইহাদিগকে মনের ময়লা সাফ করিতে হইবে।

কিন্তু সর্বোপরি, আমাদিগকে সকল বাঙ্গালীর হিতকর কোন মহৎ কার্যে হাত দিতে হইবে ; কারণ, কেবল সরকারের বিরোধিতা রূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদের মধ্যে আশা ও প্রয়োজনের অনুরূপ একাতাবন্ধন জন্মিতে পারে না। সদনুষ্ঠান একপ্রাণতা হইতে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পারে। শিল্পবিজ্ঞান সমিতি যে বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন, ইহা উক্ত রূপ একটি কার্য্য। বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ করা আংশিকভাবে আর একটি তদ্রূপ অনুষ্ঠান। আংশিক ভাবে বলিতেছি এই জন্য, যে শুধু এরূপ প্রতিজ্ঞায় লাভ নাই। বাঙ্গালাদেশে যে সব জিনিস খুব ভাল হইতে পারে, বাঙ্গালীর তাহা উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে পারা চাই। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় কাজ, প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীকে শিক্ষাদান, জ্ঞানদান। নতুবা কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সফল হইবে না। কারণ, দেশের মঙ্গল বুঝা, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। একদিনে জাতি তৈয়ার হয় না, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ হয় না। আশা, ধৈর্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙ্গালীকে এই মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমরা লুপ্তপৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জন ও তাঁহার দলের ইংরাজেরা আমাদিগকে কীটেরও অধম মনে করিয়াছেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, জড় পদার্থ-নির্মিত অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নহে ; মনে রাখিবেন, সব দিন সমান যায় না ; মনে রাখিবেন, Vengeance sleeps long but never dies ; মনে রাখিবেন, ন্যায়বান্ ভগবান আছেন ; মনে রাখিবেন, পূর্বেকার পর পদানত ইংলণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমানকালের পরপদানত ভারতবর্ষ বিধাতার বরে আবার জাগিবে, উঠিবে।

রাখীবন্ধন

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

পিতাপুত্রেব কখনও বনিবনাও হইত না। অধিকাংশ সময়েই দেখা যাইত পিতা দুর্গাচবণেব মতের সহিত পুত্র আশুতোষের মতের আদৌ মিল হইত না। অধিকন্তু, লেখাপড়া শিখিয়াও কেন যে তাঁহার পুত্র আর্ত ও দীনদবিদ্র ব্যক্তিদিগেব সহিত মিশিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত, তাহা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। এ জন্য দুর্গাচরণকে প্রায়ই আত্মীয়স্বজন ও পাড়াব লোকেব কাছে দুঃখ করিতে দেখা যাইত। ধৈর্যশীল আশুতোষের এসব গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ যখন তাহাদের জমিদারীর প্রজারা প্রভাতে আসিয়া করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া আশুতোষের দ্বারা দুর্গাচরণকে জানাইল যে তাহারা দু'বৎসর হেতু এবারে জমির খাজনা দিতে পারিবে না, তখন আর্ত প্রজাগুলির উপর পিতার দুর্ব্যবহার দেখিয়া সে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিতান্ত কর্তব্যবোধে দুই একটি কথা কহিয়াছে মাত্র, এমন সময দুর্গাচরণ বলিয়া উঠিলেন, "আজকাল লেখাপড়া শিখিয়া তোমাদের ঐ হইয়াছে বাপু. কেহ কোন দুঃখ জানাইয়া কিছু প্রার্থনা করিলে, তোমাদের চাঁদার খাতায় নাম সহি করিবার ও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য করিবার ক্ষমতাটি বিলক্ষণ হইয়াছে, বিশেষ তোমার ত পাত্রবোধে কখন কার্য করা—"

দুর্গাচরণ ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার উচ্চারিত বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি দেখা যাইত না। সে কারণে এবারকার বক্তব্যটাও শেষ করা হইল না। অবসর বুঝিয়া আশুতোষ জানাইয়া দিল যে প্রজারা যাহা বলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। দেশের অবস্থা পিতার জ্ঞাত থাকাই সম্ভব, প্রজাদের খাজনাটা এবারে মাপ করিয়া দেওয়া হউক্।

পিতাপুত্রে কথাবার্তা অতি কমই হইত। কিন্তু দুর্গাচরণ কথাবার্তায় কোন বিষয়ে যদি পুত্রেব তিলমাত্র অনৈক্য বুঝিতে পারিতেন, তখন কথাবার্তা অন্যরূপ ধারণ করিত। আশুতোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন। এবারেও তাহা বাদ গেল না। অতিরিক্ত রাগের ঝোঁকে শেষে তিনি আশুতোষকে বলিয়া উঠিলেন, "নিজে তুমি কখনও কিছু উপার্জন কর নাই আমার আয় ব্যয় সম্বন্ধে তোমার কথাবার্তা নিতান্তই অশোভন দেখায়। আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব। তুমি আপনার লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত আছ, তাহাই লইয়া থাক।"

আশুতোষের প্রতি দুর্গাচরণের এরূপ কঠোর উক্তি তাহার মনে গিয়া অত্যন্ত আঘাত করিল। সে যে পিতার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইবে, ইহা কখনও প্রত্যাশা করে নাই। যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, বাস্তব জীবনে তাহা লাভ করিয়া সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে ত বরাবরই পিতাকে স্বীয় উপার্জনের কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আশুতোষের ইচ্ছা ছিল যে নিজের সমগ্র

উপার্জিত ধনে অক্ষম ও দীনদরিদ্রদিগের যথাসাধ্য সেবা ও সাহার্য্য করিবে। কিন্তু দুর্গাচরণ আশুতোষের সেদিকে কোনওপ্রকার মনোনিবেশ যে আদপে পছন্দ করিতেন না, তা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পুত্র একটু বড় হওয়া অবধি তিনি বরাবরই তাহাকে এ বিষয়ে বাধা দিয়ে আসিয়াছে। বড়লোক জমিদারের পুত্র হইলে কিরূপ জীবনযাপন করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার আদর্শ আশুতোষের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

তাই আজ যখন দুর্গচরণ আশুতোষকে কঠিন কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন, তখন সে আজ আর আপনাকে সামলাতে পারিল না। পিতার অনলস্রাবী মন্তব্য শেষ হইলে সে জানাইল যে প্রজাদের রক্তশোষণ কবিয়া তাহাদের লুণ্ঠিত ধনে তাহার স্পৃহা আদৌ নাই। দু' বৎসরে প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করা হত্যার নামান্তর মাত্র, সে বুঝিয়াছে। একমাত্র মাতৃহীন পুত্র ননীগোপালকে লইয়া সে আজই অন্যত্র গিযা থাকিবে। অনবরত কলহের মধ্যে থাকা অপেক্ষা দূরে শান্তিতে জীবনযাপন কবা সহস্র গুণে শ্রেয়। উভয়েরই মন ইহাতে ভাল থাকিবার সম্ভাবনা।

পিতার অনুমতি পাইলে, আশুতোষ আপনার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র ননীকে লইয়া নগর ত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে গিয়ে বাসা লইল।

২

আশুতোষ যে গ্রামটিতে গিয়া বাসা লইয়াছিল, সে গ্রামে তাহার সহপাঠী যতীশ নামে এক পুরাতন বন্ধু থাকিত। চেষ্টা চরিত্র করিয়া সে আশুতোষকে গ্রামের স্কুলে একটা মাষ্টারী জুটাইয়া দিল।

এই মাষ্টারীটি পাইয়া আশুতোষ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। পিতার নিকট যখন সে ছিল, লেখাপড়ার চর্চায় ও একরূপ নিশ্চেষ্টতায় তাহার জীবন কাটাইতে হইত। অধুনা কর্মের আস্বাদন পাইয়া পূর্বের বন্ধন-ভারগ্রস্ত জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছিল। আধিকন্তু স্কুলে অধ্যাপনার পর সে যে সময়টি পায়, তখন সে আপনার চিরপোষিত অভিলাষটি পূর্ণ করিবার প্রয়াস পায়। কোথায় কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্রের কি অভাব, গ্রামে কাহার কি অসুবিধা, তাহা দূর করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধনমুক্ত জীবনে যে এত আনন্দ সে পূর্বে জানিত না।

গ্রামের দীন দরিদ্র সকলেরই নিকট আশুতোষের প্রশংসা ধরিল না।

৩

পুত্রকে বিদায় দিয়া দুর্গাচরণ যে বিশেষ মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বরং তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, এখন তিনি যে সব কার্য করিবেন, তাহাতে বাধা দিবার লোক কেহ থাকিবে না। স্বেচ্ছামত কার্য বাধাবিহীনভাবে করিলে যে একটা বিপুল আনন্দ পাওয়া যায়, এতদিন তিনি যেন তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। আশুর বিদায়ের পর তিনি আপনাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে করিলেন।

কিন্তু একটি ছোট শিশুর স্মৃতি তাঁহার সকল কার্যের ও ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহাকে

পীড়ন করিতে লাগিল। পৌত্রবিরহে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অন্ত তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ননী চলিয়া যাইবার পর দুর্গাচরণেব গৃহে বাস কবা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহাকে বিদায় দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, একটি সগভীব নিবানন্দ ভাব সমগ্র বাটীটিকে আচ্ছন্ন কবিযা ফেলিয়াছে। পূর্বে যে বাটীতে শিশুর কলরব ও চাঞ্চল্যের বিরাম ছিল না এখন সে বাটীতে এই শান্তিপূর্ণ নীরবতা ও শব্দবিহীন শূন্যতা অনুভব করিয়া দুর্গাচরণের মন কাতর হইয়া পড়িত।

তিনি আপনার কর্মের মধ্যে, গৃহের মধ্যে কিছুতেই আব বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাতে জমিদারি সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দেখিবার সময় দেখিতেন যে চশমাটি পূর্বদিনে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই আছে। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার লোক এখন আর কেহ নাই। অগোচরে দোয়াত ও কলম লইয়া পলাইবে এমন লোকও আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূজা করিবার সময় ফুল চুরি করিয়া লইয়াও কেহ পালায় না। দুর্গাচরণের স্নানাহারও এখন নিতান্তই সঙ্গীবিহীনভাবে করিতে হয়। নিজের খাইবার সময় ননীর খাওয়া হইয়াছে কি না ভাবিয়া চিত্ত আকুল হইয়া উঠে। তাহাকে না খাওয়াইয়া তাঁহার কখন আহারে পরিতৃপ্তি হইত না। আজকাল সেকথা স্মরণ করিয়া নয়ন প্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে দুর্গাচরণ একাকী যখন আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেন, তাঁহার এক একবার হঠাৎ মনে হইত যেন দ্বারের আড়াল হইতে পরিচিত সুরে, "দাদামশাই—টু" শব্দ শুনিতে পাইবেন। যদিও দুর্গাচরণ জানিতেন যে চারিদিক খুঁজিলেও কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, তবুও তাঁহার চক্ষু দুইটি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিত। দর্শনান্তে তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত জলে ভরিয়া আসিত, ভাবিতেন, "কোথায় রে ননী, তুই আজ কোথায় গিয়েছিস, কোথায়?" সে যে গৃহে নাই, পথে নাই— সে যে তাঁহার অশ্রু অভিষিক্ত হৃদয়টি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেন না।

ননী চলিয়া যাইবার পূর্বে দাদামশাইয়ের নিকট শয়ন করিত। আজকাল বৃদ্ধ একাকী শয্যায় শয়ন করেন। বিছানায় পার্শ্বের স্থানটি শূন্য দেখিলে শয্যায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না ; প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। নিশীথ রাত্রে বিছানা হতে উঠিয়া বাহিরে আসেন। নিশীথিনীর অন্ধকারে অনুভব করেন যেন তাঁহারই অব্যক্ত বেদনা অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে!

৪

দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া আসা অবধি ননীরও মন আদপে ভাল ছিল না। দাদামশাইকে ছাড়িয়া কখন যে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে সে জানিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ ঘুমের পর জাগিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখে যে নূতন একটি ঘরে সে শুইয়া

আছে। শয্যার পার্শ্বে দাদামশাই নাই, কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে বাবা সে ঘরে একাকী বসিয়া পার্শ্বের একটি টেবিলে বই রাখিয়া পড়িতেছেন। আশুতোষকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানিতে পারিল যে তাহাদের দুইজনকেই এখানে থাকিতে হইবে। দুর্গাচরণের সহিত ননীর সাক্ষাৎ হওয়া যে আর সম্ভব নহে, সে কথা আশুতোষ আর ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। কিন্তু কি জন্য যে ননীর প্রতি এরূপ কঠিন শাস্তি বিহিত হইল, ক্ষুদ্র শিশুজীবনে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া আসা পর্যন্ত তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল।

খেলায় ও সর্ববিষয়ের সাথী দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া পুত্র ননীগোপালের যে কতদূর কষ্ট হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আশুতোষ পূর্ব হইতেই তাহার জন্য খেলনা ও নানাবিধ ছবির বই ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ননী মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়াই একাকী ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু খেলার মধ্যেও সে এক এক দিন অকস্মাৎ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিত। আশুতোষ তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি তখন আপনার স্নেহক্রোড়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন।

৫

ইহার মধ্যে একটা নূতন ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরবাটী হইতে ননীর দিদি নলিনীবালা পূজার পূর্বে বাটী আসিয়াছে। সে-ই এখন ননীকে অনেক সময় ভুলাইয়া রাখে। গল্প বলিয়া ছবির বই দেখাইয়া তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলে। নলিনীর এই সবে দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে ; সে তাহার শ্বশুরবাড়ীর কত কথা ছোট ভাইটিকে বলে। সে সব কথা বুঝিত না, কিন্তু দিদির নিকট দ্রব্যাদি লইবার লোভে যে চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইত। চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে নলিনী ধমক দিত, "যা তোর আর গল্প শুনেও কাজ নেই, আর খেলনা নিয়েও কাজ নেই, সেই যে নূতন বাঁশীটা এনেছি তা আর কাউকে দিলেই হ'বে, তুই ত নিবিনি!

একটি ফুৎকারে যেমন দীপ হঠাৎ নির্বাপিত হইয়া যায়, তেমনি ননীর মুখ অকস্মাৎ মলিন হইয়া যাইত। দিদি আবার তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া, আদর করিয়া নিজের ভাল বাক্সটি খুলিত। যে জিনিষটি লইবে তাহা ননীকে নিজেই নির্বাচন করিয়া লইতে বলিত।

একদিন এইরূপ করিয়া নলিনী ছোট ভাইটিকে ভুলাইতেছে, এমন সময় ননীর দিদির বাক্সের ভিতর যত্নে রক্ষিত "কুন্তলীন" ও "দেলখোস্" শিশি দুইটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে দেলখোসের শিশিটি হাতে লইয়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি দিদি?" দিদি কহিল, "ওর নাম দেলখোস্, রুমালে মাখতে হয়, খুব ভাল ফুলের গন্ধ এর ভেতর। আর এই যে এটা, এটা মাখলে চুল খুব বড় হয়। তুই নিবি?" দেলখোসের শিশিটি হাতে লইয়া ননী বলিল, "আমি শুধু এটা নেব।" শিশিটির গন্ধের আঘ্রাণ লইয়া সে তাহা পুনরায় দিদির বাক্সের ভিতরই রাখিয়া দিল।

এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিয়া যাইত। আশুতোষ আপনার কার্যের দিন রাত্রি নিমগ্ন থাকিতেন। কন্যা নলিনী আসা অবধি তিনি ননীগোপালেব কোন খোঁজ খবর লওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না।

৬

দাদামশাইকে এ কযদিন আর ননীব মনে পড়ে নাই। কিন্তু যখন পূজাব কথা সে শুনিল, তখন তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই পূজার সময তিনি কত জিনিস তাহাকে দিতেন, কত আদর করিতেন, সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু সে পূজাও হইযা গেছে। এত আশা করিয়াও দাদামশাইয়ের সহিত দেখা না পাইয়া ননীর মন বড় খারাপ হইয়া গেল। দাদামশাইয়ের কথা দিদি ও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর পায় না। দিদি নাকি আবাব বলিয়াছে যে দাদামশাই তাহাদের উপর রাগ করিয়াছেন। তাই সে এখন দিদির সহিত তেমন করিয়া হাসিয়া কথা কহে না। এমনকি গল্প শুনিতে তাহার আজকাল তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নলিনী তাহাকে অনেক প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। এমন সময়ে সে আশার একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তাহার সহিত ইতিহাসেব একটু সম্পর্ক আছে। যে ঘটনাটি লিখিতেছি, সেই ঘটনার পূর্বের বৎসরে বঙ্গবিচ্ছেদ হইয়া গেছে। তাহারই বাৎসরিক দিনে ননীদের গ্রামে যে রাখীবন্ধন, সঙ্কীর্তন ইত্যাদি হইবে, তাহার বিষয়ে নানা প্রকার গল্প করিযা নলিনী ভ্রাতাকে হর্ষোল্লাসে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিত। ননী নানারূপ প্রশ্ন করিত। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি রাখীবন্ধন কাকে বলে?' নলিনী রাখীবন্ধনের উদ্দেশ্যটি ছোটভাইটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বলিল, "সে দিন ভা'য়ে ভা'য়ে ভাব করিতে হয়। ভাই যদি রাগও করেন, তবুও সব ভুলিয়া তাঁহার হাতে রাখী পরাইয়া দিতে হয়।"

দিদির নিকট রাখীবন্ধনের এই কথা শুনিয়া অবধি একটা ভারি মজার কথা তাহার মনে উদিত হইত, কিন্তু সে কথা দিদিকে প্রকাশ করিয়া জানাইত না।

৭

রাখীবন্ধনের দিনে আশুতোষ যখন গঙ্গাস্নান করিয়া অধিকবেলায় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ভীতচকিতা নলিনীর মুখে শুনিলেন যে ননীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে নলিনীর সঙ্গে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, কিন্তু অর্দ্ধেক পথেই গিয়াই সে বাটী ফিরিয়া যায়। কয়দিন হইতে তাহার শরীর খারাপ বলিয়া সে গঙ্গাস্নান করিতে চাহে নাই। নলিনী বাটী আসিয়া দেখে ননী কোথাও নাই।

আশুতোষ চিন্তিত হইয়া থানায় খবর পাঠাইলেন এবং নিজেও অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথাও ননীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

৮

"দাদামশাই',—টু!"

বৃদ্ধ দুর্গাচরণ দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বাহিবের ঘরের বিছানায় যেরূপ প্রত্যহ শয়ন করেন, আজও সেইরূপ শয়ন করিয়াছিলেন। আশু ও ননীকে বিদায় দিয়া তাঁহার মন যে এত খারাপ হইবে তিনি পূর্বে ভাবেন নাই। সর্বদা মনে হইত যে পুত্র আশুতোষ ও তাঁহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। পিতৃ-গর্ব ভুলিয়া তিনি যদি জয়ী হইতে পারেন, তবেই আশু ও ননী উভয়েই তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে কথা স্মরণ করিলেই তাঁহার আশঙ্কা হয়। ফল কি হইবে কে জানে? তাঁহার পক্ষ হইতে জয়ের ত কোনও আশাই দেখা যায় না। পুত্র যেরূপ আত্মসম্মানপ্রিয় সে যে বাটী ফিরিয়া আসিবে এরূপ আশা দুর্গাচরণ কিছুতেই করিতে পারেন না।

আজ আহারান্তে শুইয়া শুইয়া তিনি এই সব কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে আপনার নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সুমধুর শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত পরিচিত আহ্বানবাণীটি হইতে তিনি অনেকদিন বঞ্চিত ছিলেন।

দাদামশাইকে ডাকিয়া ননী আপনার হস্ত দুইটি পিছনে রাখিয়া অপরাধীর ন্যায় দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতরে যাইবার তাহার সাহস কুলাইতেছিল না। যদি দাদামশাই বকেন। তাই অতি ভয়ে ভয়ে, ধীরে ডাকিল, "দাদামশাই,—টু।"

দুর্গাচরণ বজ্রচকিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। পূর্বে এক এক দিন মনে হইত বটে যেন পরিচিত শিশুকণ্ঠে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, কিন্তু আজ আর কোন ভুল নাই। বৃদ্ধ শয্যা ত্যাগ করিয়া ননীকে ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার শয্যায় আসিয়া বসিলেন। বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া দিলেন।

ননী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দুর্গাচরণকে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "দাদামশাই, তুমি আমার ওপর রাগ করনি?" দুর্গাচরণ আপনার কম্পিত হস্ত তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটির উপরে রাখিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমি কি তোমার ওপর রাগ কর্ত্তে পারি?"

"তবে কেন তুমি আমাদের বাড়ী পুজোর সময় যাওনি?"

চক্ষের জলে বৃদ্ধ ঠিক মনোমত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মনে মনে বলিতেছিলেন, "দাদা, আমি যা পারিনি, তুই আজ তাই করেছিস।" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কোনও কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

"দাদামশাই, এই দেখ তোমার জন্যে আজকে আমি কি এনেছি!" এই বলিয়া ননী তাহার জামার পকেট হইতে শিউলির ফুলের বোঁটায় নিজ হস্তে রঞ্জিত একটি রাখী বাহির করিয়া স্নেহ-সুকোমল হস্তে দুর্গাচরণের শীর্ণ হস্তে পরাইয়া দিল। অপর পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি শিশি বাহির করিয়া সে শয্যার উপর রাখিয়া দিল।

"দাদামশাই, তুমি বড় ফুল ভালবাস, এই দেখ কেমন একটা শিশি এনেছি। এর ভেতর কেমন ফুলের গন্ধ। দিদি বলেছে, আজকের দিনে সবাইকে দিশী জিনিস দিতে

হয়। তোমাকে দেবার জন্যে আমি এটা এনেছি। তুমি আমাকে এবাব পুজোব সময় কিছু দাওনি--"

এক নিঃশ্বাসে ননী এই কথা কয়টি বলিয়া গেল। এতদিন আপনাব ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে দারুণ অভিমান লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ সে অভিমান আব কিছুতেই গোপন বাখিতে পারিল না। রুদ্ধোচ্ছাসে নির্ঝরের ন্যায় বালকের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দুর্গাচরণ অনেক করিয়াও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে দুর্গাচরণের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

ননীগোপাল যেদিন তার দাদামশাইয়ের সহিত দেখা করিতে যায়, সে দিন তাহার কিছুই আহার হয় নাই। আশুতোষ ও নলিনীর অগোচরে সে প্রত্যুষেই নগরের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। পথ না জানায় ও রৌদ্র উঠায় কিছুদূর অবধি গিয়া সে আব হাঁটিতে পারে নাই। বাস্তার ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কাঁদিযাছিল। অবশেষে একজন ভদ্রলোক দয়া পববশ হইয়া নিজের গাড়ী করিয়া প্রিয়দর্শন বালকটিকে দুর্গাচরণের বাটীব নিকট নামাইয়া দিয়া চলিয়া যান। কয়দিন হইতে ননীর শরীব ভাল ছিল না। আজ দ্বিপ্রহরে রৌদ্র লাগিয়া তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল।

দুর্গাচরণ দেখিলেন, ননীর জ্বর হইয়াছে। সন্ধ্যামুখে বালকেব জ্বর শীঘ্র বাড়িয়া উঠায় তিনি ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। নিজে শয্যার পার্শ্বে ননীর ক্ষুদ্র দুইটি হস্ত আপনার হস্তে তুলিয়া লইয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া ঔষধ লিখিয়া চলিয়া গেলেন। আসার কথা তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

বেশী রাত্রে প্রলাপের লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিল। বালক তখন ভুল বকিতে আরম্ভ করিল।

দাদামশাই, তোমার হাতটা একবার এগিয়ে দাও না রাখীটা পরিয়ে দিই। আমার উপর তুমি রাগ করনি—"

প্রভাতে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ননী কাহার প্রত্যাশায় ঘরের চারিদিকে চাহিয়া রহিল। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে পুনরায় নীরবে চক্ষু বুজিয়া শুইল।

দুর্গাচরণ আশু ও নলিনীকে আনিতে পূর্বেই লোক পাঠাইয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে ডাক্তার আসিয়া বালকের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্বে আশু ও নলিনী যখন আসিয়া পৌছিল, তখন নির্বানোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ননী আর একবার সচেতন হইয়াছে।

নলিনীকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "দেখ দিদি, দাদামশাই আর আমাদের ওপর রাগ কর্বেন না বলেচেন, তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে, দেখ, কেমন তাঁর হাতে আমি রাখী পরিয়ে দিইচি—"

[কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩১২]

ভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে॥
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ॥
ধর্ম্ম যান সত্য সহ দেশ পরিহরি।
ধর্ম্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি॥
বিস্মৃতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তায় কত।
শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথ-হত॥
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
কুতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে॥
পুরাণ পুরাণ ব'লে করে নানা ছল।
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল॥
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার।
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সঙ্গে সঙ্গে তার॥
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচার-পত্রে লিখে কত যাবে রাখা॥
শুন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহার।
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর॥
জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা।
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা॥
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে।
রীতিমত সুবিদিত যত্ন কর তাহে।
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইল সকল।
সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল॥

বঙ্গভাষা

মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন :—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তবে কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

স্বাধীনতা সঙ্গীত

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ-তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়!
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়!
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয়॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে, সমর-সমাজে হে,
সমর-সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ॥
অমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সকল শরীর ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
কৃতান্ত-কোমল কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের বিধান হে,
ভয়ের বিধান?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম বেদের নিধান হে,
বেদের বিধান॥
স্মরহ ইক্ষবাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে দেশ-হিতে ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরন।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে?
ক্ষত্রিয়-নন্দন॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তাব নাই হে
তুল্য তাব নাই॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই॥

জন্মভূমি

(প্রবাসীব স্বদেশ-স্মবণ)

মনোমোহন বসু

আহা মরি! ‘‘স্বদেশ’ কি সুধা-মাখা নাম!
মনে হয়, তাব কাছে তুচ্ছ স্বর্গ-ধাম!
যে স্থানে মায়াব বস্তু, সকলি আমার!
সুখের বিষয় যথা, অশেষ প্রকার!
যে স্থানের পূর্বকথা, করিলে স্মরণ;
অনুরাগে উথলিয়া উঠে প্রাণ মন!
যেখানে আমার পিতা, পিতামহগণ,
বংশের মর্যাদা সদা, করিয়া পালন,
চিরদিন করি মান, যশের বিকাশ,
পুরুষে পুরুষে সুখে, ক’রেছেন বাস!
ফুলের সৌরভ সম, কুলের গৌরব,
যথা চির-ব্যাপ্ত! যথা জ্ঞাতি বন্ধু সব!
এত প্রেম, ভক্তির বন্ধন, যেই স্থলে—
আহা! আহা!
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতলে?

ভারত বিলাপ

(নির্বাচিতাংশ)

গোবিন্দচন্দ্র রায়

কতকাল পরে, বল ভারত রে!
দু-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতলে রে।

নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমূদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ, আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপশিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চনভাজন, সৌধ-শিরে
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।

খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি-পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত ধনে দুর্‌-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ-সুখে
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদ হলে পরমাদ রটে
পরমাদ হরে হিত-বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।

নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক-দুখ
পর-রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে
তুষিতে কুল শীল স্বধর্ম দিলে।

পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।

লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে
হত জীবন চা অহিফেন চষে।
শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে
উপযুক্ত হলো পর-সেবা লেগে।

হলো চাকরি সার, যথায় তথায়
অপমান সদায় কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে
পরদাস-দশায় বধির সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।
কহিতে বুক চায় দুভাগ হতে
নয়নে উথলে জল স্রোত-শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষমতে
সহিতেছ নিরন্তর ঘাট পথে।
নিজ ছায়া পড়ে, পর-কায়ে সদা
রহ ভীত পদে পথ-পাশে সদা।
পড়িলে পর তুঙ্গ-তুরঙ্গ-মুখে
হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে।
কি করে গুণগ্রাম, সহস্র ঘটে
শির না লুটিলে রুটি নাহি ঘটে।
পরে ব্রহ্ম বধে, তৃণ নাহি নড়ে
তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে।
উলটে পৃথিবী, পরগা-পরশে
সুখশান্তি লভে তব কায়-রসে।
আজি যে টুকু মান, লভে কুকুরে
ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে।
করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিবা
জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা।
মন চায় কষায়, কৌপীন পরি
তব দুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি।

রাখি-বন্ধন

(কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল!
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,

যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জ্বলিল!
মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল!—
ভারতজননী জাগিল!
পূরব বাংলা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মাদ্রাজ, শহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি করিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং,
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।
বহুবলধারিণিং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"

উঠিল যে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগত মাতিল।
আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল,—
পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার,

দূর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মাদ্রাজ, শহর বোম্বাই
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
মা বলে ভারতে ডাকিল।
যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,
নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল।
ভারতজননী জাগিল।

গাও রে যমুনে, ভাসায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভুবন জাগায়ে গাওরে—
"যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারত-জননী জাগেরে!"

আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সন্তান নহে শুষ্ক-হাড়,
দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল;
ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদন-মণ্ডল,
দেখ্‌রে মুহূর্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল।
আজি শুভক্ষণে ভারত-উত্থান,
এ দেউটি কভু হবে কি নির্বাণ?
হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান
হের দুখ-নিশি পোহাল!
শত হৃদি বাঁধা একই লহরে
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজি মিলিল;—
ভারতজননী জাগিল।
দেখ্‌রে কিবা সে উজ্জল নয়ন
উৎসাহ-ভাসিত মানব ক'জন

দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ
জীবনের ব্রতে নামিল।
জয় জয় জয় বল রে সবাই—
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই—
সম তৃষানলে আশাপথে চাই—
একতার হার পরিল,—
ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল!
হবে কি সেদিন হবে কিরে ফিরে
বিশ কোটী প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান
ভারতে আপনা চিনিবে;
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা
ভারত-সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা,
আপনার পর জানিবে!
আর কেন ভয়—হের তেজোময়
ভারত-আকাশে নব সূর্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল,
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল!
গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে
গাও ভাগীরথী ডাকি স্বনে স্বনে
গাও রে যামিনী পোহাল!
সবে ব'ল জয় ভারতের জয়
ভারতজননী জাগিল।
যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ-শরীর,
কার না নয়ন তিতে রে?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে!

জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ 'রাখি'-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।—
যে নীরদ উঠি 'রীপন'-মিলনে
শুষ্ক তরু-ডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল!
জয় ভারতের জয়
গাও সবে আজ প্রমত্ত-হৃদয়
ভারতজননী জাগিল॥

মাতৃ-স্তুতি
(নির্বাচিতাংশ)
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকল কারণ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ তরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

২

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা!—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত-আচরণ,
কত বা মনন দেবতায়!
প্রসীদ, প্রসন্না-মনা জননী আমায়!

১১

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,

যত স্মরি তবু না ফুরায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

১৭

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
রত্ন-বেদী, বসি তুমি তায়,
বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি,
রত্ন-বাসে বিজড়িত কায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

গাও ভারতের জয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!
রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি!
হোক ভাবতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ!
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্মস্ততো জয়!
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

ভারত-ললনা

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও বীরজায়া, বীর-প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর্-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

চল্ রে চল্ সবে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!

বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ!
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো!

তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ্;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

ভারত-রাণী

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

তুমি মা ভারত-রাণী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রী-সম্পদরাশি, কোথা আছে সুষমার?
সভ্যতার এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িণী;
বিদ্যাবুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী, তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীনা অবিরত,
গায়িল মা, কবি-কণ্ঠে তোমার মহিমা শত।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য হিরক হার,

তব কণ্ঠে আসি রমা পরাইল অনিবার।
স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী ঝরি স্রোত-জলে চুমি',
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি।
বালার্ক কিরণে মাখি বিসর্পিত শ্যামকায়,
পুণ্য জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণতোয়া বহে যায়।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা, নীলাকাশে
নির্মল রজতে মাখা হেন ফুল্লচন্দ্র হাসে?
কোথায় মা, আসি বল আপনি প্রকৃত-রাণী
সাজাইল নানারূপে তার বিধুমুখখানি?
সেই মা ভারত তুমি, যেখানে মা নিরন্তর
খরতাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর।
যেকানে নীরদ শ্যাম করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো ঝরে ত্রিভুবন।
ময়ূর-চন্দ্রকে যথা শত চন্দ্র পরকাশ
কোকিলের কুহু কণ্ঠে জাগে প্রাণে অভিলাষ।
আমরণ যথা নারী সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অনুমৃতা।
যথা গৃহ অন্তরালে নারী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা চিরধর্ম-সহায়িনী।
যথায় কামিনী, চাঁপা, কুমুদ কহ্লার হাসে,
বার মাস সমীরণ বহে শতফুলবাসে।
সেই মা ভারত তুমি দীপ্ত শত মহিমায়
নইলে মা এ ঐশ্বর্য কার আছে বসুধায়?
তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়াময়
কতবিধ রূপ ধরি করিল মা অভিনয়।
প্রথমে ভাসিল মহী 'প্রলয়-পয়োধি-জলে'
মীনরূপে চতুর্বেদ উদ্ধারিল কুতূহলে॥
কূর্মরূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি
মন্থিল মা তব সিন্ধু দেবাসুরে যত্ন করি।
মহাকায় বরাহের দংষ্ট্রা ধরি বসুমতী
জলমগ্নে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী।
তোমারি মা পুণ্যক্ষেত্রে নরহরি রূপ ধরি
রক্ষিলা যে ভক্তে হরি অসুরে বিদীর্ণ করি।
কোটি চন্দ্রপ্রভা মুখে, মা, তোমার পুণ্যদেশে
আপনি আসিয়া হরি অতি খর্বতর বেশে

মাগিয়া ত্রিপাদভূমি নভঃস্থল বসুধায়
ব্যাপিল কমল পদে পূর্ণব্রহ্ম মহিমায়।
ভৃগুপতি রূপে আসি কোটি-নররক্ত-জলে
বহাইল মা প্রবাহিনী খরতর করবালে।
বুদ্ধরূপে রুদ্ররূপে সম্বরিয়া পুনর্বার
"অহিংসা পরমধর্ম" করিল মা সুপ্রচার।
রামরূপে দেখাইল প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয়
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইল ধর্মে জয়।

ভারত-শ্মশান-মাঝে

আনন্দচন্দ্র মিত্র

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা!
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতি;
তথাপি যুবতী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই দু বেলা।
বিবাহ কি তাও জানি নে, কেবলমাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে, পরের হাতে সঁপে দিয়ে;
ছিঁড়ে নিয়ে কমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা;
কারে ক'ব এ দুর্দশা, কে বুঝিবে মর্মজ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা।

জন্মভূমি

গোবিন্দচন্দ্র দাস

জননী গো জন্মভূমি, তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে!
সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন,
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।
ত্যজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে।
তোমারি শ্যামল ক্ষেত্রে অন্ন করি' দান

শৈশবের দেহ মোর ক'রেছে বর্ধিত।
তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছ প্রাণ,
দিয়ে বারি, জননীর স্তন্যের সহিত।
জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ
শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়া'তে চরণ।
তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা,
সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি কোলাহল
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা।
তোমারি মাটিতে, ধরি জনকের কর,
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর।
ত্যজিয়া তোমার কোল যৌবনে এখন
হেরিলাম কত দেশ কত সৌধমালা।
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দগ্ধ নয়ন,
ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা।
তোমার প্রান্তর, নদী, পথ, সরোবর,
অন্তরে উদিয়া মোর জুড়ায় অন্তর।
তোমাতে আমার পিতা পিতামহগণ,
জন্মেছিলা একদিন আমারই মতন।
তোমারি এ বায়ুতাপে তাঁহাদের দেহ
পুষেছিলে, পুষিতেছ আমার যেমন।
জন্মভূমি জননী আমার যথা তুমি,
তাঁহাদেরও সেইরূপ তুমি—মাতৃভূমি।
তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে, জীবলীলা-শেষে।
তাঁদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে!
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিশাবে আবার!

শত কণ্ঠে কর গান

স্বর্ণকুমারী দেবী

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।

আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ।
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর-পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরেরে সীতাকুণ্ঠে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;
করিলাম পূন্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উঁতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

শিবাজী-উৎসব

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আজি গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ—
ভারতের কথা ভারতের গাথা
ভারত-বীরের যশোগান।
সদা বীর-প্রসূ ভারত জননী

বীর-রত্ন-মালে কোহিনুর মণি
স্মরণ শিবময় শিবাজী-কাহিনী
সহায় ভবানী অমূল্য দান।
গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ।
কত শিবময় সে শিব-কাহিনী
কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী
বলে শিব শিব জপ শিব-বাণী
নাশিবে অশিবে সে শিব গান।
শিব-শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত
হর-হর-হর পুণ্যময় গীত
কোটি কোটি কণ্ঠে মিলায়ে তান।

স্বদেশের ধূলি

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফল শস্য তার সুধার আধার
স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান।
এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে
হয়েছে সৃজিত, পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান॥
কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত

পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ-বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান॥

উদ্বোধন

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জাগো জাগো ভারত মাতা!
চরণতলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নবগাথা।
অগণন-জনগণ-ধাত্রি!
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত-সম্পদ-দাত্রি!
মঙ্গলযুত তব কীর্তি;
তব গুণ-গৌরব তব যশ-সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।
শূর-জননি সুর-পূজ্যে!
নিহত সুকৃতি তব হৃত সুখ গৌরব
দনুজ-দলিত নব রাজ্যে।
নব্য জগত-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ-বিদেশে।
জাগো জাগো ভারত মাতা।
চরণতলে তব রোদন উৎসব
করিব, রচিব নবগাথা।

আমার দেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন-গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন-গো মা তোর মলিন বেশ?
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধাব হ'তে জলধি-শেষ
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।

একথা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তাব কিনা এই ধূলায আসন, তা'র কিনা এই ছিন্ন বেশ!
উঠিল যেখানে মুবজ-মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়েব বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদেব রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা তাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমবা ঘুচাব মা তোর দৈন্য; মানুষ আমরা; নহি ত মেষ!
দেবি আমাার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

কিসেব দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
ত্রিংশ-কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ"॥

বাণী-বন্দনা

মানকুমারী বসু

জননি আমার! চরণে তোমার
করিছে প্রণতি এ দীন ভক্ত,
এস স্মিতাননে, শ্বেতপদ্মাসনে,
সন্তানে কর মা! সমর্থ শক্ত।
যবে উরিলে এ ভারতবর্ষে,
বেদগীতি গাহে বিরিঞ্চি হর্ষে,
মহিমা-মণ্ডিত চরণ-স্পর্শে,
ভূলোকে জাগিল দ্যুলোক স্বর্গ;
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ও পাদপদ্ম,
বন্দিল সাধক গাহিয়া ছন্দ,

অনল অনিল তপন চন্দ্র,
সম্ভ্রমে সঁপিল ভকতি অর্ঘ্য।
কূজনিল বনে বিহগপুঞ্জ,
গুঞ্জরিল ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জ,
কুসুমে ভরিল কানন-কুঞ্জ,
সে ললিত শোভা নিখিল-পূজ্য;
হিমাদ্রি শেখরে ছুটিল গঙ্গা,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক-সংজ্ঞা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজঙ্ঘা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূর্য!
শুভদাত্রী শিবে! ও পাদপদ্মে,
এ দীন সন্তানে কাতরে বন্দে,
তোমার বীণার সুতান ছন্দে,
জাগাও আঁধারে বিমল দীপ্তি;
মনে রেখ শরণাগত এ ভক্ত,
শ্রীপদে ঢালিছে বুকের রক্ত,
তুমি মা! কর গো সমর্থ শক্ত,
তোমাতে হউক সকল তৃপ্তি।

মাতৃপূজা

কামিনী রায়

যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!
অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,

নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার!

বঙ্গভূমি

অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণমি তোমায় আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্যময়ি, অয়ি জননী আমার;
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি-শিয়রে
করিছেন আশীর্বাদ—স্থির নেত্রে চাহি;
শুভ্র মেঘ-জটাজালে দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—বিদায়—তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত-রশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া-জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দরবনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল।
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দুল।
নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'!
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।
বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ অলক্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে!

মূর্তিমতী হয়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ ক্ষুদ্র কপর্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি!
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব দৈন্য, সর্ব দুঃখ-গ্লানি।

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদল,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল,
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্র, পীত-রৌদ্র-তলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ অঞ্চল!

কুজ্ঝটি সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা!
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!
নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার
কণ্টকী-লতায় গেছে গোবিভূমি ভরি;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘূৎকার
বহিছে উত্তর বায়ু শিহরি শিহরি।
হেরি তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী।
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্তি অতীত কাহিনী!

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর;
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুৎ মন্থর
এস হৃৎপদ্মাসনে সর্বার্থসাধিকে!
এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি!
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

রজনীকান্ত সেন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্পি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই;
পরের জিনিষ কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

বঙ্গ-লক্ষ্মী

নিত্যকৃষ্ণ বসু

কে আছে অধিনী হেন অবনী-মাঝারে?
হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে
স্বর্ণতনুখানি মাগো! তপ্ত অশ্রুজলে
সপ্তকোটি শিশু কা'র করে হাহাকার?
কিন্তু অয়ি জন্মদাত্রি জননী আমার,
আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে
স্মরি' কীর্ত্তিরাশি তোর;—প্রেমপুণ্য-বলে
আজিও অজেয় তুই, গর্ব্ব বসুধার।
যে মহিমা-শৈল-শিরে, রাজরাজেশ্বরি,
আছিস্‌ বসিয়া, দেবভোগ্য সে বিভব
আর লভিয়াছে কেবা এ মরুভুবনে?
কি ছার সম্পদ-সুখ?—চঞ্চল লহরী

কাল-সিন্ধু-নীরে যথা নশ্বর সে সব!—
অনশ্বর স্বর্গ মা গো তোর ও চরণে।

বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায়রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন;
(আরও কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌লো মালা জগৎ জিনে।
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা, মা'' বলে;
ঐ ভাষাতেই বল্‌বো হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা॥

বঙ্গভাষা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আহা, দীনা বঙ্গভাষা
ভাঙ্গে নাই যেন তন্দ্রা-অলস,
মুছেনি শীতের কুহেলি-তমস,
কেবল উষার অরুণ-পরশ
বহিয়া আনিছে আশা;
আহা, দীনা বঙ্গ ভাষা!

আহা দীনা বঙ্গভাষা!
আধখানি কথা ফুটেছে সরমে;
আধকানি ব্যথা লুটিছে মরমে,
ছলকি ঝলকি তবু মধুক্রমে
ক্ষরিছে তৃষ্ণানাশা;
আহা, দীনা বঙ্গভাষা!

ছিলে মুগ্ধা কামপুষ্পিতশয়নে,
শিরীষকোমল বচনরচনে,
ভাঙ্গিল কুহক, দুন্দুভির স্বনে
জাগিয়া উঠিলে কবে?

রৌদ্র, বীর-রসে উঠিলে মাতিয়া,
বাঁশরী-আলাপ ক্ষণেক ভুলিয়া,
তেজস্বিনী-সমা দিলে কাঁপাইয়া
বিস্ময় মানিনু সবে।

শুনাইলে ব্যাস, বাল্মীকি এ বঙ্গে,
ডুবিল কৌরব বিদ্বেষ-তরঙ্গে;
পিতৃসত্য লাগি ভ্রাতা ভার্যা সঙ্গে
হন রাম বনবাসী।

দেখাইলা—ভীষ্ম, পার্থ, যদুপতি,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সতী;
উদিল তৃষিত বঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি,
নিবিড় তমিস্র নাশি।

আবার যথায় ব্রজকুঞ্জবন,
"ললিতলবঙ্গলতার শীলন—"
ভুলিয়া—শুনিব গাহিছে কেমন,
তোমার বৈষ্ণব কবি;—
"সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি—"
প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনী,
দেখিবে তথায় রাধা, ব্রজ-মণি,
ভক্তের 'মাধুর্য-ছবি।'

প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাবসংমিশ্রণে,
সেজেছ কি এক অপূর্ব ভূষণে;—
ধ্রুবজ্যোতি সব উজলি কিরণে
সাহিত্য-জগদাকাশে।

মধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া,
ত্রিদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়া,
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া,
কোমল কোরকাবাসে!

অয়ি সালঙ্কারে! স্বভাবসুন্দরি!
মধুর-করুণ-রস-অধীশ্বরি!
কবিতার চির-প্রিয়-সহচরি
আরো এস চ'লে কাছে।

ধন্য, ধন্য হে ভাববিচিত্রে!
নহ তুমি দীনা,—তব ছত্রে ছত্রে
যৌবনপুলক; তব পত্রে পত্রে
বসন্ত চুমিয়া আছে!

নমো হিন্দুস্থান

সরলা দেবী চৌধুরাণী

অতীত-গৌরবাহিনী মম বাণী! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণী! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
"নমো হিন্দুস্থান!"
ভেদ-রিপুবিনাশিনী মম বাণী! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনী মম বাণী! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!'
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
"নমো হিন্দুস্থান!"
সকল-জন-উৎসাহিনী মম বাণী! গাহ আজ নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনী মম বাণী! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম-নিশান! ধর্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!'
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
"নমো হিন্দুস্থান!"

অমৃত-সন্ধান

সুরমাসুন্দরী ঘোষ

আজ টুটিয়াছে মোর মোহের বন্ধন,
গেছে শঙ্কা, গেছে লাজ, জেগেছে ক্রন্দন-
বহিছে জীবন-স্রোত দ্রুত বেগভরে,
সহসা লাগিবে ভাঁটা উচ্ছল সাগরে।
অতীতের খেলাধূলা মিশাবে ধূলায়,
আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায়?
কৈশোরে ঘোমটা-ঢাকা এই দুটি চোখ,
দেখে নাই জগতের অক্ষয় আলোক!
আজ বুঝিয়াছি আছে আমারও কাজ
কেহ বৃথা জন্মে নাই ধরণীর মাঝ!
মুক্ত রহিয়াছে মোর স্মৃতির দুয়ার,
পশিবে না মৃতপ্রাণে সুরভি-সম্ভার!
কল্পনা-কবিতা-গীতি উথলি নিমেষে,
নিবে মোরে উড়াইয়া অমৃতের দেশে।

নূতন রাগিণী

মৃণালিনী সেন

শুধুই গাহিতে গান যদি গো! জনম মম,
তবে দেবী! গানে মোর দাও সেই সুর,
যে সুর মৃতেরো প্রাণ অমৃতলহরী বহে,
যে সুরে জড়েরো করে অবসাদ দূর!
মরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হয়ে যায় সহসা হীরক!
যে তীব্র উন্মত্ত সুর তড়িৎ সঞ্চারি দেয়
হৃদয় হইতে হৃদে, ফেলিতে পলক।
এমন করিয়া শুধু গতানুগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পা-বধূর
সহিত করিয়া খেলা, জীবন স্বপ্নের মত
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর।
আমি অগ্রসর হ'ব সত্যের ধরিয়া হাত,
সূর্যের রশ্মির মত কিরণ যাহার?
নিখিল বিশ্বের সর্ব-স্বচ্ছ মুকুরের সম,
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার।
ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে;
—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া,
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম,
—আমার অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবী!
দাও যোগ করি দেবী! হৃদয়ের তার,
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরো সুখ, ওরো দুখ,
—অনুভব করি যেন আমায় আমার!

দেশভক্তি

যোগীন্দ্রনাথ বসু

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো? স্বদেশ জননী!
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি!
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন।

প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল?
পূত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল।
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে?
দারিদ্র্যের কশাঘাত কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,—
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন?
কোটি কণ্ঠে রোগে শোকে শুনি উঠে তীব্র আর্তনাদ
আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা নাহিক' বিষাদ!
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়;
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, পেমে,—বচনেতে নয়।
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে প্রাণ,
কর্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ফূর্তি, অন্তর্যামী! কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ!
সত্য সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ।

জননী

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

জাগো ওগো কাঙ্গালিনী, জননী!
তব কুটির-দ্বারে আজি মিলিত তব সন্তান,
দেশ দেশান্তর করি' অনুসন্ধান—কুসুম চন্দন
এনেছি জননী, পূজিতে তব চরণ।

মঙ্গল মন্ত্রে হিন্দু মুসলমান, বিস্মৃত গর্ব ভেদ
অভিমান, নব-আশা-পুলকিত প্রাণ,
দেহি নব শিক্ষা—নব দীক্ষা জননী! মেলি মুদিত নয়ন।

কর আশীষ তুলি পুণ্যপাণি, শুনাও নন্দনে অভয় বাণী,
শত বিবাদ দৈন্য সরম মানি' পড়ুক সরিয়া,
দিকে দকে তব বিজয়-শঙ্খ উঠুক বাজিয়া বাজিয়া,
পুলক-উৎসবে হোক্ পরিপূরিত তব দীন ভবন।

বিদ্রোহের নাটক

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

প্রস্তাবনা

নদীতীর

মূর্ত্তিমতী বঙ্গমাতা, চতুস্পার্শে ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভাগের অধিষ্ঠাত্রীগণ দণ্ডায়মানা।

গীত

বঙ্গমাতা। ছুরী মেরে হৃদমাঝারে
প্রাণ ছিঁড়ে মোব নিয়েছে রে।
সকলে। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে
না বেজেছে রে।।
বঙ্গমাতা। শেকল পায়ে বিকল হ'য়ে,
কত জ্বালা আছি সয়ে,
সাত কোটী দুঃখিনীর ছেলে
নয়ন জলে ভেসেছে রে।
সকলে। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে
না বেজেছে রে॥
বঙ্গমাতা। বড় আশায় পড়লো ছাই
ঘুচলো বলা 'ভাই ভাই,'
ভারত জুড়ে করুণ সুরে
দুঃখের গলা উঠেছে রে।
সকলে। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে
না বেজেছে রে।।
বঙ্গমাতা। দোহাই তোমার লর্ড কার্জন
যুগযুগান্তর যে বাঁধন,
ছিঁড়লে তারে কাতরে,
কে না করে রোদন।
সকলে। সয় বলে হয়ে! আর কত সয় সারা
ভারত ডুবেছে রে,
বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার প্রাণে
না বেজেছে রে॥

প্রথম দৃশ্য

রাস্তা।

(হুজুগরাম ও খয়ের খাঁ)

হুজুগ। সর্বনাশ হ'য়ে গেল, ভারত ছারেখারে গেল! হা অভাগিনী বঙ্গমাতা! আমরা অযোগ্য সন্তান, তোমার কিছুই করতে পারলুম না। এত (Agitation) অ্যাজিটেসন, (Meeting) মিটিং এত (Protest) প্রোটেস্ট, সব মিছে হলো। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ তো কেউ রোধ করতে পারলে না। প্রায় বিশ বৎসর ধ'রে (Congress) করা গেল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হোলো, কি করলেম কি হোলো! (Government) গভর্নমেন্টকে তো একটু (move) মুভ করা গেল না। যে ভেতো বাঙালী, সেই ভেতো বাঙ্গালীই রইলুম।

(খয়ের খাঁর প্রবেশ)

খয়ের খাঁ। কি হে হুজুগ রাম! এত (Agitation) অ্যাজিটেসন, এত (Meeting) মিটিং, এত (Protest) প্রোটেস্ট করে কোনটা কি দাঁড় করালে, (Bengal Partition) বেঙ্গল পটিশন রোধ হলো কি? না বল্লেও বাঁচিনি, তোমার অত মাথাব্যথা কেন? (Bengal) বেঙ্গলের ভেতর তোমার কখানা জমিদারি আছে? তুমি এতটা হৈ চৈ কোচ্চ কেন? কাগজওলারা চেঁচামেচি করছে, তার কারণ আছে। দেশের জন্য দুকথা না লিখলে, দুটো হৈ চৈ না করলে (Subscriber) সাবস্‌ক্রাইবার ঠিক থাকবে কেন? তোমার অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণ 'দিন আন' দিন খাও তোমার (Patriotism) প্রেট্‌রিওটিসম দেখে লোকে হাসবে।

হুজুগ। ওকি বলছেন খয়ের খাঁ মশাই? বঙ্গসন্তান হয়ে জন্মেছি, বঙ্গমাতার ভাল মন্দ দেখব না। জানেন যে (Irish) আইরিষরা ইংরাজের চক্ষে (Rustic) রাস্টিক, আজ যদি তাদের গৌরবের জন্মস্থান ইংলন্ডের শ্রেণীভুক্ত কত্তে চান, তারা সে আহ্বান তুচ্ছ ক'রে যে (Rustic) রাস্টিক (Irish) আইরিস, তাই থাকতে চাইবে। দেখুন, আমাদের বাঙ্গালীর আর আছে কি? ধর্ম নেই, কর্ম নেই, আচার নেই, বিচার নেই, কিছুই নেই, যদি বাঙ্গালীর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছু থাকে। তবে দুঃখিনী বঙ্গমাতার নাম। সেই বঙ্গমাতার বঙ্গচ্ছেদ। যুগ-যুগান্তর হ'তে সে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, আজ সেই বন্ধন ছিন্ন হল। এখন থেকে আর আমরা "সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে" একথা বলতে পারবো না। এখন সেই সপ্ত কোটির স্থানে চার কোটিরও কম বলতে হবে। বলে কি মশাই, একি কম দুঃখ।

খয়ের খাঁ। হ্যাঁ বাবু! তোমার মত কোটি দেশ হিতৈষী এ খোটে জমাট হয়েছিল।

ও যতই গলাবাজী কর, আর যতই লেখালেখি কর (Government) গভর্নমেন্ট যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। এই সব মিথ্যা (Agitation) অ্যাজিটেসন করে ম'চ্চো। কি জান! যা কিছু বাঙালীর আশা ভরসা ছিল, সব ডুবিয়ে দিচ্ছো। দেশ হিতৈষিতার ফোয়ারা তুলে দিশী মোজা, গেঞ্জি, দেশাই, এসব কত কি কল তৈরী হলো। কৈ বাপু টেকলো না তো? যাদের দেশলাই কাটীটী না হলে সন্ধ্যা বেলায় আলো জ্বালতে পার না, যারা কাপড়খানি না যোগালে স্বপরিবারে বস্ত্রহীন হয়ে থাকতে হবে, তাদের ওপর কি কারসাজি চলে বাপু, এখন দিন কতক চেপে চুপে থাক। নিজের অবস্থার উন্নতি কর। স্বজাতিপ্রীতি আর একটু ছড়িয়ে পড়ুক! তারপর (Government) গভর্নমেন্টের ওপর চাল চালতে যাও।

হুজুগ। মশাই আর দেরী নেই, বাবু রমাকান্ত রায় জাপানে শিল্প শিক্ষা ক'রে এসে বাঙ্গালী ছাত্রের শিল্প শিক্ষার এক নূতন পথ দেখিয়েছেন ; ভারত সন্তান এত দিনে নিজের অবস্থা বুঝেছে। তাই আজ এ দেশে শিল্পোন্নতি করার জন্য স্বনামখ্যাত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিঃ এ সি বোনার্জি, মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে এ বৎসর স্বদেশীয় যুবকগণকে শিল্পশিক্ষার জন্য ইউরোপ জাপানে পাঠান হয়েছে।

খয়ের খাঁ। হ্যাঁ মানি বটে, এ একটা কাজের মত কাজ হয়েছে। বাজে গলা বাজী ও লেখা লিখি ছেড়ে এইসবে মন দাও, শুধু বঙ্গমাতা কেন, ভারতমাতার পর্যন্ত কাজ হবে।

(জনৈক ফিরিঙ্গীকে বেষ্টন করিয়া বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। দোহাই সাহেব, দোহাই সাহেব, বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ কোরো না [।] তোমরা রাজা, আমাদের হয়ে লাটসাহেবকে বুঝিয়ে বল।

ফিরিঙ্গী আরে এলোক ক্যা বলে, হাম তো কুচ সামঝে না।

২য় বালক সাহেব! আমরা ঢাকা মনমন সিং প্রভৃতি বিভাগ থেকে লেখাপড়া শিখতে কলকাতায় এসেছি। আমাদের চারপুরুষের এখানে বাস। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ কল্লে আমাদের মা জননীর বুকে ছুরি দেওয়া হবে।

ফিরিঙ্গী। কেয়া মুস্কিল! হাম মিউনিসিপালীটী রাস্তাবন্দী সাব হ্যায়। রাস্তা জরিপ করনে আয়া। হাম এসব বাত কেয়া জানেতো।*

৩য় বালক দোহাই সাহেব। লাটসাহেবকে বুঝিয়ে বল, সাহেবের কথা লাটসাহেব শুনেন; বাঙ্গালীর কথা বড় একটা শুনেন না; তোমার ইংরাজ জাতির পায়ে ধরি তোমরা আমাদের জন্য এইটুকু উপকার কর, যেন তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করেন।

ফিরিঙ্গী। Oh how pitiable sight I see. Had I been the Viceroy and Governor General of India I would have at once stopped

the partıon of Bengal. ও হাউ পিটীএবেল্ সাইট্ আই সি, হ্যাড্ আই বিন দি ভাইসরয় এন্ড গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, আই উড্ হ্যাভ এটওয়ানস্ স্টপড দি পারটীসন্ অব বেঙ্গল॥

(বালকগণের গীত)

সাহেব তোমার পায়ে পড়ি মান বাঁচিয়ে রাখ' প্রাণ।
বঙ্গমাতার অঙ্গ কেটে ক'র নাক' খান খান।
বঙ্গবাসীর চোক্ষের জলে,
দেখ না আজ পাষাণ গলে,
ঘবে ঘরে আগুন জ্বলে, কর সাহেব দয়া দান।
লাটেব কাছে গিয়ে তুমি,
রক্ষা কব বঙ্গ ভূমি,
মনের খেদে সবাই কাঁদে সোনার বাংলা আজ শ্মশান।

(সাহেবকে লইয়া বালকগণের প্রস্থান)

হুজুগরাম। দেখুন মশাই কি ব্যাপার দেখুন (School এর) স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত (Bengal Partıtıon) বেঙ্গল পার্টিসন্ নিয়ে কিরূপ মর্মাহত হয়েচে।

খয়ের খাঁ। তাই তো, তাই তো, এমন দৃশ্য তো কখন দেখিনি, আমায় (move) মুভ্ ক'রে দিয়েছে। চলতো চলতো সাহেবটাকে নিয়ে ছেলেগুলো কি করে, দেখা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগান

(Chıttagong) চিটাগঞ্জের ফিরিঙ্গিগণ ও তাহাদের পত্নীগণ।

গীত

হতচ্ছাড়া বাংলা ছাড়া হ'য়েছি সব বেঁচেছি।
বরাত জোরে ঘুরে ফিরে এমন লাট পেয়েছি॥
হোলো জবর পার্টিসন্
মজা পেলে এই হাফকাস্ট্ নেশন্।
অফিসে বাড়্লো প্রবিসন্
হো হো ড্যাম নিগার নেটিভের মাথা খেয়েছি।
পুঁই চিংড়ি খাই
খাস সাহেবের রাইট পাই
তাই কার্জনের জয় গেয়েছি।
ক'রে চাটগাঁ কলনি

দেখাব' কোন পিড্রু, গম্মিস পিন্টো এন্টনি।
চুনোগলির নামটী কেমন ব'দলে নিয়েছি।।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

স্বামী ও স্ত্রী

স্ত্রী। হ্যাঁ গো মাছ খাবে না কি গো? চরণ তুলশীর বাড়ী থেকে ইলিস মাছের তত্ত্ব এসেছে, কত সাধ ক'রে কাঁচা ইলিসের ঝোল আর অম্বল রাধলুম, খাবে না কি গো।

পুরুষ। যা বল্লে বল্লে, আব ও কথা বোল না [।] মাছ খাওয়া তো দূরের কথা—ধোপা নাপিত বন্ধ।

স্ত্রী। কেন কি হয়েছে—মাছ বন্ধ, ধোপানাপিত বন্ধ? তোমার আবার কার জন্য ওষুধ হোল?

পুরুষ। জান না! আমরা যে মাতৃহীন হয়েছি।

স্ত্রী। ও কি কথা! বালাই-বালাই। ও কথা মুখে এন' না। এই যে আমি দেখে এলেম, মা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুর পূজা কচ্চেন, তুমি আবার মাতৃহীন হোলে কি ক'রে?

পুরুষ। তোমায় কি বোঝাব ; মাতৃহীন হলে এক বৎসর কালা ওষুধ থাকে। কিন্তু এ কোন মার মৃত্যু হয়েছে জান? মার মা আমার মা, তোমার মা, সমস্ত বাঙ্গালীর মা—জন্মভূমি, মাতৃভূমি—বঙ্গমাতার মৃত্যু হয়েছে, এই অশৌচ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী।

স্ত্রী। কি বল গো! তোমার যে আমি কথা বুঝতে পাচ্চিনি। এই বার' বছর তুমি মাছ খাবে না ; কাপড় কাচবে না, খেউরি হবে না, বল কি?

পুরুষ। হায় অবোধ রমণী! কি সর্বনাশ হ'য়ে গেল তুমি কিছু বুঝছো না? বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ, জন্মভূমি জননীর বুকে খড়্গাঘাত, মার অপমৃত্যু!—বার বৎসর অশৌচের কথা শুনে স্তম্ভিত হচ্চো, কিন্তু রাণাপ্রতাপের চরিত্র পড়েছ কি?

স্ত্রী। হ্যাঁ, বসুমতীর উপহারে যে "রাজস্থান" দিয়েছিল, তাতে রাণাপ্রতাপের কথা পড়েছি, তাতে হয়েছে কি?

পুরুষ। হয়েছে কি! সে মহাত্মা দেশের জন্য কিনা কঠোর সাধন করেছিলেন। বিলাস বৈভব ত্যাগ ক'রে, জটাজট ধারণ করে, অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন, রাজ রাজ্যেশ্বর হ'য়ে ঘাসের রুটী খেয়ে দিন কাটিয়েছেন; কেন? কিসের জন্য জান কি? দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান ক'রেছিলেন। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে আমরা কি

কল্লেম,—বল্‌তে বুক ফেটে যায়, তাঁর তুলনায় কিছু কত্তে পাল্লেম না।

স্ত্রী। আচ্ছা, তুমি তো খুব হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়চো। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে আর কাউকে কিছু ক'রতে দেখেছো?

পুরুষ। আর কেউ কিছু করুগ, না করুগ, আমার কর্ত্তব্য আমি কর্বো। শৌর্য্য বীর্যহীন বাঙ্গালী আমবা, অধঃপতিত বাঙ্গালীজাতি আমরা, আমাদের কিছুই নেই; এইটুকু ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে পার্ব না। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অশৌচ ধারণে পশ্চাৎপদ হব, এ কার্য পার্‌বে না? এ জীবনে ধিক্‌—জগৎ স্তম্ভিত হোক, জানুক বাঙ্গালী যতই ঘৃণিত, দলিত পদলেহিত জাতি হউক, তাদের Will fonce মনঃশক্তি যথেষ্ট আছে। যাহার তুলনায় পৃথিবীর সকল জাতিকে পরাস্ত হ'তে হবে,—জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত হবে। ভাই বঙ্গসন্তান বাঙালী ভ্রাতৃগণ! এস, এই দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অশৌচ গ্রহণ কর। নতুবা জানবো তোমরা কেবল হুজুগপ্রিয় বাক্যবীর, অকর্ম্মণ্য, আর কিছু নয়।

স্ত্রী। ভগবান তোমাদের এই মতি গতি করুন। বাক্যবীর তোমরা, একটু কর্ম্মবীব হও। যদি যথার্থ এ কাজ কত্তে পার, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সব মেয়েদের পায়ে ধর্বো, তাদের বুঝিয়ে বলবো, তারাও যেন তাদের স্বামীর স্বধর্ম্মের উৎসাহদাত্রী হয়।

(কন্যার প্রবেশ)

কন্যা। হ্যাঁ মা, আমি সকাল সকাল খেয়ে স্কুলে যাব ব'লে বামুন ঠাকুরকে ভাত দিতে বল্লাম, সে কেবল ভাজা, ডাল আর ভাত এনে দিলে। বাড়ীতে এত মাছ এলো কৈ একখানা দিলে না, আমি কি মাছ না হ'লে খেতে পারি। তাতে সে বল্লে কর্ত্তাবাবু হুকুম দিয়েছেন, আজ থেকে বার' বছর এ বাড়ীতে মাছ ঢুক্‌বে না।

পুরুষ। হ্যাঁ বিনু আমিই ব'লে দিয়েছি। আমাদের কি হয়েছে জান? রাজা বাহাদুর জন্মভূমি জননীর হৃৎপিণ্ড ছেদন করেছেন। তাই আমাদের বার বৎসর অশৌচ। তুমি যদি আমার মেয়ে হও, যদি আমার প্রতি একটু টান থাকে, তাহলে আমি যা করি তুমি তাতে দুঃখ কর' না।

কন্যা। হ্যাঁ বাবা, সত্যি তাই? তবে আর আমি মাছ খেতে চাইবো না। যদি না খেয়ে মরতে হয়, তবু মর্বো, বার বছর আর মাছের কথা মুখে আনবো না।

গীত

মাছ খেতে আর চাইবো না
ভাল ক'রে চুল বাঁধবো না।।
রাঙ্গা কাপড় আন্‌লে তাঁতিনী,

আমি আর তো প'রচিনি।
আল্‌তা প'রে আমোদ ভরে আর তো
চ'লবো না।
কাঁদবো শুধু "মা" "মা" ব'লে
আর তো কিছু বোলবো না

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাস্তা।

পলিটিক্যাল মুর্দ্দাফরাসগণ।

গীত

তোদের বঙ্গমাতা খাল,
ও তোদের বঙ্গমাতা খাল।
দেখে আয় শিকলের পাহাড় হাঁসপাতাল।।
এ ফোঁড় ও ফোঁড় ফেলেছে চিরে,
কেঁদে মর' মাথা খোঁড়' পাচ্ছ না ফিরে,
তোরা বুঝবি কি ছাই পলিটিক্যাল চাল।।
কফিন বক্স এসেছে মেলে
গোর দোব কি পোড়াব' কি ফেলবো গঙ্গা জলে
এখন মিটিং ক'রে বল সকলে;
আমাদের নাইকো ঘুম, কড়া হুকুম
আজ হ'লে আর চাইনে কাল।।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

(স্কুল ও কলেজের যুবকগণ)

১ম যুবক। আর কি ভাই, যা হবার তাই হ'য়ে গেল, যখন বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হলো, তখন আমরা যে দেশের মানুষ, সেই দেশে চ'লে যাই।

২য় যুবক। ভাই! রাজা আমাদের ওপর বিরূপ হ'য়ে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' কল্লেন বটে, কিন্তু আমাদের যেন এইটী মনে থাকে—আমরা এক মার পেটের ভাই! কেউ ছাড়াছাড়ি কর্ত্তে পার্বো না। পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে তবু এ শোণিত সম্বন্ধ কেউ ঘোচাতে পার্ব্বো না।

(বিলাসের প্রবেশ)

৩য় যুবক। একি বিলাস, তুমি এখনো জুতো পায়ে জামা গায়ে দিয়ে রয়েছ!

আমাদের জাতীয় অশৌচ হয়েছে জান? বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এতদিনে শেষ হোল এ সংবাদ রাখ না? তুমি কি বঙ্গমাতার সন্তান ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা পাও?

বিলাস। আমি তো জানিনি এ সর্বনাশ হ'য়ে গেছে! আমি বাবার সঙ্গে হাওয়া খেতে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি আজ। সবে এসে কল্‌কাতায় পৌঁছেছি। Bengal Partition তা হ'লে হ'য়ে গিয়েছি।

৩য় যুবক। হ্যাঁ ভাই—আর কি বোলবো।

বিলাস। তবে আর কেন? আজ হতে আমিও তোমাদের মতন অশৌচ গ্রহণ কল্লেম। জুতা জামা বিলাসের সামগ্রী সব দূর হও। যদি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মান রাখতে চাও, অপকট হৃদয়ে শপথ গ্রহণ কর, যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় দেশীয় শিল্পের উন্নতি ক'রে স্বদেশ জাত বস্ত্র দ্রব্যাদিতে গৃহপ্রয়োজনীয় সমস্ত অভাব পূরণ কর্বো। আজ হ'তে আর বিদেশী পণ্যদ্রব্যে বাঙ্গালীর ঘর সজ্জিত হবে না।" ভাই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সপ্তকোটী বঙ্গসন্তান ছিলেম, আজ হতে মুষ্টিমেয় হতে চল্লেম। এস ভাই একবার জন্মের শোধ সপ্তকোটী কণ্ঠ মিলিয়ে বন্দেমাতরং গাই এস ;—

গীত

"বন্দে মাতরং"

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং
বন্দে মাতরম্
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্ত কোটি কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃশরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুফলাং সুফলাম্ মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য

বঙ্গমাতা অঙ্গচ্ছেদ অবস্থায় ভূতলে পতিতা। ভারতসন্তানগণ দণ্ডায়মান।

গীত।

তুই যদি মা চ'লে গেলি কি সুখে আর থাকি বল্।
নয়ন দিয়ে উজান বেয়ে উথ্‌লে উঠে সাগর জল।।
সুজলা সুফলা শ্যামা
বঙ্গমাতা অনুপমা
জেগে উঠে কোলে নে মা হ'য়েছি চঞ্চল।।

ক্রোড়াঙ্ক

উজ্জ্বল দৃশ্য।

সস্ত্রীক সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমূর্তির আবির্ভাব

ভারতসন্তানগণের গীত

এই যে মোদের দয়াল রাজা সিংহাসনে ব'সে।
দেশ বিদেশে ধন্য ঘোষে যাঁর নামের যশে।।
একটুখানি দয়া ক'রে,
বঙ্গমাতায় দাও গো ফিরে,
মা জননী হেথায় প'ড়ে সোনার অঙ্গ ধুলোয় মেশে।
দয়ার সাগর তোমায় বলে,
তুমিও কি নিদয় হ'লে
অভয় বাণী শুনবো র'সে আছি ব'সে আশার আশে [।]

যবনিকা পতন